صور من حياة الصحابة

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র
বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

তৃতীয় খণ্ড

ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

https://archive.org/details/@salim_molla

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

তৃতীয় খণ্ড

সাহাবা জীবনের বিরল বিচিত্র বিস্ময়কর ঘটনাবলী

আলোর কাফেলা

তৃতীয় খণ্ড

মূল

ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক ও ভাষাবিদ

অনুবাদ

মাওলানা নাসীম আরাফাত

শিক্ষক, জামিয়া শারইয়্যাহ, মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মাসঊদুয যামান শহীদ

মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া, ঢাকা

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net

ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

আলোর কাফেলা তৃতীয় খণ্ড

মূল ঃ ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.

অনুবাদ ঃ মাওলানা নাসীম আরাফাত
মাওলানা মাসউদুয যামান শহীদ

প্রকাশক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল
শাবান ১৪৩৪ হিজরী
জুন ২০১৩ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN :978-984-8950-30-2

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

ALOR KAFELA - 3rd Part
By: Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha Rh.
Translated by: Mawlana Nasim Arafat
Mawlana Masuduz Zaman Shahid
Price: Tk. 160.00 US$ 10.00

ইনতিসাব

যুগ যুগ ধরে সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে
যে সকল আত্মত্যাগী মর্দে মুমিন নিজে আল্লাহর পথে চলেছেন
এবং অন্যান্য সকল মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে সর্বাত্মক
আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি।

- প্রকাশক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রকাশকের কথা

হজ্জের সময় বাইতুল্লাহ শরীফের দক্ষিণে অবস্থিত ছোট একটি লাইব্রেরী থেকে 'সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবাহ' নামক একটি চমৎকার কিতাব ক্রয় করি। নামায, তাওয়াফ, তিলাওযাত ও হজ্জের অন্যান্য কার্যাদির ফাঁকে ফাঁকে যখনই একটু অবসর পেতাম কিতাবটি নিয়ে বসে যেতাম, এমনকি মিনা, আরাফাহ ও মুজদালিফার ব্যস্ততম দিনগুলোতেও কিতাবটি সাথে রেখেছি এবং সামান্য সুযোগেও সেটা পড়ার চেষ্টা করেছি।

কিতাবটি আমার এতই পছন্দ হয়েছে যে, মদীনা শরীফে যখন এই একই কিতাব মক্কা শরীফের চেয়ে দশ রিয়াল কমে পেলাম, তখন এক স্নেহাস্পদকে হাদীয়া দেয়ার জন্য এর আরেকটি কপি ক্রয় করলাম। এই পবিত্র সফরে অনেক মুরুব্বীকেও এর বিভন্নি জায়গা থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি। তাঁরা সকলেই মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন এবং বঙ্গানুবাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার দরুন কখনোই এ দুঃসাহসী পদক্ষেপ নেয়ার হিম্মত হয়নি।

পরবর্তীতে যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক ও অনুবাদক বন্ধুবর মাওলানা নাসীম আরাফাতের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা হলো তখন তিনি অনুবাদ করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই কিতাবটি অনেক আগেই আমি পড়েছি, এর কিছু কিছু অংশের অনুবাদ করে বিভিন্ন পত্রিকায়ও ছাপিয়েছি; এ কিতাবের প্রতি আমারও খুবই আগ্রহ আছে। তিনি অনুবাদের দায়িত্ব নিলেন এবং মূল কিতাবের এক তৃতীয়াংশের অনুবাদ করে আমাকে পৌছালেন। আমি তা অনেকটা যাদুগ্রস্তের মতোই খুব অল্প সময়ে পড়ে ফেললাম। আমার মনে হলো অনুবাদ মূলের মত সাবলিল ও সুন্দর হয়েছে। তাই খুবই যত্নের সাথে এর প্রচ্ছদ ও মুদ্রণের কাজ শুরু করলাম। পাঠকমাত্রই এই যত্নের ছাপ অনুভব করবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য মূল আরবী কিতাবটি মোট সাত খণ্ড কিন্তু বড় এক ভলিউমে বাধাই করা। আমরা আমাদের পাঠকদের সামর্থ্য ও রুচিবোধ বিবেচনা করে অনুবাদকে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা নিয়েছি। যাতে বহন ও পাঠ করা সহজ হয়। অবশ্য প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড একত্রে সমগ্র আকারেও আমরা কিতাবটি প্রকাশ করেছি।

ছাব্বিশজন সাহাবীর জীবনের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ঘটনাবলী নিয়ে আলোর কাফেলা-এর তৃতীয় খণ্ড এখন আপনাদের হাতে।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের দীর্ঘদিন পর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল তৃতীয় খণ্ডের জন্য পাঠককে অপেক্ষার কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের জন্য আরো দীর্ঘদিন অপেক্ষায় থাকতে হয়েছে, যা আমাদের কোনভাবেই কাম্য ছিলো না। এজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

তৃতীয় খণ্ডের প্রায় এক তৃতীয়াংশের অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম জনাব মাওলানা মাসউদুয যামান শহীদ। আল্লাহপাক সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

প্রচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা সুন্দর ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিবো ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমাদের জীবনকেও তাঁর প্রিয়নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রিয় সাহাবীদের জীবনের ছাঁচে ঢেলে সাজানোর তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

যেসকল সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী নিয়ে

আলোর কাফেলা-এর প্রথম খণ্ড

হযরত সাঈদ ইবনে আমের জুমাহী রাযি.

হযরত তুফাইল ইবনে আমর দাউসী রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহমী রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে ওহাব রাযি.

হযরত বারা ইবনে মালেক আনসারী রাযি.

হযরত উম্মে সালামা রাযি.

হযরত সুমামা ইবনে উসাল রাযি.

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি.

হযরত আমর ইবনে জমূহ রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাস রাযি.

হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.

হযরত সালমান ফারসী রাযি.

হযরত ইকরামা ইবনে আবু জাহেল রাযি.

হযরত যায়দুল খাইর রাযি.

হযরত আদী ইবনে হাতেম তাঈ রাযি.

হযরত আবুযর গিফারী রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাযি.

হযরত মাজযাআ ইবনে সাউর রাযি.

যেসকল সাহাবায়ে কেরামের ঘটনাবলী নিয়ে **আলোর কাফেলা**-এর দ্বিতীয় খণ্ড

হযরত ওসাইদ ইবনে হুযাইর রাযি.

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.

হযরত নু'মান ইবনে মুকাররিন রাযি.

হযরত সুহাইব রুমী রাযি.

হযরতআবু দারদা রাযি.

হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা রাযি.

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রাযি.

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'আদ রাযি.

হযরত উমাইর ইবনে সা'দ রাযি.

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.

হযরত জা'ফর ইবনে আবু তালেব রাযি.

হযরত আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস রাযি.

হযরত সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি.

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি.

হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী রাযি.

হযরত বেলাল ইবনে বারাহ রাযি.

হযরত হাবীব ইবনে যয়েদ আনসারী রাযি.

লেখকের দু'আ

হে আল্লাহ!

আমি আপনার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে গভীরভাবে সততার সাথে ভালবেসেছি। সুতরাং কিয়ামত দিবসে তাদের যে কোন একজনের নিকট আপনি আমাকে সমর্পণ করুন।

হে আরহামুর রাহেমীন!

আপনি জানেন, আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির জন্যই তাদেরকে ভালবেসেছি।

- আবদুর রহমান রাফাত পাশা

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি.	১৩
হযরত রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী রাযি.	২২
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.	৩১
হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.	৪১
হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি.	৫২
হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি.	৬১
হযরত ওয়াহশী ইবনে হর্ব রাযি.	৭২
হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি.	৮০
হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্র রাযি.	৮৮
হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী রাযি.	৯৫
হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি.	১০৩
যুল্‌বিযাদাইন হযরত আব্দুল্লাহ্ আল্ মুযানি রাযি.	১১২
হযরত আবুল আস ইবনে রবীয় রাযি.	১২০
হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযি.	১২৯
হযরত আবু ত্বালহা আনসারী রাযি.	১৩৭
হযরত সুরাকা ইবনে মালেক রাযি.	১৪৫
হযরত ফায়রুয আদ্‌দায়লামী রাযি.	১৫৫
হযরত ছাবিত ইবনে কায়স আল-আনসারী রাযি.	১৬৩
হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত্‌তাইমী রাযি.	১৭১
হযরত আবু হুরায়রা আদ্‌দাউসী রাযি.	১৭৯
আহওয়ায বিজয়ী ঃ হযরত সালামা ইবনে কায়স আলআশজায়ী রাযি.	১৯০
হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.	১৯৮
ইয়াসির পরিবার ঃ ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার	২০৭
হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.	২১৬
হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী রাযি.	২২৪
হযরত সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা রাযি.	২৩২
হযরত উসমান ইবনে আফ্‌ফান রাযি.	২৪০
হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.	২৫৫-২৬৪

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি.

رَحِمَ اللهُ خَبَّابًا فَقَدْ أَسْلَمَ رَاغِبًا،

وَهَاجَرَ طَائِعًا وَعَاشَ مُجَاهِدًا

_علی بن أبی طالب

হে আল্লাহ! খাব্বাবের প্রতি রহম করুন।

তিনি আগ্রহভরা হৃদয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন।

জিহাদ করে জীবন কাটিয়েছেন।

– আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.

হযরত খাব্বাব ইবনে আরাত রাযি.

খুজাই বংশের মহিলা উম্মে আনমার মক্কায় অবস্থিত দাস-দাসী বিক্রয়কারীদের বাজারে গেল।

কারণ সে নিজের জন্য একটি গোলাম ক্রয় করতে ইচ্ছে করেছে, যার খিদমত দ্বারা উপকৃত হবে আর তার কর্মের ফলাফল সে ভোগ করবে। বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত গোলামদের চেহারায় অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। ফলে সে একজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালককে নির্বাচন করল। সে তার শারীরিক সুস্থতার মাঝে ও চেহারায় বিকশিত সম্ভ্রান্তের আলামত সমূহের মাঝে এমন কিছু দেখতে পেল যা তাকে ক্রয় করতে উৎসাহিত করল। তাই সে মূল্য পরিশোধ করে তাকে নিয়ে চলে এল...

পথে উম্মে আনমার বালকটির দিকে তাকিয়ে বলল,

হে বালক! তোমার নাম কি?

বালক বলল, খাব্বাব।

উম্মে আনমার বলল, তোমার পিতার নাম কি?

বালক বলল, আরাত

উম্মে আনমার বলল, তুমি কোত্থেকে এসেছো?

বালক বলল, নজদ থেকে।

উম্মে আনমার বলল, তাহলে তুমি আরব?

বালক বলল, হ্যাঁ... আমি বনু তামীম গোত্রের।

উম্মে আনমার বলল, কে তোমাকে মক্কায় গোলাম বিক্রয়কারীদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে?!!

বালক বলল, আরবের এক কবিলা আমাদের পল্লীতে আক্রমণ করেছে। তারা গৃহপালিত পশু নিয়ে গেছে। নারীদের বন্দী করেছে। ছেলে সন্তানদের ধরে নিয়ে গেছে। যেসব বালকদের ধরে নিয়ে গেছে আমি ছিলাম তাদের একজন। তারপর হাত বদল হতে লাগল। অবশেষে

আমাকে মক্কায় নিয়ে আসা হল। আর আমি আপনার হাতে এসে পৌঁছলাম।

* * *

উম্মে আনমার তার গোলামকে মক্কার এক কর্মকারের নিকট পাঠিয়ে দিল যেন সে তাকে তরবারী তৈরী করা শিখিয়ে দেয়। গোলামটি অতি দ্রুত তরবারী তৈরী করতে দক্ষ হয়ে গেল। এবং চমৎকার পারদর্শী হয়ে গেল।

খাব্বাবের বাহু শক্তিশালী হলে, তার দেহ মজবুত হলে উম্মে আনমার তার জন্য একটি দোকান ভাড়া করল এবং তার জন্য কিছু আসবাব পত্র ক্রয় করে দিল এবং তরবারী তৈরী করার ক্ষেত্রে তার দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ফল লাভ করতে লাগল।

* * *

কিছুদিন যেতে না যেতেই মক্কায় খাব্বাব প্রসিদ্ধি লাভ করল। লোকেরা তার তরবারী ক্রয় করতে আসতে লাগল। কারণ সে মজবুত করে তরবারী তৈরী করা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার গুণে সজ্জিত ছিল।

* * *

বয়সের স্বল্পতা সত্ত্বেও খাব্বাব জ্ঞানী ব্যক্তিদের জ্ঞান ও বৃদ্ধদের প্রজ্ঞায় সুষমামণ্ডিত ছিল।...

কাজ থেকে অবসর হয়ে একাকী হলে প্রায়ই সে এই জাহেলী সমাজকে নিয়ে চিন্তা করতো যা পায়ের তলা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত ফিৎনা-ফাসাদে ডুবে গেছে।

আরবদের জীবনকে যে অন্ধ বিভ্রান্তি ও ঘোর অজ্ঞতা আচ্ছন্ন করেছে তা তাকে শঙ্কিত করত। আর তিনি নিজেই তার নিপীড়নের শিকার।...

আর বলত, নিশ্চয় এ রাতের শেষ রয়েছে।...

আর দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা করত যেন স্বচোখে অন্ধকারের অবসান আর আলোর উত্থান দেখতে পায়।

* * *

খাব্বাবের অপেক্ষা বেশী দীর্ঘ হল না। তার নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, বনু হাশেমের এক যুবকের মুখ থেকে নূরের রেখা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাকে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নামে ডাকা হয়।

সে তার নিকট গেল। তাঁর কথা শুনল। তাঁর আলোকময়তা তাকে বিমোহিত করল। তাঁর ঔজ্জ্বল্য তাকে আচ্ছন্ন করল। তাই সে তাঁর নিকট হাত প্রসারিত করল এবং সাক্ষ্য দিল,

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসূল।

ফলে তিনি ছয়জনের ষষ্ঠ ব্যক্তি হলেন যাঁর পৃথিবীর বুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। তাই বলা হয়, হযরত খাব্বাবের (রাযি.)-এর জীবনে এমন একটি সময় অতিবাহিত হয়েছে যে তখন তিনি ছিলেন ইসলামের এক ষষ্ঠাংশ।...

* * *

খাব্বাব রাযি. তাঁর ইসলাম গ্রহণ করাকে কারো থেকে লুকিয়ে রাখলেন না। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সংবাদ উম্মে আনমারের নিকট পৌঁছল। উম্মে আনমার ক্রোধে জ্বলে উঠল। আক্রোশে ফেটে পড়ল। তার ভাই সিবা ইবনে আব্দুল উযযাকে সাথে নিল। আর তাদের সাথে খুজাআ গোত্রের একদল যুবক এসে মিলিত হল। তারপর তারা সবাই খাব্বাবের নিকট গেল। তারা তাঁকে নিজ কাজে ব্যস্ত পেল। তখন সিবা তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। বলল, আমাদের নিকট তোমার ব্যাপারে একটি সংবাদ পৌঁছেছে আমরা তা সত্য মনে করিনি।

খাব্বাব রাযি. বললেন, তা কি?

সিবা বলল, একথা প্রচার করা হচ্ছে যে, তুমি বেদ্বীন হয়ে গেছো এবং বনু হাশেমের যুবকের অনুসরণ করছো।

খাব্বাব রাযি. শান্তকণ্ঠে বললেন, আমি তো বেদ্বীন হইনি। আমি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি। তাঁর কোন শরীক নেই।... আর আমি তোমাদের মূর্তিগুলোকে ত্যাগ করেছি। আর সাক্ষ্য দিয়েছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল...

খাব্বাবের কথাগুলো সিবা ও তার সাথীদের কর্ণ স্পর্শ করতে না করতেই তারা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাকে হাত দিয়ে মারতে লাগল। পা দিয়ে আঘাত করতে লাগল। হাতুড়ি লোহার টুকরা যা পেল তাই তাঁর দিকে ছুঁড়ে মারতে লাগল...

ফলে তিনি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। আর তাঁর শরীর থেকে রক্ত ঝড়তে লাগল।

* * *

শুষ্ক তৃর্ণলতায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার ন্যায় দ্রুত খাব্বাব রাযি. ও তার মনিবের মাঝে ঘটে যাওয়া ঘটনার সংবাদ মক্কায় ছড়িয়ে পড়ল।

খাব্বাব রাযি. এর সাহসিকতায় লোকেরা হতবাক হল। কারণ তারা ইতিপূর্বে শুনেনি যে, কেউ মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে এ ধরণের স্পষ্টতা আর চ্যালেঞ্জের সাথে তার ইসলামের কথা মানুষের মাঝে ঘোষণা করেছে।

খাব্বাব রাযি. এর ব্যাপারটিতে কুরাইশের বর্ষীয়ানরা আন্দোলিত হল... কারণ তাদের অন্তরে একথা উদয় হলো যে, উম্মে আনমারের গোলামের মত কোন গোলাম যার কোন আত্মীয় নেই যারা তাকে হেফাজত করবে। যার কোন বংশ নেই যারা তাকে রক্ষা করবে ও আশ্রয় দিবে। সে এতটুকু সাহস পাবে যে, মনিবের অবাধ্য হবে। তার উপাস্যদের উচ্চ কণ্ঠে গালমন্দ করবে। তার পিতামহ আর পূর্বপুরুষদের নির্বোধ বলবে।... আর তারা নিশ্চিত হয়ে গেল যে, এ দিনের পর আরো দিন রয়েছে...

কুরাইশরা তাদের আশঙ্কায় ভুলে ছিল না। খাব্বাব রাযি. এর দু:সাহসিকতা তাঁর অনেক সাথীকে উদ্বুদ্ধ করল যেন তারা তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথাও প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। ফলে তাঁরা একের পর এক সত্যের কালিমা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে লাগলেন।

* * *

কুরাইশের সরদাররা কাবার নিকটে সমবেত হল। তাদের নেতৃত্বে রয়েছে আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, ওলীদ ইবনে মুগীরা, আবু জাহেল ইবনে

হিশাম। তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করল। তারা দেখল, দিনের পর দিন, মুহূর্তের পর মুর্হূত তার বিষয়টি বেড়েই চলছে...

তাই তারা ফোঁড়াটিকে বড় হওয়ার আগেই কেটে ফেলতে ইচ্ছে করল। তারা সিদ্ধান্ত করল, প্রত্যেক কবিলা তাদের মাঝে বিদ্যমান তার অনুসারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদেরকে নির্মম শাস্তি দিবে। যেন তারা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে অথবা মৃত্যু বরণ করে।

* * *

সিবা ইবনে আব্দুল উযযা ও তার গোত্রের উপর খাব্বাব রাযি. কে শাস্তি দেয়ার দায়িত্ব নিপতিত হল...

তাই দুপুরে তাপের তীব্রতা বেড়ে গেলে, সূর্যের আলো মাটিকে জ্বালিয়ে তুললে তারা তাকে নিয়ে মক্কার পাথুরে অঞ্চল বাত্হায় যেত, তার শরীর থেকে কাপড় খুলে ফেলত, তাকে লৌহ্ বর্ম পড়াত আর তাকে পানি দিত না। অত:পর কষ্ট যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছত তখন তারা তাঁর নিকট এসে বলত।

মুহাম্মাদের ব্যাপারে তুমি কী বল?

তিনি বলতেন, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তিনি সত্য ও হিদায়াতের ধর্ম নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছেন, আমাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য...

তখন তারা তাকে কঠিনভাবে প্রহার ও মুষ্ট্যাঘাত করত তারপর বলত, লাত আর উযযার ব্যাপারে তুমি কী বল?

তিনি বলতেন, তারা দু'টি মূর্তি। মূক, বধির। কোন ক্ষতি করতে পারে না। কোন উপকারও করতে পারে না।

তখন তারা জ্বলন্ত পাথর নিয়ে আসত এবং তার পিঠে চেপে ধরত এবং পিঠের চর্বি প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত তা এ অবস্থায়ই থাকত।

* * *

খাব্বাবের ব্যাপারে উম্মে আনমার তার ভাই সিবার চেয়ে কম নিষ্ঠুর

ছিল না। একদা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে ও তাঁর সাথে কথা বলতে দেখল। তখন সে তা দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেল।

একদিন পরপর সে খাব্বাবের নিকট আসত। তার ভাটা থেকে জ্বলন্ত লোহা তুলে নিত এবং তা তার মাথায় রাখত। ফলে তার তাঁর মাথা পুড়ে ধোঁয়া বের হত আর তিনি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়তেন। আর তিনি তখন তার ও তার ভাইয়ের জন্য বদ দু'আ করতেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন খাব্বার (রাযি) হিজরতের জন্য প্রস্তুতি নিলেন।

তবে উম্মে আনমারের ব্যাপারে তার বদদু'আ কবুল করার পরই তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন...

উম্মে আনমার এমন ভয়াবহ মাথা ব্যথায় আক্রান্ত হল যার ব্যথার মত ব্যথার কথা কখনো শুনা যায়নি। তাই সে মাথার ব্যথার কারণে কুকুরের ন্যায় ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করত...

তার সন্তানরা সব জায়গায় তার জন্য চিকিৎসকের সন্ধান করল। তখন তাদের বলা হল, যদি তার মাথায় আগুনে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড দ্বারা বারবার দাগ দেয়া যায়, তাহলেই সে তার মাথা ব্যথা থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারবে ...

তাই সে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা তার মাথায় দাগ দিতে লাগল; তখন সে দাগ দেয়ার মাধ্যমে এমন কষ্ট পেত যা তাকে তার মাথা ব্যথার বেদনার কথা ভুলিয়ে দিত...

* * *

মদীনায় খাব্বাব রাযি. আনসারদের আতিথেয়তায় প্রশান্তির স্বাদ উপলব্ধি করলেন যা থেকে তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত বঞ্চিত ছিলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নৈকট্যে তার চোখ শীতল হল। কোন কিছু তা মলিন করল না। কোন কিছু তার স্বচ্ছতাকে কলুষিত করল না।

তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। তার পতাকাতলে যুদ্ধ করলেন...

তিনি তার সাথে উহুদ যুদ্ধে গেলেন আল্লাহ তাঁর চোখকে সিক্ত করলেন। তিনি উম্মে আনমারের ভাই সিবা ইবনে আব্দুল উয্যাকে দেখতে পেলেন, সে আসাদুল্লাহ হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের হাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে...

তার জীবন দীর্ঘ হল। ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চার খলীফার শাসনামল পেলেন। তিনি তাদের তত্ত্বাবধানে ইজ্জত-সম্মান ও সুখ্যাতির সাথে জীবন কাটালেন।

* * *

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর শাসনামলে একদিন তিনি তার নিকট গেলেন। হযরত উমর রাযি. তাকে উঁচু স্থানে আসন দিলেন। অত্যন্ত নিকটে তাকে বসালেন। তারপর তাঁকে বললেন, এ মজলিসে বিকালের পর আপনি ছাড়া আর কেউ বসার অধিকার রাখে না।

অতঃপর মুশরিকদের দেয়া নির্যাতনের নির্মমতা সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি তার উত্তর দিতে লজ্জা বোধ করলেন...

তারপর পীড়াপীড়ি করলে তিনি তার পিঠ থেকে কাপড় সরালেন। ফলে হযরত উমর রাযি. যা দেখলেন তাতে চমকে উঠলেন। বললেন, তা কীভাবে হয়েছে? খাব্বাব রাযি. বললেন, মুশরিকরা আমার জন্য লাকড়ি জ্বালিয়েছে তারপর তা যখন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়েছে আমার দেহ থেকে কাপড় খুলে ফেলেছে এবং আমাকে তার উপর দিয়ে টেনেছে। এভাবে আমার পিঠের হাড় থেকে গোশত খসে পড়েছে। আমার শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তই সেই আগুনকে নিভিয়েছে।

* * *

হযরত খাব্বাব রাযি. তার জীবনের শেষ অধ্যায়ে দারিদ্রের জীবন যাপন করার পর স্বচ্ছল হলেন। যে স্বর্ণ ও চাঁদি তিনি স্বপ্নেও দেখতেন না তার মালিক হলেন...

তবে তিনি তার সম্পদ এমনভাবে খরচ করলেন যা কারো হৃদয়ে উদয় হয়নি

তিনি তাঁর দিরহাম ও দিনারগুলো ঘরের এমন এক স্থানে রেখে দিলেন যে স্থানটি ফকীর-মিসকিন আর মুহতাজ ব্যক্তিরা চিনে।

তা লুকিয়ে রাখলেন না। তাতে কোন তালাও লাগালেন না। তাই তারা তার বাড়িতে আসত এবং চাওয়া বা অনুমতি নেয়া ছাড়াই তা থেকে ইচ্ছেমতো নিয়ে যেত।

এতদসত্ত্বেও তিনি এ সম্পদের হিসাবের ভয় করতেন এর এর কারণে শাস্তির ভয় করতেন।

* * *

তাঁর একদল সঙ্গী বলেছেন–

তিনি মৃতরোগে আক্রান্ত হলে আমরা তার নিকট গেলাম তখন তিনি বললেন,

এ স্থানে আশি হাজার দেরহাম রয়েছে। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি কখনো তা (অর্থের থলিটি) দাড়ি দিয়ে বেঁধে রাখনি। কখনো তা থেকে কোন প্রার্থনাকারীকে ফিরিয়ে দেইনি। তারপর তিনি কেঁদে ফেললেন।...

তখন সঙ্গীরা তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন?

তিনি বললেন, আমার কান্নার কারণ হল, আমার সঙ্গী সাথীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয় চলে গেছে আর তারা এ দুনিয়ায় তাদের বিনিময়ের কিছুই পায়নি। আর আমি তাদের পশ্চাতে রয়ে গেছি আর এ সম্পদ অর্জন করেছি যা আমার সেই আমলসমূহের বিনিময় হওয়ার ভয় করছি...

* * *

হযরত খাব্বাব রাযি. তাঁর রবের সান্নিধ্যে চলে গেলে আমীরুল মু'মিনীন আলী ইবনে আবু তালেব রাযি. তাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন,

আল্লাহ তা'আলা খাব্বাবের প্রতি রহম করুন। তিনি আগ্রহভরা হৃদয় নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। অনুগত হয়ে হিজরত করেছেন। জিহাদ করে করে জীবন কাটিয়েছেন।

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী রাযি.

مَاصَدَقَنِيْ أَحَدٌ مُنْذُ اسْتُخْلِفْتُ

كَمَا صَدَقَنِيْ الرَّبِيْعُ بْنُ زِيَادٍ

–عمر بن الخطاب رضى الله عنه

খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর রবী ইবনে যিয়াদ
আমার সাথে যেভাবে সত্য কথা বলেছে
সেভাবে আর কেউ বলেনি।

–হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযি.)

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী রাযি.

এ হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শহর মদীনা। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর বিয়োগ বেদনা এখনো প্রশমিত হয়নি...

আর ঐ তো বিভিন্ন শহরের প্রতিনিধি দলেরা প্রত্যেক দিন ইয়াসরীবে আসছে। সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় খলীফা উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর আনুগত্যের বাইয়াত গ্রহণ করছে...

একদিন সকালে অন্যান্য প্রতনিধি দলের সাথে বাহরাইনের প্রতিনিধিদল আমীরুল মু'মিনীনের নিকট এল।

আর হযরত উমর ফারুক রাযি. তাঁর নিকট আগমনকারী প্রতিনিধিদলের কথা শুনতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। হয়তো তিনি তাদের কথায় কোন মূল্যবান উপদেশ, উপকারী চিন্তা বা আল্লাহ, তাঁর কিতাব ও সাধারণ মুসলমানদের কল্যাণকামিতার কোন নসীহত পাবেন।

তাই তিনি উপস্থিত লোকদের কথা বলতে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলল না।

অবশেষে তিনি কল্যাণের আশা করে এক ব্যক্তির দিকে তাকালেন। ইঙ্গিত করে তাকে বললেন, তোমার বলার কিছু আছে কী? লোকটি তখন আল্লাহর স্তুতি ও প্রশংসা করে বলল,

হে আমীরুল মুমিনীন! এই উম্মাহর যে দায়িত্ব আপনাকে অর্পণ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র এ কারণেই যে আল্লাহ আপনাকে তা দ্বারা পরীক্ষা করবেন...

সুতরাং, আপনাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আর জেনে রাখুন যদি ফোরাত নদীর তীরে কোন একটি বকরীও হারিয়ে যায় তাহলে কিয়ামত দিবসে সে ব্যাপারে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে।

তখন হযরত উমর রাযি. কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং বললেন, খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তুমি আমার সাথে যেভাবে সত্য কথা বললে সেভাবে কেউ সত্য কথা বলেনি। সুতরাং বলো কে তুমি?

লোকটি বলল, আমি রবী ইবনে যিয়াদ হারেসী। তখন হযরত উমর রাযি. বললেন, তুমি কি মুহাজির ইবনে যিয়াদের ভাই? রবী বললেন, হ্যাঁ।

মজলিস শেষ হলে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযি.)-কে ডাকলেন। বললেন, রবী ইবনে যিয়াদের খোঁজ খবর নাও। যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে নিশ্চয় তার মাঝে প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। আর খেলাফতের কাজে আমরা তার সাহায্য নিতে পারব।...

তাকে শাসক বানিয়ে দাও এবং তার খবরা খবর আমার কাছে লিখে পাঠাও।

* * *

এরপর কয়েকদিন বিগত হল আর হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. খলীফার নির্দেশক্রমে আহওয়াজের 'মানাযের' বিজয় করতে একটি বাহিনী তৈরী করলেন। এবং মুজাহিদ বাহিনীর সাথে রবী ইবনে যিয়াদ ও তার ভাই মুহাজিরকে নিয়ে নিলেন।

হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. মানাযির আবরোধ করলেন এবং তার অধিবাসীদের সাথে এমন ভয়াবহ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যার উপমা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

মুসলমানরাও প্রচণ্ড শক্তি ও অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করল যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। আর মুসলমানদের মাঝে সকল হিসাব-নিকাশ ছাড়িয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রচণ্ড আকার ধারণ করল।

মুসলমানরা সেদিন রমযান মাসের রোযা রেখে যুদ্ধ করছিল। রবী ইবনে যিয়াদের ভাই মুহাজির যখন দেখল, মুসলমানদের সারিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে গেছে তখন তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টির বিনিময়ে নিজেকে বিক্রয় করে দিতে ইচ্ছে করলেন। সুগন্ধি ব্যবহার করলেন। কাফন পরিধান করলেন। তার ভাইকে অন্তিম উপদেশ দিলেন...

তখন রবী হযরত আবু মূসা (রা.) এর নিকট গিয়ে বললেন, মুহাজির তো রোযা রাখা অবস্থায়ই নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় বিকিয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করছে। আর মুসলমানদের উপর যুদ্ধের ক্লেশও ক্লান্তি আর রোযার কষ্ট একত্রিত হয়ে তাদের মনোবলকে দুর্বল করে দিয়েছে। আর তারা রোযা ভাঙতে চাচ্ছে না। সুতরাং ভেবে দেখুন আপনি কী করবেন?

তখন হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,

হে মুসলিম যোদ্ধারা! আমি সকল রোযাদারকে রোযা ভঙ্গের অথবা যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কসম দিচ্ছি... তারপর তিনি তার সাথে রাখা একটি জগ থেকে পানি পান করলেন যেন মুজাহিদগণ তার পানি পান করা দেখে পানি পান করে।

মুহাজির এ কথা শুনেই এক ঘোট পানি পান করে বলল, আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তা তৃষ্ণার কারণে পান করি নাই। তবে আমি আমার আমীরের শপথকে রক্ষা করেছি...

তারপর তিনি তার তরবারী কোষমুক্ত করলেন ও বূহ্য ভেদ করে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং ভয়ভীতি ছাড়াই শত্রু যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করতে লাগলেন।

তিনি শত্রু বাহিনীর মাঝে পৌঁছে গেলে তারা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল এবং অগ্র পশ্চাৎ সবদিক থেকে তাদের তরবারী তাকে আঘাত করতে লাগল। অবশেষে তিনি লুটিয়ে পড়লেন... তারপর তারা তার শির ছিন্ন করল এবং রণাঙ্গনমুখী একটি বেলকনিতে তা রেখে দিল। রবী তা দেখে বললেন, তুমি কতোই না সৌভাগ্যবান। কতো চমৎকারই না তোমার প্রত্যাবর্তন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইন্‌শাআল্লাহ– আমি অবশ্যই তোমার ও নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ নিব। হযরত আবু মূসা আশাআরী রাযি. যখন ভাইয়ের বিয়োগ বেদনায় রবীর অস্থিরতা দেখলেন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে তার অন্তরে যে প্রতিশোধ স্পৃহা আন্দোলিত হয়েছে তা অনুধাবন

করলেন তখন তিনি মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্বের পদ থেকে সরে এলেন এবং 'সূস' বিজয়ের জন্য রওনা হয়ে গেলেন।

* * *

রবী ও তার বাহিনী ঝড়ের বেগে মুশরিকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাদের দুর্গের উপর পাথরের ন্যায় ছিটকে পড়লেন যখন ঢল তাকে উপর থেকে ফেলে দেয়। ফলে তারা তাদের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তাদের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলল। আর আল্লাহ্ তাআলা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই রবী ইবনে যিয়াদের জন্য মানাযিরকে বিজিত করলেন...

তখন তিনি যোদ্ধাদের হত্যা করলেন, শিশুদের বন্দী করলেন এবং প্রচুর ধন-সম্পদ গণীমতের মাল হিসাবে অর্জন করলেন।

* * *

মানাযিরে যুদ্ধের পর রবী ইবনে যিয়াদের ভাগ্য তারকা ঝলমল করে উঠল এবং সবার মুখে মুখে তার নাম ছড়িয়ে পড়ল এবং তিনি ঐ সব শীর্ষ নেতাদের একজন হয়ে গেলেন যাদের থেকে মহান কাজের আশা করা যায়।...

মুসলমানগণ সিজিস্তান বিজয়ের ইচ্ছে করলে তাঁর নিকট মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পণ করলেন এবং আল্লাহ্র অনুমতিতে তার হাতেই বিজয়ের আশা করলেন।

* * *

রবী ইবনে যিয়াদ মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানের পথে ছুটে চললেন। পথে তিনি অতিক্রম করলেন এক বিশাল জনমানবহীন মরুপ্রান্তর যার দৈর্ঘ্য দেড়শ' মাইল যা অতিক্রম করতে মরুভূমির হিংস্রপ্রাণীও ক্লান্ত হয়ে যায়।

সর্বপ্রথম তার সামনে দেখা দিল সিজিস্তানের সীমান্তে অবস্থিত 'রুস্‌তাক যালেক' শহর। মনোরম প্রাসাদসমূহে তা পরিপূর্ণ, সুউচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত প্রচুর ফলমূল আর বহু সম্পদে ঐশ্বর্যবান।

* * *

চতুর সেনাপতি রুসতাক যালেকে পৌছার পূর্বে তার চরদের ছড়িয়ে দিলেন। তিনি জানতে পারলেন, শহরের লোকেরা কয়েকদিনের মধ্যেই তাদের এক উৎসবে সমবেত হবে। তাই তিনি অপেক্ষা করলেন। অবশেষে উৎসবের রাতে তিনি তাদের অপ্রস্তুত ও উদাস পেলেন এবং তাদের গর্দানে তরবারীকে কাজে লাগালেন ও শক্তি প্রয়োগে তিনি তাদের ধরে ফেললেন। তাদের বিশ হাজারকে ধরে বন্দী করলেন আর তাদের শাসক তার হাতে বন্দী হল...

বন্দীদের মাঝে শাসকের একজন গোলাম ছিল। সে তার মনিবের নিকট তিন লাখ দিনার নিয়ে যাওয়া অবস্থায় ধরা পড়লো। রবী রাযি. তখন তাকে বললেন, এ সম্পদ তুমি কোথা থেকে এনেছো?

গোলাম বলল, আমার মনিবের এক গ্রাম থেকে তা এনেছি।

হযরত রবী রাযি. বললেন, একটি গ্রাম প্রত্যেক বৎসর কি এ পরিমাণ সম্পদ প্রদান করে?

গোলাম বলল, হ্যাঁ,

হযরত রবী রাযি. বললেন, কীভাবে?

গোলাম বলল, আমাদের কুঠার, কাস্তে আর ঘামের দ্বারা। যুদ্ধ শেষ হলে শাসক রবী রাযি.-এর নিকট অগ্রসর হল এবং নিজের ও তার পরিজনের মুক্তিপণ দিতে চাইল। তখন হযরত রবী রাযি. বললেন, আমি তোমার মুক্তিপণ গ্রহণ করব যদি তুমি মুসলমানদের অধিক পরিমাণে তা দাও।

শাসক বলল, আপনি কত চান :

হযরত রবী রাযি. বললেন, আমি এই নেজাটি মাটিতে গেঁথে দিব। তারপর তুমি তাতে স্বর্ণ ও চাঁদি ঢালতে থাকবে এমনকি তা ঢেকে ফেলবে।

শাসক বলল, ঠিক আছে। আমি তাতে রাজি। এরপর সে তার ধনভাণ্ডারে যে সব স্বর্ণ-চাঁদি আছে তা নেজার উপর ঢালতে লাগল এবং তা ঢেকে ফেলল...

* * *

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ রাযি. তার বিজয়ী বাহিনী নিয়ে সিজিস্তানের গভীরে প্রবেশ করলেন। তার ঘোড়ার খুড়ের তলে একের পর এক দুর্গের পতন হতে লাগল যেমন শরতের ঝড়ো বাতাসের ধাক্কায় গাছের পাতা-পল্লব ঝরে পড়ে। শহর আর গ্রামের লোকেরা নিরাপত্তার প্রত্যাশী হয়ে অবনত শিরে তাঁকে স্বাগত জানাতে লাগল। তারা তাদের চেহারায় তরবারী উত্তোলিত হওয়ার আগেই তা করল। অবশেষে সিজিস্তানের রাজধানী 'যারাঞ্জ' শহরে গিয়ে পৌঁছলেন।

তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, শত্রু বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত করে আছে। তার মুখোমুখি হওয়ার জন্য বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে। তাঁর সাথে মুখোমুখি হওয়ার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীদেরকে একত্রিত করেছে। এবং বিশাল শহর থেকে তাকে প্রতিহত করার জন্য ও সিজিস্তানে তার বিজয় যাত্রাকে থামিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। সে জন্য যত চড়া মূল্যই দিতে হোক তারা দেবে।

তারপর হযরত রবী রাযি. ও তার শত্রুদের মাঝে ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হল। দুই বাহিনীর কেউ তাতে প্রাণ উৎসর্গ করতে কুণ্ঠাবোধ করল না।

তারপর যখন মুসলমানদের বিজয়ের প্রথম আলামত প্রকাশ পেল তখন পারভেজ নামের গোত্রপতি রবী রাযি.-এর সাথে সন্ধির জন্য ইচ্ছে করল আর তখনো তার কিছু শক্তি অবশিষ্ট ছিল। তার আশা ছিল হয়তো সে তার ও তার সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য কিছু ভাল শর্ত আরোপ করতে পারবে।... তাই সে তার পক্ষ থেকে রবী ইবনে যিয়াদের নিকট সন্ধির ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য সাক্ষাতের সময় চেয়ে একজন দূত প্রেরণ করল। তখন তিনি তার আহ্বানে সাড়া দিলেন।

রবী রাযি. তার লোকদের পারভেজকে স্বাগত জানানোর স্থান তৈরী করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদের হুকুম দিলেন যেন তারা মজলিসের চারপাশে নিহত পারসিকদের লাশের স্তূপ দিয়ে রাখে...

আর পারভেজ যে পথ দিয়ে আসবে তার উভয় পাশে বিক্ষিপ্তভাবে লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে।

হযরত রবী রাযি. দীর্ঘ দেহের অধিকারী। বড় মাথা বিশিষ্ট, অত্যন্ত গৌরবর্ণের অধিকারী ছিলেন। দর্শকের হৃদয়ে তা প্রভাব সৃষ্টি করত।

পারভেজ তার নিকট প্রবেশ করলে আতঙ্কে তার শরীর কেঁপে উঠল এবং নিহতদের পতিত লাশের স্তুপ দেখে ভয়ে তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো তাই তার সাথে করমর্দন করতে সামনে অগ্রসর হল না।...

তিনি তার সাথে সিংহের ন্যায় গর্জন করে কথা বললেন, এবং এ শর্তে সন্ধি করলেন যে সে এক হাজার গোলাম প্রদান করবে আর প্রত্যেক গোলামের মাথায় একটি করে স্বর্ণের পানিপাত্র দিবে। রবী তা কবুল করলেন আর পারভেজ এ শর্তে সন্ধি করল।

পরদিন রবী ইবনে যিয়াদ গোলামদের শোভাযাত্রায় পরিবেষ্টিত হয়ে মুসলমানদের লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনির মাঝে শহরে প্রবেশ করলেন। ফলে সে দিবসটি একটি ঐতিহাসিক দিবস হল।

* * *

হযরত রবী ইবনে যিয়াদ রাযি. মুসলমানদের হাতে একটি খাপমুক্ত তরবারী হয়ে গেল যাকে নিয়ে তারা দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বহু শহর বিজিত করলেন এবং তারা বহু দেশের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হল। অবশেষে বনু উমাইয়ার নিকট খেলাফতের দায়িত্ব এল। তখন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. তাকে খোরাসানের শাসক নিযুক্ত করলেন.... তবে এ শাসন ক্ষমতার ব্যাপারে তার অন্তর প্রশান্ত ছিল না....

তার অপ্রসন্নতা ও অপছন্দনিয়তাকে আরো বৃদ্ধি করল বনী উমাইয়াদের এক নামকরা শাসক যিয়াদের একটি পত্র যাতে সে এ কথা লিখে পাঠাল–

"আমীরুল মু'মিনীন মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান রাযি. আপনাকে নির্দেশ দিচ্ছেন, যুদ্ধের গনীমতের সম্পদের মধ্য হতে বাইতুল মালের জন্য স্বর্ণ ও চাঁদি রেখে দিবেন। এ ছাড়া আর সবকিছু মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দিবেন।

তখন তিনি তাঁর নিকট লিখে পাঠালেন,

"আমীরুল মু'মিনীনের কণ্ঠে তুমি আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছো আমি তা আল্লাহর কিতাবের খেলাফ পেয়েছি।"

তারপর তিনি মুজাহিদদের ডেকে বললেন, তোমরা তোমাদের গণীমতের মাল নিয়ে নাও...

তারপর তার এক পঞ্চমাংশ দামেস্কের দারুল খেলাফতে পাঠিয়ে দিলেন...

এ পত্র পৌঁছার পরের জুমআর দিন হযরত রবী ইবনে যিয়াদ রাযি. সাদা কাপড় পরে নামাযে গেলেন। লোকদের মাঝে জুমুআর খুতবা পাঠ করলেন। তারপর বললেন,

"হে লোক সকল! আমি জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে পড়েছি। আর আমি এখন দুআ করব। তোমরা আমার দুআয় আমীন বলবে।" অতঃপর বললেন,

"হে আল্লাহ! যদি আপনি আমার দ্বারা কোন কল্যাণ কামনা করেন তাহলে আমাকে অতি দ্রুত আপনার নিকট তুলে নিন"। লোকেরা তখন তার দুআয় আমীন বলল

সেদিনের সূর্য অস্তমিত হতে না হতেই রবী ইবনে যিয়াদ আল্লাহ পাকের সাক্ষাতে গিয়ে মিলিত হলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ

فَلْيَنْظُرْ إِلٰى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ

যদি কেউ কোন জান্নাতীকে দেখতে চায় তাহলে সে যেন আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম কে দেখে নেয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.

ইয়াসরিবে ইহুদীদের ধর্মীয় জ্ঞানে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মাঝে সবচেয়ে শীর্ষ ব্যক্তি ছিলেন হুসাইন ইবনে সালাম।

মদীনার লোকেরা ধর্মের ভিন্নতা সত্ত্বেও তাঁকে সম্মান করত। তাজীম করত। আর তিনি মানুষের মাঝে তাকওয়া-পরহেজগারী, সততা ও সত্যবাদিতা আর দৃঢ়চিত্ততার গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

*　　*　　*

হুসাইন উদ্বেহীন এক শান্ত জীবন যাপন করছিলেন; তবে সে জীবন ছিল সাধনাপূর্ণ ও ফলদায়ক।... তিনি তার জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন।

একটি অংশ গির্জায় ইবাদত-বন্দেগী ও উপদেশদানে কাটিয়ে দিতেন...

একটি অংশ বাগানে খেজুর গাছের পরিচর্যা করে, ডালপালা ছেঁটে তার যত্ন নিতেন...

আরেকটি অংশ দ্বীনের সুগভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে তাওরাতের সাথে কাটিয়ে দিতেন...

তাওরাত পাঠকালে ঐসব সংবাদ পর্যন্ত পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ থেমে থাকতেন যা মক্কায় এক নবীর আত্মপ্রকাশের সুসংবাদ দিত, যিনি পূর্ববর্তী নবীদের রিসালাতকে পরিপূর্ণতা দেবেন এবং তার ধারাবাহিকতা শেষ করবেন।

তিনি এই প্রতীক্ষিত নবীর গুণাবলী ও আলামতসমূহ অনুসন্ধান করে আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠতেন। কারণ তিনি যে শহরে প্রেরিত হয়েছেন তা সত্বর ত্যাগ করবেন এবং ইয়াসরিবকে তার হিজরত ও অবস্থান ক্ষেত্র বানাবেন।

যখনই তিনি এ সংবাদসমূহ পড়তেন বা তার অন্তরে এ চিন্তা উদয় হত; তিনি আল্লাহর নিকট আশা করতেন যেন আল্লাহ তার আয়ু বাড়িয়ে দেন। যাতে তিনি প্রত্যাশিত এ নবীর আত্মপ্রকাশ দেখতে পান। তাঁর সাক্ষাত লাভে ধন্য হন এবং প্রথম মু'মিন হতে পারেন।

* * *

আল্লাহ তাআলা হুসাইন ইবনে সালামের দু'আ কবুল করলেন। তাঁর আয়ু দীর্ঘ করলেন এবং হিদায়াত ও রহমতের নবী প্রেরিত হলেন।

আর তার সৌভাগ্য হল, তিনি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করলেন। তাঁর সাহচর্য অবলম্বন করলেন আর তাঁর উপর যে সত্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সে কুরআনের প্রতি ঈমান আনলেন ...

সুতরাং এখন হুসাইনকে কথা বলার অবকাশ দেয়া হোক যেন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি আমাদের নিকট বর্ণনা করতে পারেন। কারণ তিনিই সবচেয়ে ভাল করে বর্ণনা করতে পারবেন এবং সবচেয়ে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে সক্ষম। হোসাইন ইবনে সালাম রাযি. বলেন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মপ্রকাশের সংবাদ শুনে আমি তাঁর নাম, তাঁর বংশ পরিচয়, গুণাবলী, সময় ও স্থান সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে লাগলাম, এবং তার মাঝে ও আমাদের কিতাবে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা মিলাতে লাগলাম। পরিশেষে আমি তার নবুয়তের ব্যাপারে নিশ্চিত হলাম। তাঁর দাওয়াতের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলাম। তারপর আমি তা ইহুদীদের থেকে গোপন করে রাখলাম, এবং এ ব্যাপারে কথা বলতে আমি আমার জিহ্বাকে সংযত করলাম ...

এভাবে চলতে চলতে সে দিনটি ঘনিয়ে এল যেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে এলেন।

ইয়াসরীবে পৌঁছে তিনি কোবায় যাত্রা বিরতি করলেন। তখন এক লোক আমাদের নিকট এসে লোকদের আহ্বান করে তাঁর আগমনের কথা ঘোষণা করতে লাগল...

আমি তখন আমার এক খেজুর গাছের মাথায় ছিলাম সেখানে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস গাছের নিচে বসা ছিলেন। আমি সংবাদটি শুনেই আল্লাহু আকবার.....আল্লাহু আকবার বলে চিৎকার দিয়ে উঠলাম।

আমার ফুফু আমার তাকবীর ধ্বনি শুনে বললেন, আল্লাহ তোমাকে ব্যর্থ করুন ... আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি তুমি মূসা ইবনে ইমরানের আগমনের কথা শুনতে তাহলে এর চেয়ে একটুও বেশী করতে না...

আমি তখন তাকে বললাম, হে ফুফু। আল্লাহর শপথ করে বলছি তিনি তো মূসা ইবনে ইমরানের ভাই এবং সেই একই ধর্মের উপর তিনি প্রতিষ্ঠিত...

মূসা ইবনে ইমরান যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন তিনিও তা নিয়েই প্রেরিত হয়েছেন...

তখন তিনি নিরব হয়ে গেলেন আর বললেন, তাহলে কি তিনি সেই নবী যাঁর সম্পর্কে তোমরা বলতে যে, তিনি প্রেরিত হয়ে পূর্ববর্তীদের সত্যায়ন করবেন এবং তাঁর রবের রিসালাতে পরিপূর্ণতা দান করবেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ...

তিনি বললেন, তা হলে তা ঠিক আছে...

তারপর আমি সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গেলাম। আমি লোকদেরকে তাঁর দরজায় ভিড় করতে দেখলাম, এবং সেই ভিড় ঠেলে তার নিকটে পৌছলাম।

আমি সর্বপ্রথম তার যে কথা শুনতে পেলাম তা হল–

أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ ...

وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ...

وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ... تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

হে লোক সকল... তোমরা সবাই একে অপরকে সালাম দাও...

লোকদের আহার করাও...

মানুষ যখন ঘুমায় তখন তোমরা উঠে নামায পড়...

এবং নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ কর...

আমি তখন তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম এবং চোখ ভরে তাকে দেখতে লাগলাম। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে তার চেহারা কোন মিথ্যাবাদীর চেহারা নয়।

তারপর তাঁর নিকটবর্তী হলাম ও সাক্ষ্য দিলাম

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাসূল।

তখন তিনি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন... তোমার নাম কি?

আমি বললাম, হুসাইন ইবনে সালাম

তিনি বললেন, না, বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম। যে আল্লাহ আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আজকের পর থেকে এছাড়া আমার কোন নাম হোক আমি তা পছন্দ করি না।

তারপর আমি রাসূলুল্লাহর নিকট থেকে বাড়িতে ফিরে এলাম। আমি আমার স্ত্রীকে আমার সন্তানদেরকে ও পরিজনদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানালাম। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করল। তাদের সাথে আমার ফুফু খালেদাও ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধা ছিলেন...তারপর আমি তাদের বললাম, আমি তোমাদের অনুমতি দেয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ইহুদীদের থেকে গোপন রাখ!

তারা বলল, ঠিক আছে, তাই হবে।

তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ফিরে এলাম ও তাকে বললাম,

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিশ্চয় ইহুদীরা ভ্রান্ত ও মিথ্যা বলায় পারদর্শী এক জাতি...

আমি পছন্দ করছি, আপনি তাদের নেতৃস্থানীয়দের আপনার নিকট ডেকে আনুন।

আর আমাকে আপনার কোন কামরায় লুকিয়ে রাখুন তারপর তাদেরকে আমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ না জানিয়ে আমার মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করুন। তারপর তাদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিন।

কারণ তারা যদি জানে, আমি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছি তাহলে তারা আমার নিন্দা করবে। আমার ব্যাপারে সবধরণের দোষের অপবাদ দিবে। আর আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবে।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তার একটি কামরায় প্রবেশ করালেন তারপর তাদের ডেকে পাঠালেন এবং তাদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত করতে লাগলেন। তাদের ঈমান আনতে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। আর তারা তাদের কিতাবসমূহে যা জেনেছে তা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন...

তখন তারা তাঁর সাথে অন্যায়ভাবে তর্কে লিপ্ত হল এবং সত্য নিয়ে বাগবিতণ্ডা করতে লাগল আর আমি শুনতে থাকলাম। তারপর রাসূল তাদের ঈমান আনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলে বললেন, আচ্ছা বল তো তোমাদের মাঝে হুসাইন ইবনে সালামের মর্যাদা কেমন?

তারা বলল, তিনি আমাদের নেতা, আমাদের নেতার পুত্র, আমাদের মাঝে ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শী ও বিজ্ঞ ব্যক্তির পুত্র।

রাসূল বললেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছো, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তাহলে কি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে?

তারা বলল, আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি, তাঁর জন্য ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব নয়... আর আল্লাহ তাকে ইসলাম গ্রহণ করা থেকে হেফাজতে রাখুন।

তখন আমি বেরিয়ে এসে তাদের বললাম,

হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর মুহাম্মাদ যা নিয়ে এসেছেন তা কবুল করে নাও।

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা অবশ্যই জান, তিনি আল্লাহর রাসূল। আর তার নাম ও গুণাবলীসহ তাওরাতে তোমাদের কাছে তার পরিচয় লিপিবদ্ধ রয়েছে...

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি আল্লাহর রাসূল আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনছি। তাকে সত্যবাদী মনে করছি আর স্বীকার করছি যে, আমি তাকে চিনেছি।

তখন তারা বলল, তুমি মিথ্যে বলেছো, আল্লাহর কসম করে বলছি তুমি আমাদের মাঝে দুষ্ট লোক, দুষ্ট লোকের ছেলে। মূর্খ লোক। মূর্খ লোকের ছেলে। সব ধরনের দোষেই তারা আমাকে দোষারোপ করল।

তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম,

আমি কি আপনাকে বলি নি, নিশ্চয় ইহুদীরা মিথ্যা বলায় পারদর্শী ও ভ্রান্ত এক জাতি। তারা বিশ্বাসঘাতক ও পাপাচারে সিদ্ধহস্ত।

* * *

আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি. পিপাসার্ত ব্যক্তির ন্যায় ইসলাম গ্রহণে এগিয়ে এলেন, যাকে মুগ্ধ করেছে স্বচ্ছ পানির ঘাট...

তিনি কুরআনের আশেক হয়ে গেলেন; তাই সুস্পষ্ট আয়াতসমূহের তিলাওয়াতে তার জিহ্বা সর্বদা সিক্ত হয়ে থাকত...

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে লেগে রইলেন এমন কি তিনি ছায়ার চেয়েও বেশী তাঁর সঙ্গী হয়ে থাকলেন...

আর তিনি জান্নাতের জন্য আমলে নিজেকে উৎসর্গ করলেন। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এমন সুসংবাদ দিলেন যা সাহাবায়ে কেরামের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। প্রচারিত হয়ে গেল।

এ সুসংবাদের পশ্চাতে একটি ঘটনা আছে যা কাইস ইবনে আব্বাদ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

বর্ণনাকারী বলেন :

আমি মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদে এক ইলমের মজলিসে বসা ছিলাম।

মজলিসে এমন একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিল যাকে পেয়ে প্রতিটি লোক প্রীতি লাভ করে এবং তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠে। যার সংস্পর্শে হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে।

তিনি লোকদের সামনে হৃদয়গ্রাহী চমৎকার হাদীস বর্ণনা করতে লাগলেন ...

তারপর তিনি উঠে গেলে লোকেরা বলল, **কেউ যদি কোন জান্নাতী মানুষ দেখতে চায় তাহলে সে যেন এই লোকটিকে দেখে।**

আমি বললাম, ইনি কে?

লোকেরা বলল, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম

আমি তখন মনে মনে বললাম, তাহলে তো আল্লাহর কসম করে বলছি,

আমি তাকে অনুসরণ করেই ছাড়ব এবং আমি তার পিছু নিলাম... তিনি চলতে চলতে মদীনা থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম হলেন। অতঃপর তিনি তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন... আমি প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন।

তিনি বললেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! তোমার কী প্রয়োজন?

আমি তাকে বললাম, আপনি যখন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন তখন লোকদের বলতে শুনলাম, কেউ যদি কোন জান্নাতী মানুষ দেখতে চায় তাহলে সে যেন এই লোকটিকে দেখে।

তাই আমি আপনার পদচিহ্ন ধরে এসেছি আপনার খবরাখবর জানার জন্য আর এ বিষয়টি অবহিত হওয়ার জন্য যে, লোকেরা কিভাবে জানল যে আপনি জান্নাতী মানুষ।

তিনি বললেন, হে বৎস! জান্নাতীদের ব্যাপারে আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

আমি বললাম, তা সত্য... কিন্তু লোকেরা যা বলেছে নিশ্চয় তার কোন কারণ আছেন।

তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাকে সে কথা বলছি।

আমি বললাম, হ্যাঁ... বলুন! আর আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। তখন আমার নিকট এক লোক এসে বলল, উঠে পড়ুন। আমি উঠে পড়লাম। তখন সে আমার হাত ধরল। সহসা আমি আমার বাম পাশে একটি পথ দেখতে পেলাম। আমি সে পথে চলতে ইচ্ছে করলাম...

তখন লোকটি আমাকে বলল, তুমি এ পথে যেয়োনা; কারণ এটা তোমার পথ নয়...

এরপর আমি তাকিয়ে আমার ডান পাশে একটি সুস্পষ্ট পথ দেখতে পেলাম। তখন লোকটি আমাকে বলল,

তুমি এ পথে চলে যাও...

আমি এ পথে চলতে চলতে একটি সঙ্গীতময় বাগানে এসে পৌঁছলাম, যা সুদূর বিস্তৃত, গাঢ় সজীবতায় সমাচ্ছন্ন, অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত। তার মাঝে একটি লোহার স্তম্ভ; যার মূল মাটিতে আর তার শেষপ্রান্ত আকাশে গিয়ে মিশেছে।

তার উঁচুতে রয়েছে একটি স্বর্ণের আংটা

লোকটি আমাকে বলল, তুমি তাতে আরোহণ কর

আমি বললাম, আমি তা পারব না।

তখন একজন খাদেম এসে আমাকে তুলে ধরল। আমি উঠতে উঠতে স্তম্ভের একেবারে উঁচুতে পৌঁছে গেলাম এবং আমি দুহাতে আংটাটি মজবুত করে ধরলাম। সকাল পর্যন্ত আমি আংটাটিতে ঝুলে রইলাম।

পরদিন সকালে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এলাম। তার কাছে আমার স্বপ্নের কাহিনী বর্ণনা করলাম। তখন

তিনি বললেন...

তুমি তোমার বাম পাশে যে পথটি দেখেছো তা হল জাহান্নামীদের মধ্য হতে বামপন্থীদের পথ...

আর তুমি তোমার ডান পাশে যে পথটি দেখেছো তা হল জান্নাতীদের মধ্য হতে ডানপন্থীদের পথ...।

আর যে বাগান তার সজীবতা ও সৌন্দর্যে তোমাকে মুগ্ধ করেছে তা হল ইসলাম।

আর বাগানের মাঝে বিদ্যমান স্তম্ভটি হল দ্বীনের স্তম্ভ...

আর আংটাটি হল উরওয়াতুল উস্‌কা, জান্নাতের মজবুত আংটা,

আমরণ তুমি তা মজবুত করে আঁকড়ে ধরে থাকবে...

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.

كَانَ أَبِيْ خَامِسًا ..... وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম গ্রহণে আমার পিতা পঞ্চম ব্যক্তি ছিলেন...

তিনি সর্ব প্রথম ব্যক্তি যিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখেছেন।

–খালিদের মেয়ে

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.

নিবিড় শান্ত সমাহিত এক বিকালে সাঈদ ইবনে আস ইবনে উমাইয়া যার উপনাম আবু উহাইহা-হাজুনের শীর্ষে অবস্থিত তার বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এলেন। তিনি হারামে যাওয়ার ইচ্ছে করেছেন...

লাল রঙের মূল্যবান চমৎকার আমামাটি তিনি মাথায় বেঁধে নিয়েছেন। আর স্বর্ণসূত্রে সজ্জিত ইয়ামানের রাজা-বাদশাহদের চাদরটি কাঁধে ফেলে নিয়েছেন...

তার সামনে সামনে হাটছে তলোয়ারে সজ্জিত ক্রীত দাস। তাঁর ডান পাশে তাঁর কয়েকজন সন্তান। তাদের শীর্ষে তার ছেলে খালিদ।

আর তার বামপাশে স্বীয় গোত্র আবদে শামসের কিছু লোক। তারা রেশমী পোষাকে সজ্জিত হয়ে গর্বভরে হাটছে...

আবু উহাইহা হারামে পৌছতেই লোকেরা বলল,

"মুকুটধারী" লোকটি এসে গেছে... লোকেরা তাকে এ উপাধিতে আহ্বান করত; কারণ তিনি মাথায় আমামা পরলে তা খোলার আগ পর্যন্ত কুরাইশের কেউ সে রঙের আমামা পরত না। তখন লোকেরা তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের জন্য পথ করে দিল। তিনি কা'বা চত্বরে তার নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসলেন।

ইতিমধ্যে আবু সুফিয়ান, উৎবা ইবনে রবীআ, আবু জাহেল ইবনে হিশাম ও আরো অনেকে তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য এগিয়ে এল। তিনি তখন তাদের বললেন, কী খবর; শুনলাম সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস মুহাম্মাদের অনুসরণ করছে?!...

আরো শুনলাম সে কুরাইশের এক ব্যক্তির উপর দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে তার মাথা ফাঁটিয়ে দিয়েছে, রক্ত প্রবাহিত করেছে। কারণ সে তাকে আমাদের ইলাহ ছাড়া অন্য ইলাহের জন্য নামায পড়তে নিষেধ করেছে... তারপর বললেন, লাত ও উযযার কসম করে বলছি, তোমরা বনু হাশেমের

তোষামোদ করে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর সাথে যদি এ ধরনের উদাস আচরণ করতে থাক তাহলে কিন্তু আমি একাই তার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াব...

আর মক্কার আবু কাবশার পুত্রের ইলাহের পূজা অবশ্যই প্রতিহত করব...

তারপর তিনি তার শোভাযাত্রা নিয়ে ফিরে এলেন; একমাত্র তার ছেলে খালিদই পশ্চাতে রয়ে গেল।

* * *

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. হারামে থেকে মানুষের বিভিন্ন মজমায় যেতে লাগল এবং মুহাম্মাদের সংবাদসমূহ সংগ্রহ করতে লাগল ও তাঁর দাওয়াতী কাজ সম্পর্কে কী বলা হচ্ছে তা শুনতে লাগল।

কিন্তু সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যা কিছু শুনলো তাতে মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের প্রতি তার বাবাকে যেমন ক্ষিপ্ত হতে দেখেছে এবং কুরাইশ নেতাদের অন্তরে এদের প্রতি যেমন বিদ্বেষ আর ঘৃণা সে প্রত্যক্ষ করেছে তার কোন কারণ বা যুক্তি খুঁজে পেলো না। রাত ঘনিয়ে এলে খালিদ ইবনে সাঈদ বাড়িতে ফিরে এল এবং তার শয্যায় চলে গেল। অন্যান্য দিনের মত সন্ধ্যার শুভেচ্ছা জানানোর জন্য তার পিতার কামরার পাশ দিয়ে গেল না, ঘরে ঢুকে সে তার কোমল বিছানায় ঘুমানোর ইচ্ছায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু খালিদ ঘুমাতে পারলো না। ঘুমের সুরমা মেখে চোখ দু'টো তার বুজে এলো না। অনিদ্রা তাকে পেয়ে বসল যা তার চোখ থেকে ঘুমকে উড়িয়ে দিল।

মুহাম্মাদ, তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম এবং ইসলাম গ্রহণ করলে তার পিতা তাকে পরাক্রমশালী ব্যক্তিদের ন্যায় যেভাবে পাকড়াও করবে সে ভয় তার হৃদয়কে আচ্ছন্ন ও ব্যতিব্যস্ত করে রাখল। রাতের শেষ প্রহরে তন্দ্রা তাকে দুর্বল করে ফেলল। তাই সে তার দু'চোখকে ঘুমের জন্য সমর্পণ করে দিল।

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই বিবর্ণ চেহারায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঘুম থেকে

লাফিয়ে উঠল। স্বপ্নে যা দেখেছে তার ভয়াবহতায় সে কাঁপছে ... যা সে প্রত্যক্ষ করেছে তার প্রচণ্ডতায় সে হাঁপাচ্ছে। সে বলল,

আল্লাহর কসম! নিশ্চয় এ স্বপ্ন একটি সত্য স্বপ্ন... নিঃসন্দেহে আমি মিথ্যা কিছু দেখি নাই।

* * *

খালিদ দেখল, জাহান্নামের এক গভীর বিস্তৃত উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছে। চোখ তার প্রান্ত দেখতে পায় না। মানুষ তার গভীরতার কথা জানে না...

এ উপত্যকায় দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন; যার গর্জন আর চিৎকার হৃদয়কে নিঃশেষ করে দেয় আর প্রাণকে নিষ্পেষিত করে।

যখনই সে উপত্যকার তীর থেকে দূরবর্তী হতে চাইল তখন তার পিতা বেরিয়ে এল এবং প্রচণ্ড শক্তিতে তাকে জাহান্নামের দিকে টানতে লাগল। তখন সে তার পিতার সাথে প্রচণ্ডভাবে ধস্তাধস্তি শুরু করল...

সর্বশক্তি দিয়ে মল্ল যুদ্ধ শুরু করল। অবশেষে যখন তার প্রতিজ্ঞা দুর্বল হয়ে এল আর সে জাহান্নামে নিপতিত হওয়ার উপক্রম হল...

এমন সময় দেখতে পেল মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তার দিকে এগিয়ে আসছেন এবং দু'হাতে তার কোমড়বন্ধ আঁকড়ে ধরছেন এবং তাঁর নিকট টেনে নিচ্ছেন আর তাঁকে জাহান্নামের উপত্যকায় নিপতিত হওয়া থেকে উদ্ধার করছেন।

* * *

ঊষার আলো ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই খালিদ ইবনে সাঈদ আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর বাড়িতে গেল... কারণ, সে তাঁর সংস্পর্শে অন্তরঙ্গতা অনুভব করত ও প্রশান্ত হত।

তারপর তার স্বপ্নের কথা বলল। তখন আবু বকর রাযি. বললেন...

হে খালিদ, আল্লাহ তোমার কল্যাণ কামনা করেছেন...

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য ও হিদায়াতের ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন...

সত্বর এ ধর্ম সকল ধর্মের উপর বিজয় লাভ করবে যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে ...

হে খালিদ তুমি অনুসরণ কর।

যদি তুমি তার অনুসারী হও তাহলে তোমার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে আর তোমার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেয়া হবে...

আর তোমার পিতা জাহান্নামে নিপতিত হবে যেখানে সে তোমাকে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে করেছিল...

* * *

খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন...

সেদিন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপনে মক্কার এক উপত্যকায় ইবাদত করছিলেন। খালিদ তাকে সালাম দিয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ তুমি আমাদেরকে কিসের দিকে আহবান করছো?

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের একথার দিকে আহবান করছি যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহর উপর ঈমান আনবে, যার কোন শরীক নেই। আর আমি তাঁর বান্দা ও রাসূল... আর তোমরা যে পাথর পূজায় লিপ্ত রয়েছো তা থেকে সরে আসো...

যা দেখে না, শুনে না...

যা ক্ষতি করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না...

যে পার্থক্য করতে পারে না, কে তার পূজা করল আর কে তার থেকে বিমুখ হয়ে রইল...

তখন খালিদের চেহারার রেখাগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তাই খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. ছিলেন ইসলাম গ্রহণকারী পাঁচজনের মধ্যে পঞ্চম ব্যক্তি অথবা ছয় জনের মধ্যে ষষ্ঠ ব্যক্তি... যেহেতু

খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, যায়েদ ইবনে হারেসা, আলী ইবনে আবু তালেব, আবু বকর সিদ্দীক, সাআদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি. ছাড়া কেউ এ মহা অনুগ্রহের দিকে তাঁর আগে ধাবিত হয়নি।

* * *

হযরত খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. হাজুনের শীর্ষে অবস্থিত তার পিতার উচুঁ প্রাসাদে অবস্থান করলেন। তিনি তাঁর সজীবতা আর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরা জীবন ত্যাগ করলেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হলেন। তিনি তাঁর সাথে ও তার সঙ্গীদের সাথে মক্কার উপত্যকায় উপত্যকায় চলাফেরা করতে লাগলেন। আর ঈমানের অনুভূতি ও শক্তিসমূহ থেকে উপকৃত হতে লাগলেন...

তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ আয়াতসমূহ মুখস্থ করতে লাগলেন আর কুরাইশদের নির্যাতনের ভয়ে গোপনে ইবাদত করতে লাগলেন...

বাড়িতে খালিদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হলে তার পিতা তাঁকে খুঁজলেন; কিন্তু পেলেন না। তখন তার পশ্চাতে গুপ্তচর লাগিয়ে দিলেন।... সংবাদ এল, সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ও মুহাম্মাদের অনুসরণ করেছে।

* * *

মক্কার সরদারকে প্রচণ্ড পাগলামীতে পেয়ে বসল। সে কখনো ধারণা করেনি, তার ছেলেদের কেউ এতো দুঃসাহসী হয়ে যাবে যে সে তার ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। লাত-উযযার কুফুরী করবে আর মুহাম্মাদের সাথে গিয়ে মিলিত হবে।

সে নিজের গোলাম রাফে তার দু ভাই আবান ও উমরকে তার নিকট পাঠাল। তারা তাকে এক উপত্যকায় এমনভাবে নামায আদায় করতে দেখল যা তাদের হৃদয়ে কাঁপন ধরিয়ে দিল...

তাদের অন্তরকে স্থিরতা আর প্রশান্তিতে ভরে দিল...

তাদের মনকে শান্তি ও নিরাপত্তায় পরিপূর্ণ করে দিল...

তারা তাঁকে বলল, তোমার পিতা তোমাকে সাক্ষাতের জন্য ডাকছে। তার অনুমতি ছাড়া গৃহ ত্যাগ করার কারণে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

খালিদ রাযি. তাদের সাথে গেলেন। পিতার নিকট পৌঁছে তিনি তাকে ইসলামী তরীকায় সালাম দিলেন।

পিতা বললেন, তোর ধ্বংস হোক। পিতামাতা, পূর্বপুরুষ আর নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছো আর মুহাম্মাদকে অনুসরণ করেছো?

খালিদ বললেন, আমি কোন ধর্ম ত্যাগ করিনি। আমি শুধুমাত্র এক আল্লাহর উপর ঈমান এনেছি আর তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তকে সত্যায়িত করেছি।....

আল্লাহকে বাদ দিয়ে আপনারা যে মূর্তিগুলোর পূজা করছেন আমি সেগুলোকে ত্যাগ করেছি...

তখন তার পিতা বলল: ছি, ছি, তুমি একি কথা বললে যে, তুমি এ নবুয়তের মিথ্যা দাবীদারকে সত্যায়িত করেছো?

খালিদ বললেন, তিনি তো নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার নন...

নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী; তিনি তার রবের রিসালাত প্রচার করেন...

আমার আপনার ও সকল মানুষের কল্যাণ কামনা করেন।

তার পিতা বলল, অবশ্যই তোমাকে তা থেকে বিমুখ হতে হবে এবং তাকে মিথ্যাবাদী বলতে হবে।

খালিদ বললেন, যতদিন পর্যন্ত আমার শিরা স্পন্দিত হবে আমি তা করব না...

পিতা বলল, তাহলে আমি তোমাকে আমার অর্থসম্পদ থেকে বঞ্চিত করব।

খালিদ রাযি. বললেন, আমি আপনার থেকে যার অপেক্ষা করছিলাম তা তার চেয়ে অনেক সহজ, অনেক তুচ্ছ...

যে আল্লাহ আপনাকে অর্থসম্পদ দান করেছেন তিনি আমাকে তা দান করবেন।

বনু আবদে শামসের সরদার তখন ক্রোধে ফেটে পড়ল...(নিজ হাতে) তৈরী মজবুত লাঠি নিয়ে তাঁর উপর ঝাপিয়ে পড়ল। তার মাথা ফাটিয়ে দিল ও রক্ত প্রবাহিত করল...

তাকে এমনভাবে মারতে লাগল যে, তার মাথা ও শরীর থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

তারপর তাকে মজবুত করে বাধা হল এবং একটি অন্ধকার কামরায় বন্দী করে রাখা হল...

তিন দিন পর্যন্ত তাকে খাবার ও পানীয় দেয়া হল না...

চতুর্থ দিনে তার পরিবারের লোকেরা এসে বলল,

হে খালিদ, তুমি কেমন আছো?

তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহর নেয়ামতে পরম সুখে আছি। তারা বলল, এখনো কি তেমার সময় আসেনি যে, তুমি তোমার বুদ্ধিমত্তায় ফিরে আসবে ও তোমার পিতাকে অনুসরণ করবে।

তিনি বললেন, আমার বুদ্ধিমত্তার কথা বলছো; তা তো কখনো আমার থেকে দূরীভূত হয়নি আর আমিও কখনো তা থেকে দূরীভূত হইনি...

আর পিতার কথা বলছো; আমি তো আল্লাহর অবাধ্যতায় তার আনুগত্য করব না...

তারা বলল, তুমি তোমার পিতাকে একটি কথা শুনিয়ে দাও যা লাত ও উযযার ব্যাপারে তাকে সন্তুষ্ট করবে তাহলে তিনি তোমাকে মুক্ত করে দিবেন...

তিনি বললেন, নিশ্চয় লাত ও উযযা অন্ধ বধির দু'টি পাথর...

আর আমি তো তাদের ব্যাপারে এমন কথাই বলব যা আল্লাহ ও তার রাসূলকে সন্তুষ্ট করবে... আর তিনি আমার সাথে যা ইচ্ছে তা করুন।

* * *

আবু উহাইহা খালিদ রাযি. কে মজবুত করে বাঁধলেন।

অনুসারীদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন প্রত্যেক দিন দ্বিপ্রহরে তাকে

নিয়ে মক্কার অঞ্চলে যায়... আর তাকে পাথরের মাঝে ফেলে রাখে যেন সূর্যতাপ তাকে দগ্ধ করে।

তাই যখনই তারা তাকে নিয়ে যেত এবং দ্বিপ্রহরে তাকে ফেলে আসত তখন তিনি বলতেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَکْرَمَنِیْ بِالْاِیْمَانِ وَاَعَزَّنِیْ بِالْاِسْلَامِ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি আমাকে ঈমান দ্বারা সম্মানিত করেছেন ও ইসলাম দ্বারা ইজ্জত দান করেছেন...

আবু উহাইহা আমাকে যে জাহান্নামে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছে তার এক মুহূর্তের শাস্তির চেয়ে তা আমার নিকট অনেক সহজ....

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ও বন্ধুকে আমার পক্ষ ও মুসলমানদের পক্ষ হতে উত্তম বিনিময় দান করুন।

তারপর খালিদ রাযি. এর জন্য একটি সুযোগ ঘনিয়ে এল। তিনি তার পিতার কারাগার থেকে পালিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে গেলেন...

এর কিছুদিন পরই তাঁর দুই ভাই উমর ও আবান তাঁর সাথে এসে মিলিত হলেন এবং তার সাথে কল্যাণ ও আলোর মিছিলে যোগ দিলেন... তখন আবু উহাইহা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বললেন,

লাত ও উযযার শপথ করে বলছি, আমি আমার সম্পদ নিয়ে মক্কা থেকে দূরে চলে যাব। তাই আমার জন্য শ্রেয়...

আর ঐসব ধর্মত্যাগীদের ত্যাগ করব যারা আমার ইলাহ ও আমার রবকে দোষারোপ করে।

অতঃপর সে তায়েফের নিকটবর্তী এক গ্রামে চলে গেল এবং সেখানে মুশরিক অবস্থায় আক্ষেপ নিয়ে মৃত্যুবরণ করল।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করলে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. সেখানে চলে গেলেন। তার সাথে ছিল তার স্ত্রী আমীনা বিনতে খালফ খুজায়ী (রাযি.)... সেখানে তিনি দশ বৎসরের অধিককাল অবস্থান করে

লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাকলেন। আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানদের জন্য খায়বর বিজয় দান করার পরই তিনি হাবশা ত্যাগ করে মদীনায় আসলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং যোদ্ধা সাহাবীদের মত তাকেও গণীমতের সম্পদ থেকে অংশ প্রদান করলেন...

তারপর তাঁকে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকাল পর্যন্ত তিনি সেখানেই গর্ভনর হয়ে রইলেন।

* * *

খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর খিলাফত কালে খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি. রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য শামে গমনকারী মুজাহিদ বাহিনীর পতাকাতলে এসে সমবেত হলেন। তারপর তিনি জিহাদের ময়দানগুলোতে এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করলেন যা তার মত বীর অশ্বারোহী যোদ্ধার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দামেস্কের অনতিদূরে সংগঠিত মারজুস সুফরের যুদ্ধের আগে খালিদ রাযি. উম্মে হাকীম বিনতে হারেস রাযি. কে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। তার সাথে বিয়ের আকদ সম্পন্ন হল। অতঃপর খালিদ রাযি. মধু যামিনী করতে চাইলে উম্মে হাকীম রাযি. বললেন,

হে খালিদ! এটা কী ভাল হত না যদি রণাঙ্গনে সমাগত লোকেরা রণাঙ্গন থেকে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করতে।

তখন খালিদ রাযি. তাঁকে বললেন, আমার মন বলছে আমি এ যুদ্ধে আক্রান্ত (শহীদ) হব।

তারপর তিনি তার সাথে মধুযামিনী করলেন...

তার পরদিন সকালে সাথীদের জন্য ওলীমার আয়োজন করলেন। খাবার শেষ হতে না হতেই রোমান সৈন্যরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল...

রোমান বাহিনীর এক অশ্বারোহী বেরিয়ে মল্লযুদ্ধ আহবান করল। হাবীব ইবনে সালামা বেরিয়ে এলেন এবং তাকে হত্যা করলেন...

আরেকজন অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে মল্লযুদ্ধ আহবান করল। তখন খালিদ ইবনে সাঈদ বেরিয়ে এলেন...

তারা একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আক্রমণ করল...

তারপর প্রত্যেকে একে অপরের উপর মরণ আঘাত করল।

রোমান যোদ্ধার তরবারী আঘাত করতে সক্ষম হল আর খালিদ রাযি. এর তরবারী ভুল করল। ফলে তিনি শাহাদত বরণ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর উভয় বাহিনী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নির্মম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে লাগল। মাথায় তরবারীর আঘাত নিপতিত হওয়ার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছিল না।

তখন উম্মে হাকীম রাযি. সন্তানহারা বাঘিনীর ন্যায় লাফিয়ে উঠলেন। বাসর রাতের কাপড় মজবুত করে বাঁধলেন...

টেনে তাবুর খুটি তুলে ফেললেন যা তাদের বাসর রাত অবলোকন করেছে এবং যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন...

সাতজন অশ্বারোহী রোমান যোদ্ধাকে হত্যা করলেন।

তারপরও তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয়ের ঘোষণা করে রণাঙ্গন খালি হয়ে গেল।

* * *

এ বিজয়ের মূল্য ছিল কিছু পূত পবিত্র প্রাণ যারা তাদের রবকে সন্তুষ্ট করে ও তারা সন্তোষভাজন হয়ে তাদের রবের নিকট চলে গেছেন...

আর খালিদ ইবনে সাঈদ ইবনে আস রাযি.-এর রূহ তখন তাদের মাঝে আনন্দ আর উল্লাসে ডানা ঝাপটাচ্ছিল।

আর তার হত্যাকারী স্বচোখে দেখতে পেল একটি নূর আকাশের কোলে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তারপর তা খালিদ রাযি. এর উপর ও তার সামনে ঝলমল করতে লাগল...

ফলে সে তাঁকে হত্যা করার কারণে খুব লজ্জিত হল...

আর এটাই আল্লাহর ধর্মে প্রবেশকারীদের সাথে তার প্রবেশ করার কারণ হল।

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি.

إِنَّ لِعُتْبَةَ بنِ غَزْوَانَ

مِنَ الْإِسْلَامِ مَكَانًا

- عمر بن الخطاب

নিশ্চয় ইসলামে উৎবা ইবনে গাযওয়ানের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

—উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি.

ইশার নামাযের পর আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. তার শয্যায় গেলেন। রাতের পরিভ্রমণে সহায়তার জন্য একটু বিশ্রাম নেয়ার ইচ্ছে করছিলেন। কিন্তু খলীফার দু'চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে। কারণ দূত তাঁর নিকট সংবাদ নিয়ে এসেছে যে, যখনই মুসলিম বাহিনী পরাজিত প্রায় পারস্য বাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে উপক্রম হচ্ছে তখনই এদিক সেদিক থেকে তাদের নিকট সাহায্য আসছে। তাই মুসলিম বাহিনী তার শক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারছে না। নব উদ্যমে যুদ্ধ করতে পারছে না।

তাকে বলা হল, 'উবুল্লা' শহরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস মনে করা হয় যা পরাজিত পারস্য বাহিনীকে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করছে।

তাই 'উবুল্লা' শহর বিজয়ের জন্য এবং পারস্য বাহিনীকে সাহায্য বন্ধের জন্য তিনি একটি মুজাহিদ বাহিনী পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করলেন। কিন্তু যোদ্ধার স্বল্পতার কারণে তিনি বাধাপ্রাপ্ত হলেন।

কারণ মুসলমানদের যুবক প্রৌঢ় বৃদ্ধ সবাই পৃথিবীর দূর-দূরান্তে আল্লাহর পথে জিহাদে বেরিয়ে গেছে। তাই মদীনায় অল্প কিছু মানুষই বাকি আছে।

তাই তিনি তার পরিচিত পন্থাই অবলম্বন করলেন

তা হল সেনাপতির শক্তির মাধ্যমে যোদ্ধার স্বল্পতাকে পুষিয়ে নেয়া...

তাই তিনি তাঁর সামনে তাঁর লোকদের তুনীর ছড়িয়ে দিলেন এবং একের পর একজনকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সহসা তিনি চিৎকার করে উঠলেন,

পেয়ে গেছি...

হ্যাঁ... পেয়ে গেছি...

অতঃপর একথা বলতে বলতে বিছানায় গেলেন,

নিশ্চয় তিনি একজন মুজাহিদ বটে; বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য রণক্ষেত্রগুলো তাকে চিনেছে...

ইয়ামামা ও তার রণক্ষেত্র তাকে প্রত্যক্ষ করেছে কোন তরবারী তাকে আঘাত করতে পারেনি। তার কোন আঘাত ব্যর্থ হয়নি...

তদুপরি তিনি হাবশা ও মদীনায় হিজরত করেছেন আর পৃথিবীতে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে তিনি সপ্তম ব্যক্তি ছিলেন...

সকালে তিনি বললেন, উৎবা ইবনে গাযওয়ানকে ডেকে আন।

তিনি তাঁকে তিন শত দশের চেয়ে কিছু বেশী লোকের সেনাপতি বানিয়ে পতাকা বেঁধে দিলেন...

আর তিনি তাকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, অতিরিক্ত যোদ্ধা পেলেই তিনি পর্যায়ক্রমে তাঁকে সাহায্য করতে থাকবেন।

* * *

ছোট বাহিনীটি যাত্রা করতে ইচ্ছে করলে হযরত উমর ফারুক রাযি. তার সেনাপতি উৎবাকে বিদায় জানাতে ও অন্তিম উপদেশ দিতে দাঁড়িয়ে বললেন,

'হে উৎবা, আমি তোমাকে 'উবুল্লা' শহরে পাঠাচ্ছি আর তা শত্রুদের একটি মজবুত দুর্গ। সুতরাং আমি আল্লাহর নিকট আশা করি তিনি তোমাকে সাহায্য করবেন।

সুতরাং তুমি সেখানে গিয়ে পৌঁছলে তার অধিবাসীদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। যে তোমার আহবানে সাড়া দিবে তুমি তাকে গ্রহণ করে নিবে। আর যে অস্বীকার করবে তুমি তার থেকে লাঞ্ছনা ও তুচ্ছতার জিযিয়া কর গ্রহণ করবে ....

আর তা না হলে তুমি নির্মমভাবে তাদের গর্দানে তরবারী চালাও

আর হে উৎবা! তোমাকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর...

সাবধান! তোমার নফস যেন তোমাকে অহংকারের দিকে আহ্বান না করে যা তোমাকে ধ্বংস করে দিবে। আর মনে রেখো তুমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য অবলম্বন করেছো। তাই আল্লাহ তোমাকে লাঞ্চনার পর ইজ্জত দান করেছেন। দুর্বলতার পর শক্তি দান করেছেন। ফলে তুমি ক্ষমতাবান আমীর হয়েছো। অনুসৃত নেতা হয়েছো। তুমি কথা বললে তা শ্রবণ করা হয়। তুমি নির্দেশ দিলে তোমার নির্দেশকে মানা হয়... সুতরাং তা কত বড় নেয়ামত যদি তা তোমাকে অহংকারে না ফেলে, প্রবঞ্চিত না করে, আর তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ না করে। আল্লাহ তোমাকে ও আমাকে তা থেকে রক্ষা করুন।

*　　*　　*

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. তার বাহিনী নিয়ে ছুটে চললেন। তাঁর সাথে রয়েছে তাঁর স্ত্রী ও পাঁচজন নারী যারা অন্যান্য মুজাহিদদের বোন ও স্ত্রী। অবশেষে তারা 'উবুল্লা' শহরের অনতিদূরে অবস্থিত একটি আখ ক্ষেতের নিকটে যাত্রা বিরতি করলেন।

তাদের সথে খাবারের কোন কিছু ছিল না...

ক্ষুধা প্রচণ্ড আকার ধারণ করলে হযরত উৎবা রাযি. তাঁদের কয়েকজনকে বললেন, আমাদের জন্য এ অঞ্চল থেকে খাবারের কিছু নিয়ে এস।

তারা তখন ক্ষুধা নিবারণের জন্য কিছু তালাশ করতে লাগলেন। খাবারকে কেন্দ্র করে তাদের একটি ঘটনা ঘটল যা তাদের একজন বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

আমরা যখন খাওয়ার কিছু খুঁজছিলাম তখন ঘনপাতা বিশিষ্ট বৃক্ষরাজির মাঝে প্রবেশ করলাম। সহসা আমরা সেখানে দুটি থলে পেলাম। তার একটিতে কিছু খেজুর আছে আর অপরটিতে হলুদ আবরণে আচ্ছাদিত সাদা ছোট ছোট শস্য। আমরা সেগুলো টেনে সেনাবাহিনীর নিকটে নিয়ে এলাম। আমাদের একজন শস্যদানায় ভরা থলেটি দেখে বলল, এটা বিষ। শত্রুরা তোমাদের জন্য তা প্রস্তুত করে রেখেছে। তাই কিছুতেই তার নিকটবর্তী হয়ো না..

তখন আমরা খেজুরের দিকে মনোযোগী হলাম ও তা থেকে খেলাম...

আমরা যখন খাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ একটি ঘোড়া তার বন্ধন ছিঁড়ে শস্যের থলেটির দিকে গেল এবং তা থেকে খেতে লাগল। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমরা তখন ঘোড়াটিকে মৃত্যুর পূর্বে তার গোশত দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্য জবাহ করতে ইচ্ছে করলাম।

তখন তার মালিক এসে বলল, তাকে ছেড়ে দাও। আজ রাত আমরা তাকে পাহারা দেব। তার মৃত্যুর বিষয়টি টের পেলেই তাকে যবাহ্ করে ফেলব... সকালে আমরা ঘোড়াটি সুস্থ পেলাম। তার কোন ক্ষতি হয়নি।

তখন আমার বোন বলল,

ভাই! আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, বিষকে যদি আগুনে রেখে পাক করা হয় তাহলে তা কোন ক্ষতি করে না।

তারপর আমি কিছু শস্য নিলাম। তা পাতিলে রাখলাম এবং তার নিচে আগুন জ্বালালাম

তার কিছুক্ষণ পরই সে বলে উঠল, এস... দেখে যাও তার রং কিভাবে লাল হয়েছে। তারপর তার আবরণ ফেটে যেতে লাগল ও তার থেকে তার সাদা দানাগুলো বেড়িয়ে পড়তে লাগল।

তারপর আমরা তা খাওয়ার জন্য পাত্রে রাখলাম। তখন হযরত উৎবা রাযি. আমাদের বললেন,

তোমরা খাওয়ার পূর্বে আল্লাহর নাম স্মরণ কর ও খাও...

তারপর আমরা তা খেলাম ও অত্যন্ত স্বাদ পেলাম।

তারপর আমরা জানতে পারলাম, তার নাম চাল।

* * *

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. তার ছোট বাহিনী নিয়ে যে 'উবুল্লা শহরের' অভিমুখী হয়েছেন তা দাজলা নদীর তীরে অবস্থিত একটি দুর্গবেষ্টিত শহর ছিল...

পারসিকরা তাকে তাদের অস্ত্রের গুদাম বানিয়েছিল।

তারা তার দুর্গের বুরুজগুলোকে শত্রুদের পর্যবেক্ষণ করার স্থান বানিয়েছিলো।

কিন্তু যোদ্ধার স্বল্পতা ও অস্ত্রের অল্পতা সত্ত্বেও উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. কে তা আক্রমণ করতে বাধা দিল না...

কারণ তার সাথে ছয়শত যোদ্ধা ছিল আর তাদের সঙ্গী ছিল অল্প কয়েকজন নারী।

তরবারী আর বর্শা ছাড়া তার নিকট অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তাই বুদ্ধিমত্তাকে ব্যবহার করা ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না।

* * *

উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. মহিলাদের জন্য কিছু পতাকা তৈরী করে তা বর্শার মাথায় উঁচু করে দিলেন....

তাদের নির্দেশ দিলেন, তারা যেন বাহিনীর পশ্চাতে চলতে থাকে আর তাদের বলে দিলেন–

আমরা যখন শহরের নিকটবর্তী হব তখন তোমরা আমাদের পশ্চাতে থেকে ধূলি উড়াতে থাকবে এমনকি ধূলিতে চারদিক ভরে ফেলবে।

তারা উবুল্লার নিকটবর্তী হলে পারসিক সৈন্যরা বেরিয়ে এল। তারা তাদের অগ্রবাহিনীকে দেখতে পেল। আর ঐ পতাকাগুলোকে দেখতে পেল যা তাদের পশ্চাতে পত পত করে উড়ছে।

তার ধূলি বালি দেখতে পেল যা তাদের পশ্চাতে চারদিক আচ্ছন্ন করে আছে...

তখন তারা একে অপরকে বলল, নিশ্চয় এরা অগ্রগামী বাহিনী। এদের পশ্চাতে বিশাল বাহিনী রয়েছে যা ধূলি উড়িয়ে আসছে। আর আমরা তো অল্প কয়েকজন....

অতঃপর তাদের অন্তরে ভয় সঞ্চারিত হল। আতঙ্ক তাদের পেয়ে বসল। তারা যে সব বস্তু হালকা অথচ মূল্যবান তা বহন করে নিল এবং দাজলায় ভিড়ানো জাহাজে আরোহণ করার জন্য ছুটে চলল।

উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. কোন যোদ্ধাকে না হারিয়েই 'উবুল্লা' শহরে প্রবেশ করলেন...

অতঃপর তার পার্শ্ববর্তী শহর ও গ্রামগুলো বিজয় করলেন। তা থেকে এতো গণীমতের মাল পেলেন যা গণনা করা কঠিন। যা সকল অনুমান ছাড়িয়ে গেল। এমনকি তাদের একজন মদীনায় ফিরে গেলে লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল,

মুসলমানগণ 'উবুল্লা শহরে' কেমন আছে?

তখন সে বলল, তোমরা কিসের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছো?...

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাদের ছেড়ে এসেছি যখন তারা সোনা আর চাঁদি পাত্র দিয়ে মাপছিল।... তখন লোকেরা উবুল্লার দিকে যেতে লাগল।

* * *

তখন উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. দেখলেন, বিজিত শহরে মুজাহিদ বাহিনী বসে থাকলে তা তাদেরকে আরামদায়ক জীবন যাপনে অভ্যস্ত করে তুলবে। সে শহরের অধিবাসীদের আচার-আচরণে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে। আর অবিরাম যুদ্ধের ব্যাপারে তাদের প্রতিজ্ঞার ধার কমে যাবে। তাই তিনি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. এর নিকট বসরা শহরের পত্তন ঘটানোর অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি নির্বাচিত স্থানটির বিবরণ দিলেন। তখন হযরত উমর রাযি. তাঁকে অনুমতি প্রদান করলেন।

* * *

হযরত উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. নতুন শহরের নকসা তৈরী করলেন...

তিনি সর্বপ্রথম তার বিশাল মসজিদটি তৈরী করলেন...

আর এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই...

মসজিদের জন্যই তো তিনি নিজে ও তার সঙ্গী সাথীরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছেন...

তারপর সৈন্যবাহিনী জমিন গ্রহণ করতে ও বাড়ি বানাতে অগ্রসর হলেন...

কিন্তু উৎবা ইবনে গাযওয়ান নিজের জন্য একটি ঘরও তৈরী করলেন না। তিনি কাপড়ের তৈরী একটি তাবুতেই বসবাস করতে থাকলেন...

তা এ কারণে যে তিনি তার অন্তরে একটি বিষয়কে গোপন করে রেখেছিলেন...

* * *

উৎবা ইবনে গাযওয়ান রাযি. দেখলেন, বসরায় মুসলমানদের দিকে দুনিয়া এভাবে ধাবিত হয়েছে যে তা তাদেরকে বিমোহিত করে ফেলছে।

কিছুদিন পূর্বে তাঁর সঙ্গী সাথীরা সিদ্ধ করা ধানের চেয়ে উত্তম খাবার চিনত না। অথচ তারা আজ খুব স্বাদ করে পারসিকদের খাবার ফালুদা আর কলায় তৈরী মিষ্ঠান্ন দ্রব্য ও অন্যান্য খাবার মজা করে খাচ্ছে এবং তারা তা ভাল মনে করছে।

তাই তিনি দুনিয়ার কারণে দ্বীনের ব্যাপারে আশংকা বোধ করলেন...

দুনিয়ার কারণে আখেরাতের ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত হলেন...

তাই তিনি কুফার মসজিদে লোকদের সমেবেত করলেন এবং বক্তৃতা দিয়ে বললেন,

হে লোকসকল! নিশ্চয় দুনিয়া তার ধ্বংসের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে। আর তোমরা দুনিয়া ছেড়ে এমন নিবাসে যাবে যেখান থেকে কখনো প্রস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা সেখানে তোমাদের উত্তম আমল নিয়ে যাও....

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সপ্তম ব্যক্তি ছিলাম। গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছু ছিল না। এমনকি তা খেয়ে আমাদের মাড়ি ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেত...

একদিন আমি একটি চাদর কুড়িয়ে পেলাম। তারপর তা আমি ও সা'আদ ইবনে আবি ওয়াককাস দু'ভাগে ভাগ করে নিলাম। তার অর্ধেক দিয়ে আমি লুঙ্গি বানালাম আর সা'আদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস তার অন্য অর্ধেক দিয়ে লুঙ্গি বানালেন..

আর এখন আমাদের প্রত্যেকে কোন না কোন শহরের শাসক...

আর আমি আল্লাহর নিকট এ বিষয় থেকে আশ্রয় চাচ্ছি যে, আমি

আমার নিকট একজন মহান ব্যক্তি হব অথচ আল্লাহর নিকট হব একজন তুচ্ছ মানুষ...

তারপর তিনি তাদের মধ্যে থেকে একজনকে স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করলেন এবং তাদের বিদায় জানিয়ে মদীনায় চলে এলেন।

খলীফা হযরত উমর ফারুক রাযি. এর নিকট পৌঁছে তিনি শাসনকর্তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তিনি তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করলেন না। তিনি বার বার তার নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করলেন আর খলীফা হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি. বার বার তাকে দায়িত্ব নিতে জেদ করলেন এবং তাকে বসরায় ফিরে যেতে নির্দেশ দিলেন... তখন তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত উমর রাযি. এর নির্দেশ মেনে নিলেন ও উটে আরোহণ করতে করতে বললেন,

اَللّٰهُمَّ لَا تُرَدَّنِيْ إِلَيْهَا

اَللّٰهُمَّ لَا تُرَدَّنِيْ إِلَيْهَا

হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিবেন না...

হে আল্লাহ! আমাকে সেখানে ফিরিয়ে নিবেন না...

আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করলেন। ফলে তিনি মদীনা থেকে অনতিদূরে যেতে না যেতেই তার উষ্ট্রী হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আর তিনি উট থেকে পড়ে গেলেন...

এবং দুনিয়া ত্যাগ করে পরপারের পথে রওনা হলেন...

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি.

نُعَيْمِ بنِ مَسْعُوْدٍ

رَجُلٌ يَعْرِفُ

اَنَّ الْحَرْبَ خدْعَةٌ

নুয়াইম ইবনে মাসউদ এমন একজন মানুষ

যিনি জানেন,

যুদ্ধ হল ধোঁকা।

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি.

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি. জাগ্রত হৃদয়ের অধিকারী, ঝলমলে মেধাসম্পন্ন বুদ্ধিমান এক যুবক। কোন বাধা তাঁকে রোধ করতে পারে না। কোন জটিল বিষয় তাঁকে অক্ষম করে না।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে যে সঠিক বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রচণ্ড ধী-শক্তি দান করেছেন ফলে তাঁকে মরু-সন্তানের উপমা দেয়া যায়। তবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, খুব বন্ধুবৎসল। এ দু'টিকে তিনি আরবের ইহুদীদের মাঝেই সবচেয়ে বেশী খুঁজে পেয়েছিলেন।

তাই যখনই তার মন কোন গায়িকার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠত অথবা তার শ্রবণেন্দ্রীয় বাদ্যের রিনিঝিনি আওয়াজ শুনতে অধীর-অস্থির হয়ে উঠত, তখনই তিনি নজদে অবস্থিত তার গোত্রের আবাসভূমি থেকে যাত্রা শুরু করতেন এবং মদীনার অভিমুখে রওনা হয়ে যেতেন। সেখানে অকাতরে ইহুদীদের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন যেন তারাও তার জন্য অকাতরে আনন্দ ও বিনোদনের আয়োজন করে...

এ কারণে নুয়াইম প্রায়ই ইয়াসরিবে আসতেন। আর তার সাথে ও ইহুদীদের সাথে বিশেষ করে বনু কুরাইজার সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল।

* * *

আল্লাহ তা'আলা হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ তাঁর রাসূলকে পাঠিয়ে যখন মানবতাকে সম্মানিত করলেন। আর মক্কার মরু-উপত্যকাগুলো ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তখন নুয়াইম ইবনে মাসউদ জীবনের লাগামকে বাধাহীনভাবে ছেড়ে দিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন।

তাই তিনি আনন্দ-উল্লাসের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টির ভয়ে নতুন ধর্ম থেকে কঠিনভাবে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। তারপর তিনি অনুভব করলেন যে, তাকে ইসলামের ঘোরতর দুশমনদের সাথে মিলিত হতে টেনে নেয়া হচ্ছে এবং ইসলামের সম্মুখ যাত্রায় তলোয়ার উঁচিয়ে তুলতে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

* * *

কিন্তু হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি. আহযাবের যুদ্ধের দিবসে ইসলামী দাওয়াতের ইতিহাসে নিজের জন্য একটি নতুন পৃষ্ঠা খুললেন এবং এই পৃষ্ঠায় তিনি যুদ্ধ-কৌশলের বিস্ময়কর কাহিনীসমূহের মধ্য হতে একটি কাহিনী রচনা করলেন...

তা এমন একটি ঘটনা ইতিহাস যার মজবুত অধ্যায়সমূহসহ চরম বিস্ময়তার সাথে বর্ণনা করে, চরম হতবুদ্ধিতার সাথে তার বুদ্ধিমান, চৌকান্না নায়কের কথা আলোচনা করে।

* * *

নুয়াইম ইবনে মাসউদের ঘটনাটি জানার জন্য আমাদের একটু পশ্চাতে ফিরে যেতে হবে।

আহযাবের যুদ্ধের কিছু পূর্বে বনু নাজীরের একদল ইহুদী উৎসাহিত হয়ে উঠল। তাদের নেতারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ও তার ধর্মকে মিটিয়ে দিতে বিভিন্ন দলকে সংঘবদ্ধ করতে লাগল...

তাই তারা মক্কায় কুরাইশদের নিকট এল। তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করল এবং তাদের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, মদীনায় পৌঁছলে তারা তাদের সাথে এসে মিলিত হবে। এ জন্য একটি সময় নির্ধারিত করল যার খেলাফ তারা করবে না।

তারপর নজদের গাতফান গোত্রের নিকট গেল। তাদেরকে ইসলাম ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলল। তারা সমূলে নতুন ধর্মকে উৎপাটিত করতে তাদেরকে আহবান জানাল এবং গোপনে তারা তাদের ও কুরাইশদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে তার কথা বর্ণনা করল। তারা কুরাইশের সাথে কৃত চুক্তি মুতাবিক তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হল এবং চূড়ান্ত সময়ের কথা তাদের জানাল।

* * *

অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ কুরাইশরা সকলে আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের নেতৃত্বে মক্কা থেকে মদীনার অভিমুখে বেরিয়ে পড়ল।

যেমনিভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও যোদ্ধাবাহিনী নিয়ে গাতফানের লোকেরা উয়ায়না ইবনে হিসন গাতফানীর নেতৃত্বে নজদ থেকে বেরিয়ে পড়ল।

আর গাতফানের যোদ্ধাদের অগ্রগামী বাহিনীতে ছিলেন আমাদের কাহিনীর বীর পুরুষ নুয়াইম ইবনে মাসউদ (রাযি.)...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের বেরিয়ে পড়ার সংবাদ পৌঁছলে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করলেন। তাঁদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাদের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হল, তারা মদীনার চারপাশে একটি পরিখা খনন করবেন যেন তাঁরা এ বিশাল বাহিনীকে রোধ করতে পারেন; যার মোকাবেলার শক্তি তাদের নেই। যেন পরিখা এই বিশাল যোদ্ধা বাহিনীর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

* * *

মক্কা ও নজদ থেকে সমবেত বাহিনী দু'টি মদীনার উঁচুভূমির নিকটবর্তী হতেই বনু নাজীরের ইহুদীদের নেতারা মদীনায় বসবাসকারী ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যার নেতাদের কাছে গেলো। উদ্দেশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নিয়ে মক্কা ও নজদ থেকে আগত বাহিনীকে উৎসাহিত করা, তাদেরকে প্ররোচিত করে তোলা, জবাবে বনু কুরায়যার নেতারা বললো তোমরা আমাদের এমন কিছুর দাওয়াতই দিয়েছো যা আমরা পছন্দ করি এবং আন্তরিকভাবে চাই। কিন্তু তোমরা তো জানো, মুহাম্মাদ ও আমাদের মাঝে এ মর্মে চুক্তি রয়েছে যে, আমরা তার সাথে আপোস বজায় রাখবো তার বিপক্ষে অবস্থান নেবো না। বিপরীতে আমরা লাভ করবো মদীনায় নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবন আর তোমরা অবগত আছো যে তার সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ এখনো শেষ হয়নি।

তদুপরি আমরা আশঙ্কা করছি, এই যুদ্ধে যদি মুহাম্মাদ জিতে যায় তাহলে আমাদেরকে কঠিনভাবে পাকড়াও করবে। চুক্তি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার বদলা স্বরূপ মদীনা থেকে চিরতরে আমাদের নির্মূল করবে...

কিন্তু বনু নাযীরের নেতারা ক্রমাগত তাদের উসকানী দিতে লাগলো। চুক্তি ভঙ্গ করে মুহাম্মাদের পক্ষ ত্যাগের বিষয়টিকে তাদের কাছে মনোহর করে তুলতে চটকদার সব যুক্তি পেশ করতে থাকলো। এমনকি অত্যন্ত জোরের সাথে তাদের আশ্বস্ত করলো যে এইবারে মুহাম্মাদের ললাটে নিস্তার নেই। শোচনীয় পরাজয় অবধারিত...

তারা এদের মনোবলকে আরো চাঙ্গা করে তুলতে মক্কা ও নজদের বিশাল বাহিনীর আগমনের খবরটিকে কাজে লাগালো এবং এতে অবিশ্বাস্য ফল হলো মুহূর্তে মধ্যেই বনু কুরায়যার ইহুদীরা সিদ্ধান্ত বদলে ফেললো। সত্যি সত্যি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাদের কৃত চুক্তি ভঙ্গ করলো, শুধু তাই নয় দু পক্ষের মাঝে লিখিত চুক্তি পত্রটি ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললো। এবং প্রকাশ্য হানাদার বাহিনীর পক্ষে যোগদানের কথা ঘোষণা করলো...

এই ঘটনায় মুসলমানদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো...

* * *

সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করলো মদীনার অভ্যন্তরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। ফলে মুসলমানদের উপরে নেমে এলো অসহনীয় দুর্ভোগ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পারলেন শত্রুর দ্বিমুখী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে গেছেন, ষড়যন্ত্রে ফেঁসে গেছেন।

রণসরঞ্জামে হাজির হয়েছে

বাইরে থেকে আক্রমণের জন্য মুসলমানদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কুরায়শ ও গাতফান আর মদীনার ভিতরে সুযোগের অপেক্ষায় মুসলমানদের পিছনে উঁৎ পেতে আছে বনু কুরায়যা...

তদুপরি মুনাফিক ও ব্যধিগ্রস্ত অন্তরের লোকেরা এতদিনে মনের গহীনে লুকানো সমস্ত কথা-বার্তা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছে। তারা বলছে মুহাম্মাদ আমাদেরকে রোম-পারস্যের ধনভাণ্ডার লাভের স্বপ্ন দেখাতো আর আজকে দেখো আমাদের কারো এতটুকু জানের নিরাপত্তা *নেই যে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে নির্জনে যাবো।*

এরপর তারা একেরপর এক দলধরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ থেকে সটকে পড়তে লাগলো। এই যুক্তিতে তাদের স্ত্রী সন্তান ও বাড়ী ঘর নিরাপদ নয়। কারণ যুদ্ধ বেধে গেলে বনু কুরায়যা তাদের উপর হামলা করে বসতে পারে। অবস্থা এই দাঁড়ালো যে কেবল সত্যবাদী কয়েকশ’ মু’মিন ছাড়া আর কেউই রইলো না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে।

প্রায় বিশ দিন স্থায়ী ঐ অবরোধ চলাকালে এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবের সমীপে আশ্রয় নিলেন এবং নিরুপায় দিশাহীন ব্যক্তির প্রার্থনার মতো বেদনাভরা আকুতি নিয়ে তার কাছে হাত উঠালেন তিনি তাঁর দুয়ায় একটি কথাই শুধু বলে চললেন, হে আল্লাহ তোমার সেই ওয়াদা সেই প্রতিশ্রুতির দোহাই হে আল্লাহ তোমার সেই ওয়াদা সেই প্রতিশ্রুতির কোথায়...।

* * *

নুয়াইম ইবনে মাসউদ সে রাতে অনিদ্রায় ছটফট করছিলেন। বিছানায় শুয়ে আছেন অথচ ঘুম নেই। দু’ চোখে যেন গাঢ় সুরমার প্রলেপ তাই পাতা দুটি একত্র হতে পারছে না। ফলে তিনি দৃষ্টি মেলে স্বচ্ছ আকাশের বুকে ছুটে চলা নক্ষত্রের দিকে তাকালেন...

এবং তাকিয়েই থাকলেন, মন ভরে সর্বদা আকাশ দেখলেন আর ভাবলেন... দীর্ঘ ভাবনা ...। হঠাৎ খেয়াল করলেন তার ভিতরে একটি প্রশ্নের সুর উপস্থিত।

তার মন তাকে শুধাচ্ছে,

ঠিক তোমাকে হে নুয়াইম!

সেই দূরবর্তী নজদ অঞ্চল থেকে কেন কী জন্য তুমি এসেছো? এই লোক ও তার অনুসারীদের সাথে লড়তে!!..

ভেবে দেখো, তুমি কোন হৃত অধিকার পুনরুদ্ধার কিংবা কোন লুণ্ঠিত মর্যাদা ও গৌরব ফিরে পেতে যুদ্ধে বের হওনি। বরং তুমি তার বিরুদ্ধে যৌক্তিক ও সুনির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধে নেমেছো

ঠিক তোমাকে নুয়াইম!!

কী করবে তুমি? এই সৎ ও সদাচারী ব্যক্তির সম্মুখে তোমার তরবারী উঠিয়ে ধরছো যিনি তার অনুসারীদেরকে? আদেশ দেন, ন্যায় ইনসাফ সদাচারণ ও নিকট আত্মীয়দের হক রক্ষার!!

কী সেই প্রাপ্তি যার জন্যে তোমার বর্শাকে তুমি তার সঙ্গীদের রক্তে রঞ্জিত করতে চাও যারা অনুসরণ করেছে তাঁর কাছে আগত সত্য ও হেদায়াতের পথ?!

নিজের সঙ্গে এই আলাপ যতক্ষণ শেষ হলো ততক্ষণ নুয়াইম সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি কী করবেন অতএব তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে গেলেন তা বাস্তবায়নের জন্য।

* * *

রাতের অন্ধকারে নুয়াইম ইবনে মাসউদ তার কওমের সেনাছাউনি থেকে গোপনে বেরিয়ে পড়লেন এবং দ্রুত পায়ে ছুটলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর সামনে বিনীতভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, নুয়াইম ইবনে মাসউদ? তিনি বললেন, জ্বী! হে আল্লাহর রাসূল। বললেন, এরকম সময়ে তুমি কেন এখানে এলে?!! তিনি বললেন, এসেছি একথার সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর আপনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা হক, সত্য...

তারপর বললেন, আমি যে ইসলাম গ্রহণ করেছি ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিন্তু আমার কওম সেটা জানে না অতএব আপনি আমাকে আদেশ করুন যা ইচ্ছা...

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি তো আমাদের পক্ষে মাত্র একজন ঠিক আছে যাও তোমার কওমের মাঝে গিয়ে চেষ্টা করো তাদের শক্তি কিছুটা খর্ব করতে, কারণ যুদ্ধ হলো ধোঁকা...

জবাবে তিনি বললেন, জী তাই করছি ইয়া রাসূলুল্লাহ... আর অচিরেই আপনি এমন কিছু দেখবেন ইনশা আল্লাহ যা আপনাকে আনন্দিত করবে।

* * *

নুয়াইম ইবনে মাসউদ সেই মুহূর্তে বনু কুরায়যার কাছে গেলেন। আর আগে থেকেই তিনি ছিলেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি। তিনি বললেন, হে বনু কুরায়যা। আমি যে তোমাদের প্রতি কেমন আন্তরিক এবং তোমাদের কতটা হিতাকাঙ্খী তা তোমরা জানো। জবাবে তারা বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই... তোমার প্রতি আমাদের অবিশ্বাস নেই... এবার নুয়াইম বলতে শুরু করলেন, শোন এই যুদ্ধে কুরায়শ ও গাতফানের অবস্থা আর তোমাদের অবস্থা এক না।

তারা বললো, সেটা কী রকম?

তিনি বললেন, দেখো তোমরা হলে এখানকার বাসিন্দা, এটাই তোমাদের দেশ। তোমাদের সম্পদ সন্তান ও স্ত্রী সবকিছু এখানে। এই জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়া তোমাদের পক্ষে সম্ভব না...

কিন্তু কুরায়শ ও গাতফান, তারা বহিরাগত তাদের আলাদা দেশ আছে, সম্পদ, সন্তান ও স্ত্রী পরিজন সব সেখানে...

তারা এখন এসেছে মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। আর তোমাদের দাওয়াত দিচ্ছে মুহাম্মাদের সঙ্গে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করে তার বিপক্ষে অবস্থান নিতে। তোমরা সে ডাকে সাড়া দিয়েছো।

এখন যদি তারা এই যুদ্ধে জয়ী হয় তাহলে তো গণীমত। এই সুযোগের তারা পুরো সদ্ব্যবহার করবে আর যদি তাকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলেও ভয় নেই, কারণ নিজ দেশে তারা ফিরে যাবে নিশ্চিন্তে। কিন্তু তোমরা একা পড়ে যাবে তখন মুহাম্মাদ তোমাদের চরম প্রতিশোধ নেবে... আর এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে, তোমাদেরকে একাকী পেলে তোমাদের আর রক্ষা নেই...

সব শুনে তারা বললো ঠিকই বলছো, এখন তোমার মত কী? নুয়াইম বললেন, আমার মত হচ্ছে তোমরা ততক্ষণ যুদ্ধে জড়াবে না যতক্ষণ না কুরায়শ ও গাতফানের অভিজাতদের একদলকে তারা তোমাদের কাছে সোপর্দ করবে যারা তোমাদের কাছে জামানত স্বরূপ থাকবে।

এর মাধ্যমে তোমরা তাদেরকে বাধ্য করতে সক্ষম হবে এ দুয়ের কোন একটিতে হয় মুহাম্মাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবে আর না হয় যুদ্ধ

করতে করতে তোমাদেরও তাদের সর্বশেষ ব্যক্তিটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে...

জবাবে তারা বললো, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্খী তাই এমন সুন্দর পরামর্শ দিয়েছো...।

এরপর নুয়াইম তাদের থেকে বিদায় নিয়ে কুরায়শ সেনাপতি আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের কাছে গেলেন। এবং আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গে যারা ছিলো তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে কুরায়শ! তোমাদের সাথে আমার হৃদ্যতা আর মুহাম্মাদের প্রতি বিদ্বেষ পরিষ্কার সকলেই জানো।

একটা কথা আমি শুনলাম তোমাদের কে সেটা অবগত করা আমার কর্তব্য মনে করি। তাই বন্ধুত্বের খাতিরে বলছি, কিন্তু তোমাদের স্বার্থেই সেটা গোপন রাখতে হবে, কাউকে জানাতে পারবে না...

তারা বললো, এ ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, নুয়াইম বললেন, বনু কুরায়যা মুহাম্মাদের বিপক্ষে যাওয়ার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। তারা এখন তাঁর কাছে এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছে, আমরা আমাদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত... আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগের চুক্তি ও সন্ধিতে ফিরে যাবো...

তো আপনি কি এটা পছন্দ করবেন যে, আমরা কুরায়শ ও গাতফানের বেশ কিছু অভিজাত লোককে এনে আপনার সোর্পদ করব আপনি তাদের শিরচ্ছেদ করেন? তারপর আমরা আপনার সঙ্গে মিলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেই এবং এভাবে আপনি তাদের সমূলে বিনাশ করেন? তাদের লীলা সঙ্গ করেন?

এই প্রস্তাবের উত্তরে মুহাম্মাদ বলেছে হ্যাঁ...

অতএব ইহুদীরা যদি তোমাদের কাছে জামানতের জন্য তোমাদের পুরুষদের চাইতে আসে তাহলে খবরদার একজন মানুষও দেবে না...

এ পর্যায়ে আবু সুফিয়ান বললো,

কত না উত্তম মিত্র তুমি। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

এরপর নুয়াইম ইবনে মাসউদ আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে উঠে তার কওম গাতফানের কাছে গেলেন এবং আবু সুফিয়ানের সাথে যেমন আলাপ হয়েছে হুবহু সেই কথাগুলোই এদেরকে শোনালেন এবং তাদেরকে সতর্ক করলেন যেভাবে সতর্ক করেছিলেন আবু সুফিয়ানকে।

* * *

আবু সুফিয়ান চাইলো বনু কুরায়যাকে যাচাই করে দেখবে, তাই সে তার ছেলেকে পাঠালো তাদের কাছে। সে গিয়ে বললো, আমার বাবা তোমাদের সালাম দিয়েছেন আর বলেছেন, মুহাম্মাদের ও তার লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের অবরোধ এতটা দীর্ঘ হয়েছে যে আমরা বিরক্ত হয়ে গেছি...। এখন আমরা সংকল্প করেছি তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তার থেকে নিস্তার লাভ করবো...। আর বাবা আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন কালই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার জন্য তোমাদের দাওয়াত দিতে।

জবাবে তারা বললো কাল তো শনিবার। এদিন আমরা কোন কাজ করি না। তাছাড়া আমরা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের পক্ষে লড়াই করবো না যতক্ষণ না তোমাদের ও গাতফানের নেতৃস্থানীয় সত্তরজন লোককে আমাদের হাতে না দাও, যেন তারা আমাদের কাছে বন্ধক থাকে। কারণ আমাদের আশঙ্কা, যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ নিলে তোমরা তড়িঘড়ি তোমাদের দেশে চলে যাবে আর একা আমরা পড়বো মুহাম্মাদের কবলে...

আর তোমরা তো জানো, তাদের মোকাবেলা করার মতো সামর্থ নেই আমাদের...।

আবু সুফিয়ান পুত্র যখন নিজ কওমের মাঝে এসে বনু কুরায়যার এসব কথাবার্তা উদ্ধৃত করলো তখন সবাই এক বাক্যে বলে উঠলো, লাঞ্ছিত হোক বানর শুকরের সন্তানেরা...। আল্লাহর কসম, যদি তারা একটি বকরিও বন্ধক চায় আমরা তা দেবো না...।

* * *

হযরত নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাযি. সম্মিলিত বাহিনীর ঐক্যে ফাটল ধরাতে ও তাদেরকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করে দিতে কামিয়াব হলেন...

এদিকে আল্লাহ কুরায়শ ও তার গোত্রদের উপর প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা বায়ু প্রেরণ করলেন, যা তাদের তাঁবুকে লণ্ডভণ্ড করে দিলো, পাতিল উল্টে দিলো, আগুন নিভিয়ে দিলো। বাতাস তাদের চেহারা ক্রমাগত চপোটাঘাত করলো আর অজস্র ধুলাবালিতে তাদের চোখ বোঝাই হয়ে গেলো। ফলে প্রস্থান করা ছাড়া তাদের কোন গত্যান্তর থাকলো না।

অতএব সেই অন্ধকার রাতেই তারা মদীনা ত্যাগ করলো...

মুসলমানরা সকালে উঠে যখন দেখলো, আল্লাহর শত্রুরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছে তখন তারা চিৎকার করে বলে উঠলেন, প্রশংসা সকল সেই আল্লাহর যিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং তার সৈন্যদের বিজয়ী করেছেন আর সম্মিলিত বাহিনীকে একান্ত পরাজিত করেছেন।

* * *

সে দিনের পর থেকে নুয়াইম ইবনে মাসউদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন। নবীজীর তরফ থেকে বিভিন্ন কাজের ভার গ্রহণ করেন বহু দায়িত্ব পালন করেন এবং তার পতাকা বহন করেছেন।

মক্কা বিজয়ের দিন আবু সুফিয়ান যখন মুসলিম বাহিনীকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলো, যোদ্ধাদলগুলোকে তখন হঠাৎ দেখলো এক ব্যক্তি গাতফানীদের পতাকা বহন করছে তার সঙ্গীদের জিজ্ঞেস করলো। এ কে?! তারা বললো নুয়াইম ইবনে মাসউদ। আবু সুফিয়ান বললো, কী খারাপ ভাবেই না আমাদের ধোঁকা দিয়েছে খন্দকের দিন...

আল্লাহর কসম, সে ছিলো মুহাম্মাদের ঘোরতর শত্রু... আর আজ সেই তার সম্মুখে নিজ কওমের পতাকা বহন করছে এবং তার নেতৃত্বে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে...।

হযরত ওয়াহশী ইবনে হর্‌ব রাযি.

قَتَلَ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ...

وَقَتَلَ شَرَّ النَّاسِ أَيْضًا

– المؤرخون

তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন ...এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও হত্যা করেছেন।

–ঐতিহাসিকগণ

হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব রাযি.

কে এই লোক , যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়কে রক্তাক্ত করেছেন?... যখন তিনি রাসূলের চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে উহুদের দিবসে হত্যা করেছেন!

তারপর মুসলমানদের হৃদয়কে বেদনামুক্ত করেছেন;

যখন তিনি ইয়ামামার দিবসে মুসাইলামাতুল কায্যাবকে হত্যা করেছেন।

নিশ্চয় তিনি হলেন ওয়াহশী ইবনে হর্ব রাযি. যাঁর উপনাম আবু দাসমা।

নিশ্চয় তাঁর কঠিন বেদনাময় রক্তাক্ত কাহিনী রয়েছে।

তুমি তাঁকে তোমার কানটি দাও , তিনি তোমাকে স্বয়ং তাঁর বেদনাময় কাহিনী শুনাবেন...

ওয়াহশী রাযি. বলেন, আমি কুরাইশের এক সরদার জুবাইর ইবনে মুত'আমের এক অল্প বয়সী দাস ছিলাম।

তার চাচা 'তুয়াইমা' বদরের দিবসে হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের হাতে নিহত হয়েছিল। তাই সে তার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাহত হল এবং লাত ও উজ্জার শপথ করে বলল, অবশ্যই সে তার চাচার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিবে এবং তার হত্যাকারীকে হত্যা করবে... তারপর থেকে সে হামযাকে হত্যার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

* * *

এর পর বেশী দিন যায়নি। ইতিমধ্যে কুরাইশরা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহকে ধ্বংস করার জন্য এবং বদরে নিহতদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য উহুদে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। তাই তারা তাদের বাহিনীকে সজ্জিত করল। তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ কবীলাদের একত্রিত করল। যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করল। তারপর তার নেতৃত্ব আবু সুফিয়ান ইবনে হরবের হাতে অর্পণ করল।

আবু সুফিয়ান বাহিনীর সাথে কুরাইশের একদল সম্মানিত নারীকেও নেয়ার চিন্তা করল, যাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা আত্মীয় স্বজনের কেউ বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তারা যোদ্ধাদের যুদ্ধে উৎসাহিত করবে। পলায়নে বাধা প্রদান করবে। সুতরাং যেসব নারী তার সাথে বেরিয়েছিল তাদের সর্বাগ্রে ছিলেন তার স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা।

তার পিতা , চাচা, ভাই সকলে বদরে নিহত হয়েছিল।

বাহিনী যখন যাত্রার উপক্রম হল, তখন জুবাইর ইবনে মুতআম আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হে আবু দাসমা ! তোমার কি আগ্রহ আছে যে তুমি তোমাকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করবে ?

আমি বললাম, তা কী করে সম্ভব?

তিনি বললেন, আমি তার ব্যবস্থা করব।

আমি বললাম, তা কীভাবে?

তিনি বললেন, যদি তুমি আমার চাচা তুয়াইমা ইবনে আদী এর মুকাবিলায় মুহাম্মাদের চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে হত্যা করতে পার, তাহলে তুমি স্বাধীন মুক্ত।

আমি বললাম, সে প্রতিশ্রুতি পূরণে কে আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করবে।

তিনি বললেন, কাকে চাও, সে ব্যাপারে আমি সবাইকে সাক্ষ্য বানাতে চাই।

আমি বললাম, আমি তা করব। আমি তা করতে সক্ষম।

ওয়াহশী রাযি. বলেন, আমি একজন হাবসী ছিলাম। হাবসার অধিবাসীদের মতই বর্শা নিক্ষেপ করতে পারতাম। সুতরাং যা লক্ষ্য করে বর্শা ছুড়তাম তা বিদ্ধ করতে ভুল করতাম না।

তাই আমি আমার বর্শা নিয়ে বাহিনীর সাথে রওনা হলাম। আমি বাহিনীর পশ্চাতে নারীদের কাছাকাছি চলতে লাগলাম। কারণ যুদ্ধের প্রতি আমার কোন আগ্রহ ছিল না।

আমি যখনই আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দের পাশ দিয়ে গিয়েছি বা সে আমার পাশ দিয়ে গেছে আর সূর্যের আলোয় আমার হাতে বর্শাটি চকমক

করতে দেখেছে তখনই সে বলেছে, হে আবু দাসমা! আমাদের হৃদয়ের জ্বালাকে তুমি প্রশমিত কর।

তারপর আমরা যখন উহুদে পৌঁছলাম আর উভয় বাহিনী মুখোমুখি হল আমি হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে তালাশ করতে লাগলাম। আমি তাকে আগে থেকেই চিনতাম। আর হামযা কারো কাছে অজানা থাকত না। আরবের বীর যোদ্ধাদের মতো তাই। কারণ তিনি তাঁর মাথায় নুয়ামা পাখির পর স্থাপন করতেন। ফলে প্রতিপক্ষের যোদ্ধারা তাঁকে চিনতে পারত।

অল্প কিছুক্ষণ পরই আমি হামযাকে দেখতে পেলাম, সে সমবেত যোদ্ধাদের মাঝে বজ্রনির্ঘোষ আওয়াজে চিৎকার করছে। যেন সে একজন ধূসর রঙের উষ্ট্র। সে তার তরবারী দ্বারা লোকদের শাসাচ্ছে। কেউ তার অভিমুখী হচ্ছে না। কেউ তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

আমি যখন তাকে হত্যা করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং কোন পাথর বা গাছের পশ্চাতে থেকে তার থেকে আত্মরক্ষা করে সে আমার নিকটবর্তী হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম, ঠিক তখনই কুরাইশের এক অশ্বারোহী তার দিকে এগিয়ে গেল। তাকে সিবা ইবনে আব্দুল উজ্জা নামে ডাকা হয়। সে বলছে, হে হামযা ! আমার সাথে যুদ্ধে এগিয়ে এসো... আমার সাথে যুদ্ধে এগিয়ে এসো.....

হামযা তার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, হে মুশরিকের বাচ্চা! এগিয়ে আয়... এগিয়ে আয়...

তারপর হামযা দ্রুত তার দিকে ছুটে গিয়ে তার তরবারী দ্বারা আঘাত করল। তারপর সে তার সামনে লুটিয়ে পরে রক্তের মাঝে ছটফট করতে লাগল।

ঠিক তখন আমি হামযার অদূরে আমার মনের মত স্থানে দাঁড়াতে পারলাম। আমি আমার বর্শাকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করতে লাগলাম। তারপর নিশ্চিত হলে তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। বর্শাটি তার পেটের নিচে গিয়ে বিদ্ধ হল এবং সামনে দিকে বেরিয়ে গেল।

তারপর ভারাক্রান্ত অবস্থায় সে আমার দিকে দু'কদম এগিয়ে এল। তারপরই সে বর্শাটিসহ লুটিয়ে পড়ল। আমি তাকে সে অবস্থায় ছেড়ে

দিলাম। অবশেষে নিশ্চিত হলাম যে, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তারপর আমি তার নিকট এগিয়ে গিয়ে বর্শাটি তুলে আনলাম এবং তাবুতে ফিরে এলাম এবং সেখানেই বসে রইলাম। কারণ তাকে হত্যা করা ছাড়া আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আর আমি তো তাকে আমার মুক্তির জন্য হত্যা করেছি।

* * *

তারপর যুদ্ধের শিখা ভয়াবহ আকার ধারণ করল। সম্মুখ অগ্রসর আর পশ্চাদ্ধাবন অনেক হল। তবে দ্রুতই মুহাম্মাদের সাথীদের উপর পরাজয়ের বিপর্যয় ঘুরে এল এবং তাদের অনেকেই নিহত হল।

তখন হিন্দ বিনতে উৎবা নিহত মুসলমানদের নিকট ছুটে গেল। আর তার পশ্চাতে পশ্চাতে গেল একদল নারী। তারপর তারা তাদের বিকৃত করতে লাগল। তারা তাদের পেট চিরতে লাগল, চোখ ফুঁড়ে দিল। নাক আর কান কেটে ফেলতে লাগল।

তারপর সে নাক আর কান দিয়ে মালা বানিয়ে তা দ্বারা সজ্জিত হল আর তার মালা ও স্বর্ণের দুল দুটি আমাকে দিয়ে বলল, হে আবু দাসমা! এ দু'টি তোমার... এ দু'টি তোমার...

এ দু'টি হেফাজত কর, কেননা তা মূল্যবান। উহুদ যুদ্ধ শেষ হলে আমি মক্কায় ফিরে এলাম। আর জুবাইর ইবনে মুত'আম তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করল। আমাকে আযাদ করে দিল। আমি মুক্ত স্বাধীন হয়ে গেলাম।

* * *

কিন্তু মুহাম্মাদের ধর্মমত দিনের পর দিন বাড়তে লাগল এবং ক্ষণে ক্ষণে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল। তাই মুহাম্মাদের ধর্মমত যতই বাড়তে লাগল বিপদ আর সঙ্কট আমার তেমনি বেড়ে চলল। ভয়-ভীতি আর আতঙ্ক আমাকে পেয়ে বসল।

এমনি অবস্থা চলতে চলতে একদিন মুহাম্মাদ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করল। তখন আমি নিরাপত্তার তালাশে তায়েফে পালিয়ে গেলাম।

কিন্তু তায়েফের অধিবাসীরা কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামের ব্যাপারে

নরম হয়ে গেল। তারা মুহাম্মাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং তার ধর্মে প্রবেশের ঘোষণা দেয়ার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রস্তুত করল।

তখন আমার অনুশোচনা তীব্র আকার ধারণ করল এবং প্রশস্ত দুনিয়া সংকীর্ণ হয়ে গেল। আমার সামনে সব পথ বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমি বললাম, শামে অথবা ইয়ামেনে অথবা দূরবর্তী কোন দেশে আমি চলে যাব।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যখন আমার এই দুশ্চিন্তায় বেচাইন তখন এক কল্যাণকামী আমার ব্যাপারে কোমল হল। বলল, ছিঃ হে ওয়াহশী! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি কেউ তার ধর্মে প্রবেশ করে ও আল্লাহর একত্ববাদের ও মুহাম্মাদের রিসালাতের সাক্ষ্য দেয় তাহলে তিনি তাকে হত্যা করেন না।

আমি তার কথা শুনে মুহাম্মাদের তালাশে ইয়াসরাবের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। যখন আমি সেখানে পৌঁছলাম এবং তাকে তালাশ করলাম, জানতে পারলাম, তিনি মসজিদে অবস্থান করছেন।

ক্ষীপ্রতা ও সতর্কতার সাথে আমি তার নিকট প্রবেশ করলাম ও তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিলাম,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

তিনি আমার সাক্ষ্য প্রদানের আওয়াজ শুনে আমার দিকে চোখ তুলে তাকালেন। আমাকে চিনেই আমার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন। বললেন, ধিক তোমাকে ওয়াহশী ! তোমার চেহারা আমার থেকে দূরে সরিয়ে নাও। আজকের পর যেন আর কখনো তোমাকে না দেখি।...

তাই সেই দিন থেকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দৃষ্টি যেন আমার উপর না পরে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতাম। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সামনে বসলে আমি তাঁর পশ্চাতে গিয়ে বসতাম।

এমনি অবস্থায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতেকাল করলেন।

* * *

ওয়াহশী রাযি. বলে চললেন, আমি জানতাম, ইসলাম গ্রহণ করলে পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তবে আমি যা করেছি তার নির্মমতা অনুভব করতাম। ইসলাম ও মুসলমানদের উপর আমি যে মুসিবত চাপিয়ে দিয়েছি তার ভয়াবহতা অনুধাবন করতাম। তাই আমি এমন সুযোগের সন্ধানে ছিলাম, যা দ্বারা আমি বিগত দিনের পাপ মোচন করব।

* * *

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইনতেকাল করলে মুসলমানদের খেলাফতের দায়িত্ব হযরত আবু বকর রাযি.-এর নিকট এল আর হযরত মুসাইলামাতুল কায্যাবের অনুসারী বনু হানীফার লোকেরা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন খলীফা আবু বকর রাযি. মুসাইলামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এবং তার গোত্র বনু হানীফাকে আল্লাহর দ্বীনে ফিরিয়ে আনার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করলেন।

তখন আমি মনে মনে বললাম, হে ওয়াহশী! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা তোমার সুযোগ। সুতরাং তুমি তা লুফে নাও। তোমার হাত থেকে তা ফসকে যেতে দিও না।

তারপর আমি মুসলমানদের বাহিনীর সাথে বেরিয়ে পড়লাম এবং আমি আমার সাথে আমার ঐ বর্শাটি নিয়ে নিলাম যা দ্বারা আমি হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকে হত্যা করেছি। আমি শপথ করলাম, হয় তা দ্বারা মুসাইলামকে হত্যা করব, না হয় শাহাদাত বরণের মাধ্যমে সফল হয়ে যাব।

তারপর যখন মুসলমানগণ হাদীকাতুল মওতে মুসাইলামা ও তার বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন আমি মুসাইলামাকে খুজঁতে লাগলাম। আমি তাকে দেখলাম সে হাতে তরবারী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । আমি এক আনসারীকে দেখলাম, সেও আমার মত তাকে খুঁজছে। আমরা উভয়ে তাকে হত্যা করতে চাচ্ছি।

আমি আমার পছন্দমত স্থানে দাঁড়িয়ে বর্শাটি নাড়াচ্ছিলাম। অবশেষে তা আমার হাতে সোজা হয়ে গেলে আমি তা তার দিকে ছুঁড়ে মারলাম। তারপর তা তার উপর গিয়ে পড়ল।

আমি যে মুহূর্তে আমার বর্শাটি মুসাইলামার উপর ছুঁড়ে মারছি ঠিক তখন আনসারী সাহাবী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তরবারীর এক আঘাতে তাকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলল।

সুতরাং এখন তোমার রবই ভাল জানেন, আমাদের মাঝে কে তাকে হত্যা করেছে।

যদি আমিই তাকে হত্যা করে থাকি তাহলে আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে হত্যা করেছি .....এবং সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তিকেও হত্যা করেছি।

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি.

إِنَّ بِمَكَّةَ لَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ
أَرْبَأُ بِهِمْ عَنِ الشِّرْكِ
وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلامِ ...
أَحَدُهُمْ حَكِيمُ بْنُ حَزَامٍ

– محمد صلى الله عليه وسلم

নিশ্চয় মক্কায় চারজন লোক রয়েছে, যারা শিরক থেকে
অধিক দূরে আর ইসলামের প্রতি অধিক আগ্রহী...
তাদের একজন হল হাকীম ইবনে হাযাম।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি.

তোমার নিকট কি এই সাহাবীর সংবাদ পৌঁছেছে ?!

ইতিহাস লিখেছে, তিনিই একমাত্র নবজাত সন্তান যিনি ক্বাবা মুয়ায্যমার অভ্যন্তরে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।

তার এই জন্মের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ হল, তার মা তার সমবয়সী একদল সখীর সাথে আনন্দ-স্ফূর্তি করার জন্য ক্বাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল।

কোন এক উপলক্ষে সে দিন ক্বাবা খোলা ছিল।

আর তার মাতা তখন গর্ভবতী ছিলেন। তখন ক্বাবার অভ্যন্তরে থাকা অবস্থায়ই হঠাৎ তার প্রসব বেদনা শুরু হল। আর তখন তিনি ক্বাবা ত্যাগ করতে পারলেন না...

তার জন্য একটি চামড়ার টুকরা আনা হল আর তিনি তাতে সন্তান প্রসব করলেন।

সেই নবজাত সন্তান হল হাকীম ইবনে হাযাম ইবনে খুয়াইলিদ।

তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযি. এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম রা. বিত্তবান ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, শরীফ ও সম্ভ্রান্ত। তাই তার গোত্রের লোকেরা তাঁকে সরদার বানিয়ে নিল এবং তাঁকে রিফাদার একটি পদে ভূষিত করল।

তাই তিনি জাহেলী যুগে তাঁর নিজস্ব সম্পদের একটি অংশ দ্বারা পাথেয় ফুরিয়ে যাওয়া বাইতুল্লাহর হাজীদের সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার পূর্বে হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।

যদিও তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে বয়সে পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন তবে তিনি তাঁকে মহব্বত করতেন। তাঁর সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গতা খুঁজে পেতেন। তাঁর সাহচর্যে ও তাঁর সাথে উঠাবসায় প্রশান্তি লাভ করতেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে বন্ধুত্বের ও ভালবাসার বিনিময় করতেন।

তারপর নৈকট্যের সম্পর্ক এগিয়ে এল। তখন তাদের মাঝে সম্পর্ক আরো মজবুত হল, শক্তিশালী হল। আর তা হল যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ফুফু হযরত খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাযি. কে বিয়ে করলেন।

* * *

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হাকীম ইবনে হাযামের যে সব সর্ম্পকের কথা আমি তোমার নিকট বর্ণনা করেছি তা শুনার পর তুমি বিস্মিত হবে যখন জানবে যে, হাকীম ইবনে হাযাম মক্কা বিজয়ের দিবসে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতের দায়িত্ব পাওয়ার পর বিশের চেয়েও অধিক বৎসর কেটে গেছে।

অথচ হাকীম ইবনে হাযামের মত মানুষ যাকে আল্লাহ তা'আলা সেই পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেই আত্মীয়তার নৈকট্য দান করেছেন তাতে ধারণা ছিল যে, তিনি প্রথম ঈমানদার ব্যক্তি হবেন, তাঁর দাওয়াতকে সত্যায়ন করবেন, তার হিদায়াত হিদায়াতপ্রাপ্ত হবেন।

কিন্তু তা আল্লাহর ইচ্ছা...

আর আল্লাহ যা চান তাই হয়...

* * *

আমরা সকলে যেমনিভাবে হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. এর ইসলাম গ্রহণের বিলম্বের কারণে বিস্মিত হচ্ছি ঠিক তেমনি তিনিও তার কারণে বিস্মিত হতেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার ও ঈমানের স্বাদ গ্রহণ

করার পরই জীবনে সেই প্রতিটি মুহূর্তের জন্য যা আল্লাহর সাথে শিরক করে ও রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলে কাটিয়েছেন তার জন্য আক্ষেপে দাঁত কাটতে লাগলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর ছেলে তাঁকে কাঁদতে দেখে বললেন, হে পিতা ! আপনি কাঁদছেন কেন ?

তিনি বললেন, হে ছেলে ! বহু বিষয় আমাকে কাঁদাচ্ছে ?

তার প্রথমটি হল, আমার ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করা, যা আমাকে বহু নেক কাজ করা থেকে পশ্চাতে ফেলে দিয়েছে। এখন যদি আমি পৃথিবীময় স্বর্ণও খরচ করি তাহলে তাতে পৌঁছতে পারব না। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাকে বদর ও উহুদের যুদ্ধে রক্ষা করেছেন। সেদিন আমি মনে মনে বলেছি, এরপর আমি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কুরাইশকে সাহায্য করব না এবং মক্কা থেকে বের হব না। তার পরপরই আমাকে কুরাইশের সাহায্যে টেনে নেয়া হয়েছে। তারপর আমি যখনই ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছে করেছি, কুরাইশের অন্যান্য অবশিষ্ট বিশিষ্ট লোকদের দেখেছি, তারা বর্ষীয়ান, সম্মানী অথচ তারা জাহেলী যুগের ধর্মমতকেই আঁকড়ে ধরে আছে। তখন আমি তাদের অনুসরণ করেছি। তাদের সাথে সাথেই চলেছি।

হায়, যদি তা না করতাম...

পূর্বপুরুষ আর বড়দের অনুসরণই আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে...

সুতরাং এখন আমি কাঁদব না কেন ?!!!

* * *

আমরা যেমনিভাবে হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. এর ইসলাম গ্রহণে বিলম্বের কারণে বিস্মিত হয়েছি, তিনিও বিস্মিত হয়েছেন, তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমন ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্মিত হতেন যার হাকীম ইবনে হাযামের মত সহনশীলতা ও বুদ্ধি রয়েছে, তার নিকট ইসলামের বিষয়টি কীভাবে অস্পষ্ট থাকে। তিনি আশা করতেন, তাঁর ও তাঁর মত ব্যক্তিরা যেন দ্রুত আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে।

মক্কা বিজয়ের আগের দিন রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের বললেন,

إِنَّ بِمَكَّةَ لَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ أَرْبَأُ بِهِمْ عَنِ الشِّرْكِ وَأَرْغَبُ لَهُمْ فِي الإِسْلَامِ

নিশ্চয় মক্কায় চারজন লোক রয়েছে, যারা শিরক থেকে অধিক দূরে আর ইসলামের প্রতি অধিক আগ্রহী...

জনৈক সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তারা কারা ?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা হল আত্তাব ইবনে উসাইদ, যুবাইর ইবনে মুতইম, হাকীম ইবনে হাযাম ও সুহাইল ইবনে আমর ।

আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীবেশে যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন তখন তিনি হাকীম ইবনে হাযামকে সম্মান করতে ইচ্ছে করলেন। তাই জনৈক ঘোষককে ঘোষণা করতে নির্দেশ দিলেন,

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তা হলে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি অস্ত্র রেখে কাবার সামনে বসে থাকবে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে থাকবে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।...

যে ব্যক্তি হাকীম ইবনে হাযামের ঘরে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ।

হাকীম ইবনে হাযামের বাড়ি মক্কার নিম্নভূমিতে ছিল আর আবু সুফিয়ানের বাড়ি মক্কার উঁচুভূমিতে ছিল।

* * *

হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. ইসলাম গ্রহণ করলেন, যা তার বুদ্ধিমত্তাকে পরাভূত করল। ঈমান আনলেন, যা তাঁর রক্ত ও হৃদয়ের সাথে মিশে গেল।...

তিনি শপথ করে প্রতিজ্ঞা করলেন, জাহেলী যুগের প্রতিটি অবস্থানের এবং রাসূলের শত্রুতায় ব্যবহৃত প্রতিটি অর্থের তিনি বিনিময় দিবেন।

সত্যই তিনি তাঁর শপথ পূরণ করেছিলেন...

তার একটি হল, দারুন নাদওয়ার মালিকানা তার নিকট এল। আর তা এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্যময় পরামর্শ গৃহ। এ গৃহেই জাহেলী যুগে কুরাইশরা তাদের শলাপরামর্শ করত। এ গৃহেই কুরাইশের সরদাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে সমবেত হত।

তাই হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. তা থেকে মুক্ত হতে চাইলেন। যেন তিনি সেই অতীতের উপর বিস্মৃতির চাদর টেনে দিতে চাইলেন। তাই তা এক লক্ষ দেরহামে বিক্রয় করে দিলেন। তখন কুরাইশের এক যুবক তাঁকে বললেন, হে চাচা ! আপনি তো কুরাইশের মর্যাদার ঐতিহ্যকে বিক্রয় করে দিলেন।

তখন হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. বললেন, হে বৎস ! তুমি এ কী বললে! তাকওয়া ছাড়া এখন আর কোন মর্যাদার ঐতিহ্য বাকী নেই। আমি তো তার মূল্যের বিনিময়ে জান্নাতে একটি বাড়ি ক্রয় করতে ইচ্ছে করেছি।

আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, আমি তার মূল্য আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিয়েছি।

* * *

ইসলাম গ্রহণ করার পর হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. হজ্জ আদায় করলেন। চমৎকার কাপড়ে সাজিয়ে একশত উট টেনে টেনে নিয়ে গেলেন। তারপর আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় সবগুলোকে যবাহ করলেন।...

অপর আরেক হজ্জে তিনি আরাফায় অবস্থান করলেন। তাঁর সাথে একশত গোলাম। প্রত্যেকের গলায় একটি করে চাঁদির বেড়ি। তাতে নকসা করে লেখা আছে,

عُتَقَاءُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ

-হাকীম ইবনে হাযামের পক্ষ হতে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশায় এদের আযাদ করা হল।

তারপর তিনি তাদের সবাইকে আযাদ করে দিলেন। তৃতীয় হজ্জে তিনি এক হাজার বকরী নিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, এক হাজার বকরীই বটে! এবং মিনায় সবগুলো যবাহ করে দিলেন। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় তিনি গরীব মুসলমানদেরকে সেগুলোর গোশত দিয়ে দিলেন।

* * *

হুনাইনের যুদ্ধের পর হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গণিমতের মাল চাইলেন। রাসূল তাঁকে তা দিলেন। তারপর চাইলেন তখন রাসূল তাকে দিলেন। অবশেষে তিনি যা গ্রহণ করলেন তা এক শত উটে পৌঁছল। আর সেদিন তিনি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে হাকীম! নিশ্চয় এ সম্পদ মজাদার শ্যামল। যে তা হৃদয়ের বদান্যতার সাথে গ্রহণ করবে তার জন্য তাতে বরকত দেয়া হবে। আর যে তা নফসের লালসার সাথে গ্রহণ করবে তার জন্য বরকত দেয়া হবে না । আর সে ঐ ব্যক্তির মত হবে যে খায় অথচ তৃপ্ত হয় না।...

উর্দ্ধের হাত নিচের হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথা শুনে বললেন,

ইয়া রাসূলাল্লাহ ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনার পর কারো নিকট আমি আর কিছু চাব না।...

দুনিয়া ত্যাগের পূর্বে আমি কারো থেকে কিছু নেব না ।...

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. তাঁর শপথকে যথাযথভাবেই পালন করেছেন।

হযরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত কালে তিনি তাঁকে বাইতুল মাল থেকে তার অংশ নেয়ার জন্য বহু বার আহবান করেছেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর নিকট খিলাফতের দায়িত্ব এলে তিনি তাঁকে বাইতুল মাল থেকে তার অংশ নেয়ার জন্য আহবান করেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর থেকেও কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।...

তখন হযরত উমর রাযি. লোকদের মাঝে দাঁড়িয়ে বললেন,হে মুসলমানরা ! আমি তোমাদের সাক্ষ্য রাখছি যে, আমি হাকীমকে তাঁর অংশ গ্রহণ করার জন্য আহবান করছি কিন্তু সে তা অস্বীকার করছে।

হযরত হাকীম ইবনে হাযাম রাযি. তেমনই রইলেন। ইহলোক ত্যাগ করার পূর্বে তিনি কারো থেকে কোন কিছু গ্রহণ করেন নি।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি.

ثَلاثَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يَسْمُوْ عَلَيْهِمْ فَضْلاً:

سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ، وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ

– ام المؤمنين عائشة رضــ

আনসারদের মাঝে এমন তিন ব্যক্তি রয়েছে,
শ্রেষ্ঠত্বে কেউ তাদের ঊর্ধ্বে যেতে সক্ষম নয়,
সা'আদ ইবনে মুয়ায, উসাইদ ইবনে হুযাইর,
আব্বাদ ইবনে বিশর ।

–উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা রাযি.

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি.

তাবলীগ ও দাওয়াতের ইতিহাসে আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র এক উজ্জ্বল আলোকময় নাম।...

যদি তুমি তাঁকে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে তালাশ কর, তাহলে তাঁকে মুত্তাকী-পরহেজগার, নিশিরাতে নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াতে রত দেখতে পাবে। যদি তুমি তাঁকে বীর যোদ্ধাদের মাঝে তালাশ কর, তাহলে তুমি তাঁকে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার জন্য রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়া বীর যোদ্ধাদের মাঝে খুঁজে পাবে। আর যদি তুমি তাঁকে শাসকদের মাঝে তালাশ কর, তাহলে তুমি তাঁকে মুসলমানদের সম্পদের ব্যাপারে বিশ্বস্ত, শক্তিশালী পাবে।

এমনকি হযরত আয়েশা রাযি. তাঁর ব্যাপারে এবং তাঁর গোত্রের আরো দু'জনের ব্যাপারে বলেছেন,

'আনসারদের মাঝে এমন তিন ব্যক্তি রয়েছে, শ্রেষ্ঠত্বে কেউ তাদের উপরে ছিলো না তাঁরা সবাই বনু আব্দুল আশহালের অন্তর্ভুক্ত,সা'আদ ইবনে মুয়ায, উসাইদ ইবনে হুযাইর, আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র'।

* * *

যখন ইয়াসরিবের দিগন্তে হিদায়াতের কিরণ প্রথম বিকশিত হল তখন আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র আশহালী রাযি. ছিলেন ভরা যৌবনের সজীব প্রাণবন্ত যুবক। তুমি তাঁর চেহারায় পবিত্রতা ও সূচিতার সজিবতা দেখতে পাবে। আর তাঁর কাজ কর্মে তুমি পৌঢ়ত্বের গম্ভীরতা দেখতে পাবে। অথচ তিনি তখন তাঁর সৌভাগ্যময় জীবনের পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করেননি।

* * *

তিনি মক্কার দাঈ যুবক মুসআব ইবনে উমাইরের নিকট গিয়ে একত্রিত হলেন। ঈমানের বন্ধন দ্রুত তাঁদের মাঝে ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি করল। উন্নত চরিত্র ও নির্মল গুণাবলী উভয়ের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি করল।

হযরত মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. যখন তাঁর উষ্ণতায় ভরা স্বচ্ছ কণ্ঠে ধীরে ধীরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. বিভোর হয়ে তা শুনতেন। তাই তিনি আল্লাহর কালামের পাগল হয়ে গেলেন এর্বং অন্তরের অন্তস্থলে কুরআনের জন্য প্রশস্ত স্থান করে নিলেন। কুরআনকেই তাঁর ব্যস্ততার বিষয় বানালেন। তিনি দিন-রাত, প্রবাসে-নিবাসে সর্বদা গুণগুণ করে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের মাঝে 'ইমাম ও কুরআনের বন্ধু' নামে খ্যাতি লাভ করলেন।

* * *

এক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর সাথে লাগোয়া হযরত আয়েশা রাযি.-এর গৃহে তাহাজ্জুদের নামায পড়ছিলেন। তখন তিনি হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. এক কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন, তিনি কোমল সতেজ কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করছেন যেমন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম তার নিকট নিয়ে এসেছিলেন। তাই বললেন,

হে আয়েশা ! এটা তো আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র-এর কণ্ঠ?!

হযরত আয়েশা রাযি. বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ ! তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।

* * *

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আর প্রত্যেক যুদ্ধে তাঁর এমন একটি অবস্থান ছিল যা কুরআনপাগল মানুষের জন্য উপযোগী।

তার একটি ঘটনা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গাযওয়ায়ে 'যাতুর রেকা' থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি রাত কাটানোর জন্য একটি পাহাড়ের পাদদেশে যাত্রা বিরতি করলেন।

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এক মুসলমান একজন কাফেরের অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রীকে বন্দী করেছিল। স্বামী উপস্থিত হয়ে স্ত্রীকে না পেয়ে লাত আর

উয্যার নামে কসম খেয়ে বলল, অবশ্যই মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের কারো রক্ত প্রবাহিত করে তবে সে ফিরে আসবে।

* * *

উপত্যকায় মুসলমানগণ তাদের বাহন বসানোর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, এ রাতে কে আমাদের পাহারা দিবে?

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমরা পাহারা দিব। মুহাজিরগণ মদীনায় এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন।

তাঁরা উভয়ে যখন পাহারাদারীর জন্য উপত্যকার মুখে এলেন আব্বাদ ইবনে বিশর তাঁর ভাই আম্মার ইবনে ইয়াসিরকে বলল, রাতের দু'অংশের কোন অংশকে তুমি ঘুমানোর জন্য প্রাধান্য দিচ্ছ, শুরুর অংশ, না শেষ অংশ।

আম্মার রাযি. বললেন, বরং আমি তার শুরুর অংশে ঘুমাবো। তারপর তিনি তাঁর অদূরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

* * *

রাত ছিল নিরব-নিঝুম, শান্ত, নিস্তব্ধ। তারকা, সূর্য আর পাথররা রবের হামদ ও তাসবীহ পাঠ করছিল। তখন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. এর মন ইবাদতের দিকে ধাবিত হল। তাঁর হৃদয় কুরআনের দিকে আগ্রহী হল।

নামাযরত অবস্থায় তিনি যখন তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন কুরআন তিলাওয়াতের স্বাদ তাঁর নিকট অধিক মজাদার হয়ে উঠত। তখন তিনি তিলাওয়াতের স্বাদের সাথে নামাযের স্বাদকে একত্রিত করতে পারতেন। তাই তিনি কিবলামুখী হয়ে নামাযে রত হলেন এবং সুমিষ্ট কোমল বেদনায়ভরা কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন।

তিনি যখন ইলাহি আলোকময় এই নূরে সাঁতার কেটে চলছিলেন, তার আলোর ঔজ্জ্বল্যে ডুবে যাচ্ছিলেন,তখন লোকটি দ্রুত এগিয়ে এল। দূর থেকে আব্বাদকে গিরিপথের মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুঝল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা ভিতরে রয়েছে আর সে তাদের প্রহরী। তখন সে তার ধনুক টানল। তুনীর থেকে একটি তীর নিয়ে নিক্ষেপ করল এবং তাঁকে বিদ্ধ করল।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. তা তাঁর শরীর থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং সবেগে কুরআন তিলাওয়াতে এগিয়ে চললেন, নামাযে ডুবে রইলেন।

লোকটি আরেকটি তীর নিক্ষেপ করল এবং তাঁকে বিদ্ধ করল। আর তিনি তা পূর্ববর্তী তীরের ন্যায় তাঁর শরীর থেকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর লোকটি তৃতীয় আরেকটি তীর নিক্ষেপ করল আর তিনি তা পূর্ববতী তীর দু'টির ন্যায় তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং হামাগুড়ি দিয়ে তাঁর সাথীর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে জাগ্রত করে বললেন,

উঠ ! আমাকে ক্ষতস্থান দুর্বল করে দিয়েছে।

লোকটি তাদের দু'জনকে দেখে পালিয়ে গেল।

* * *

এরপর আম্মার রাযি. যখন হযরত আব্বাদ রাযি.কে লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি দেখলেন,প্রচুর রক্ত তাঁর তিনটি ক্ষতস্থান থেকে গড়িয়ে পড়ছে। অতএব তাঁকে তিনি বললেন, "ইয়া সুবহানাল্লাহ ! তোমাকে প্রথম তীর নিক্ষেপ করার সময় কেন তুমি আমাকে জাগালে না ?!

হযরত আব্বাদ রাযি. বললেন, আমি একটি সূরা পড়ছিলাম। সুতরাং আমি শেষ করার পূর্বে তা বন্ধ করতে চাইনি। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গিরিপথ হেফাজত করার যে দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন তা নষ্ট হওয়ার ভয় না থাকলে আমার ধ্বংস হয়ে যাওয়া কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হত।

* * *

হযরত আবু বকর রাযি.-এর শাসনামলে যখন রিদ্দাহ যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠল, তখন হযরত আবু বকর রাযি. মুসাইলামাতুল কায্যাবের ফিৎনাকে ধ্বংস করতে, তার সাহায্যকারী মুরতাদদেরকে অবনমিত করতে ও তাদেরকে ইসলামের গণ্ডীতে ফিরিয়ে আনতে একটি বিরাট বাহিনী তৈরী করলেন। তখন হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. সেই বাহিনীর অগ্রগামী সৈন্যদের অর্ন্তভুক্ত ছিলেন।

যে সব যুদ্ধে মুসলমানগণ উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করতে পারেনি সে সকল যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. দেখতে পেলেন, আনসাররা মুহাজিরদের উপর নির্ভর করছে আর মুহাজিররা আনসারদের উপর নির্ভর করছে। ফলে তা তাঁর হৃদয়কে বেদনা আর ক্ষোভে ভরে দিল। তিনি শুনতে পেলেন, তারা একে অপরের উপর দোষ চাপাচ্ছে। ফলে তা তার কর্ণকুহরকে জ্বলন্ত অঙ্গার আর কাঁটায় ভরে দিল। তাই তার একীন হয়ে গেল যে, এ কঠিন যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় লাভের একটি মাত্র পথ বাকী আছে, তাহল প্রত্যেক দল অপর দল থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, যেন প্রত্যেকে নিজেই তার দায়িত্ব বহন করে।...

আর তাহলেই অবিচল মুজাহিদদেরকে যথাযথভাবে চিনা সম্ভব হবে।

* * *

চূড়ান্ত যুদ্ধের আগের রাতে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. স্বপ্নে দেখলেন,তার সামনে আসমান খুলে গেছে। তারপর তিনি যখন তাতে প্রবেশ করলেন তখন আকাশ তাকে ধারণ করে নিল এবং তার দরজা বন্ধ করে দিল।...

সকালে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.-এর নিকট তিনি তাঁর স্বপ্নের বিবরণ দিলেন তারপর বললেন, হে আবু সাঈদ ! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় তা শাহাদাতের সুসংবাদ।

* * *

সকালে যুদ্ধ শুরু হলে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. একটি উচুঁ স্থানে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে ডাকতে লাগলেন, হে আনসাররা! তোমরা পৃথক হয়ে যাও...

তরবারীর খাপগুলো ভেঙ্গে ফেল।...

ইসলামকে তোমাদের দিক থেকে আক্রান্ত হওয়ার অবকাশ দিয়ো না...

এভাবে তিনি আহবান করতে লাগলেন। অবশেষে তার পাশে এসে প্রায় চার শত মুহাজির সমবেত হলেন। তাদের শীর্ষে রয়েছেন সাবেত ইবনে কাইস রাযি., বারা ইবনে মালেক রাযি., ও রাসূলের তরবারীর অধিকারী আবু দোজানা রাযি.।

হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. তাঁর সাথীদের নিয়ে তরবারী চালিয়ে বুহ্য ভেদ করতে করতে এগিয়ে চললেন আর মৃত্যুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে লাগলেন। অবশেষে মুসাইলামাতুল কায্যাবের শক্তি ভেঙ্গে গেল। আর তারা মৃত্যু-বাগানে গিয়ে আশ্রয় নিল।

তখন বাগানের প্রাচীরের নিকটে হযরত আব্বাদ ইবনে বিশর রাযি. রক্তাক্ত অবস্থায় শাহাদতবরণ করলেন।...

আর তাঁর শরীরে ছিল অসংখ্য অগণিত তরবারী, বর্শা আর তীরের আঘাত।

অবস্থা এমন হয়েছিল যে সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে তাঁর শরীরের একটি বিশেষ চিহ্নের মাধ্যেমেই চিনতে পেরেছিলেন।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী রাযি.

فَمَنْ لِلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّانٍ وَابْنِهِ

وَمَنْ لِلْمَعَانِيْ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

- حسان بن ثابت

হাস্সান ও তার পুত্রের পর কে আর আছে কবিতার?
যায়েদ ইবনে ছাবেতের পরে কেবা আছে ভাব ও চেতনার?

–হাস্সান ইবনে ছাবেত

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনছারী রাযি.

আমরা এখন হিজরী দ্বিতীয় বর্ষে উপনীত...

মদীনাতুর রাসূল যেদিন বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

আর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য এবং আল্লাহর জমীনে আল্লাহর কালিমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর নেতৃত্বে গমনকারী প্রথম বাহিনীর উপর দৃষ্টি ফেলছেন।

তখন মুজাহিদদের সারির দিকে একজন ছোট বালক এগিয়ে এল। তের বৎসর বয়সও তার পূর্ণ হয়নি। প্রতিভা আর বুদ্ধিমত্তায় জ্বলজ্বল করছে... প্রজ্ঞা আর আত্মমর্যাদাবোধে দীপ্তময় হয়ে আছে...

তাঁর হাতে একটি তরবারী যা তাঁর শরীর বরাবর বা তার চেয়ে একটু বড়। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটবর্তী হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জীবন আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনার সাথে থাকার ও আপনার পতাকাতলে থেকে আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি প্রদান করুন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনন্দ মিশ্রিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। ভালবাসা ও স্নিগ্ধতার সাথে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। এভাবে তার মনোরঞ্জন করলেন এবং বয়সের স্বল্পতার কারণে ফিরিয়ে দিলেন।

*　　*　　*

ছোট বালকটি ক্ষুণ্ন বিষণ্ন মনে মাটির উপরে তরবারী টানতে টানতে ফিরে এল। কারণ সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম যুদ্ধাভিযানে তাঁর সাহচর্যের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

তার পিছনে পিছনে তার মা নাওয়ার বিনতে মালেক ফিরে এলেন। তিনিও দুঃখ ও বিষণ্নতায় তার চেয়ে কম ছিলেন না।

তিনি তামান্না করছিলেন,তার ছেলেকে দেখবেন, সে অন্যান্য লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকাতলে মুজাহিদ বেশে যাচ্ছে...

তিনি আশা করছিলেন, সে ঐ স্থান দখল করে নিবে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট তার পিতা যে স্থান লাভের অপেক্ষা করছিলেন, যদি তিনি বেঁচে থাকতেন।

* * *

কিন্তু আনসারী বালক যখন দেখল, বয়সের স্বল্পতার কারণে সে এ অঙ্গনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভে ভাগ্যবান হতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন তার বুদ্ধি তাকে আরেকটি অঙ্গনের সন্ধান দিল, যার সাথে বয়সের কোন সম্পর্ক নেই, যা তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য দান করবে এবং তাকে রাসূলের নিকটে নিয়ে যাবে।

আর সে অঙ্গন হল ইলম ও হিফজের অঙ্গন...

তখন বালকটি তার চিন্তার কথা তার মাকে বলল। আর তার মা তাতে আনন্দিত ও মুগ্ধ হলেন এবং তা বাস্তবায়নে তৎপর হয়ে উঠলেন।

* * *

নাওয়ার তাঁর ছেলের আগ্রহের বিষয়টি তাঁর গোত্রের কিছু লোকের কাছে ব্যক্ত করল এবং তাদের কাছে তাঁর ছেলের চিন্তার কথা বর্ণনা করল...

তখন তারা তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন,

হে আল্লাহর নবী ! এই আমাদের ছেলে যায়েদ ইবনে ছাবেত, আল্লাহর কিতাব থেকে সতেরটি সূরা মুখস্থ করে ফেলেছে। বিশুদ্ধভাবে তা তিলাওয়াত করে, যেমনিভাবে তা আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

তা ছাড়াও সে সুন্দর করে লিখতে ও পড়তে পারে। এর মাধ্যমে সে আপনার নৈকট্য লাভ করতে চায়, আপনার সাথে থাকতে চায়। সুতরাং আপনি চাইলে তার থেকে শুনে দেখুন।

* * *

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বালক যায়েদ ইবনে ছাবেত থেকে সে যা মুখস্থ করেছে তার কিয়দাংশ শ্রবণ করলেন। তিনি বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তার তিলাওয়াত আলোকময়, তার উচ্চারণ সুস্পষ্ট।

কুরআনের কালিমাগুলো তার ওষ্ঠাধরে ঝলমল করে যেমন তারকাগুলো আকাশের পৃষ্ঠে ঝলমল করে...

তার তিলাওয়াতের শব্দে শব্দে আয়াতের ভাব ও মর্ম দারুণভাবে ফুটে ওঠে। তার প্রতিটি ওয়াকফ ও বিরাম থেকে স্পষ্টতাই বোঝা যায়, তিনি যা পড়ছেন তা পড়ছেন গভীর উপলব্ধি নিয়ে।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আনন্দিত হলেন। কারণ তারা যা বলেছে তিনি তাকে তার চেয়ে অধিক পেয়েছেন। আর লেখার ক্ষেত্রে তার দক্ষতা রাসূলের আনন্দকে আরো বাড়িয়ে দিল... তাই নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে বললেন, হে যায়েদ ! তুমি ইহুদীদের ভাষা শিখে নাও, কারণ আমি যা বলি সে ব্যাপারে আমি তাদেরকে নিরাপদ মনে করি না।

সে বলল, ইয়া রাসূল্লাল্লাহ ! আমি হাজির, আমি প্রস্তুত।

সাথে সাথে তিনি ইবরানী ভাষা আয়ত্ত করতে মনোনিবেশ করলেন এবং অল্প সময়ে তাতে দক্ষতা অর্জন করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের নিকট পত্র লিখতে ইচ্ছে করলে তিনি রাসূলের হয়ে পত্র লিখতে শুরু করলেন। আর তারা যখন রাসূলের নিকট কোন পত্র লিখত তখন তিনি তা রাসূলকে পাঠ করে শুনাতেন।

তারপর রাসূলের নির্দেশে সুরইয়ানী ভাষা শিখলেন যেমন ইবরানী ভাষা শিখেছেন।

অতঃপর যুবক যায়েদ ইবনে ছাবেত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোভাষী হয়ে গেলেন।

* * *

তারপর যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.-এর পরিপক্ক বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বস্ততা, বুদ্ধির তীক্ষ্নতা আর

অনুধাবন শক্তি সম্পর্কে আশ্বস্ত হলেন তখন তিনি তাকে পৃথিবীতে আসমানী রিসালতের ব্যাপারে বিশ্বস্ত মনে করলেন এবং তাকে কাতেবে ওহী বানালেন

তাই রাসূলের হৃদয়ে কুরআনের কিছু অবতীর্ণ হলে তিনি তাঁকে ডেকে বলতেন,

হে যায়েদ ! তুমি তা লিখে রাখ। তখন তিনি তা লিখে রাখতেন।

এভাবে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ধীরে ধীরে কুরআন গ্রহণ করতে লাগলেন এবং কুরআনের আয়াতের সাথে সাথে তাঁর উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে লাগল...

তিনি রাসূলের মুখ থেকেই শানে নুযুল সহকারে সতেজ প্রাণবন্ত কুরআন গ্রহণ করতেন, তাই হিদায়াতের আলোকমালায় তার হৃদয় আলোকময় হয়ে উঠত... শরীয়তের গুরুতত্ত্বে তার মস্তিষ্ক দীপ্তমান হয়ে উঠত...

ফলে ভাগ্যবান যুবকটি কুরআনের জ্ঞানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠলেন। এবং কুরআনের জ্ঞানে রাসূলের ওফাতের পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের প্রথম কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলেন।

তাই সিদ্দিকে আকবার হযরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালে যাঁরা কুরআনকে একত্রিত করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের শীর্ষ ব্যক্তিত্ব...

আর হযরত উসমান রাযি.-এর খিলাফতকালে যারা কুরআনের বিভিন্ন কপিকে একটি কপিতে রূপান্তরিত করেছিলেন তিনি ছিলেন তাদের অগ্রগণ্য ব্যক্তি।

এই সম্মানের পরেও কি আর কোন সম্মান আছে যা অর্জনে মানুষ সংকল্পবদ্ধ হতে পারে? এই মর্যাদার পরেও কি এমন কোন মর্যাদা আছে যার প্রতি মানুষ মত অভিলাষী হয়ে উঠতে পারে?

* * *

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. এর উপর কুরআনের একটি বিশেষ অনুগ্রহ হল, যেসব স্থানে জ্ঞানী লোকেরা দিশেহারা হয়ে যায় সেখানে

কুরআন তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে...সুতরাং বনু সায়েদার পরামর্শ সভায় যখন মুসলমানরা এ বিষয় নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা কে হবে ?

মুহাজিররা বলল, আমাদের মধ্য থেকে খলীফা হবে। আর আমরাই তার অধিক যোগ্য।

আনসারদের কেউ কেউ বলল, বরং খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে। আর আমরাই তার উপযুক্ত।

অন্যান্যরা বলল, বরং আমাদের ও তোমাদের মধ্য থেকে যৌথভাবে খলীফা হবে...

কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কাজে তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে জিম্মা দিতেন, তখন আমাদের একজনকেও তার সাথে মিলিয়ে দিতেন।

মহা ফেৎনা হওয়ার উপক্রম হল। অথচ আল্লাহর নবী তাদের মাঝে চাদরাবৃত অবস্থায় রয়েছেন। এখনো তাঁকে দাফন করা হয়নি।

তখন কুরআনের হিদায়াতের আলোতে আলোকময়, সঠিক, বিভেদদূরকারী এমন একটি কথার প্রয়োজন ছিল যা ফেৎনাকে সূতিকাগৃহে দাফন করে দিবে আর দিশেহারাদের পথ দেখাবে।

এ কথাটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত আনসারী রাযি. এর মুখ থেকে ছুটে বেরোলো।

তিনি তাঁর গোত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আনসার সম্প্রদায়... নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাজিরদের একজন ছিলেন। তাই খলীফা ও হবে মুহাজির, তার মত...

আর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার ও সাহায্যকারী ছিলাম। তাই আমরা তাঁর পরে তাঁর খলীফার ও আনসার হয়ে, সত্যের পথে তার সহকারী হয়ে থাকব।

তারপর তিনি তাঁর হাতকে হযরত আবু বকর রাযি.-এর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ইনি হলেন তোমাদের খলীফা। সুতরাং তোমরা তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর।

* * *

কুরআন, কুরআনের গভীর জ্ঞান ও রাসূলের সাথে তাঁর দীর্ঘ সাহচর্যের বদৌলতে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. মুসলমানদের জন্য আলোর মিনার হয়ে গেলেন। খলীফাগণ তাঁর সাথে জটিল বিষয়ে পরামর্শ করতেন। সাধারণ মুসলমানগণ প্রয়োজনে তাঁর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করেন। বিশেষভাবে মীরাছের বিষয়ে তাঁর নিকট ছুটে আসেন। কেননা সে সময়ে মুসলমানদের মাঝে এমন কেউ ছিল না, যে মীরাছের বিধি-বিধানে তাঁর চেয়ে বেশী জ্ঞানী, তা বণ্টনে তাঁর চেয়ে বেশী পারদর্শী। তাই জাবিয়ার দিবস হযরত উমর রাযি. বক্তৃতাকালে বললেন,

হে লোক সকল ! কেউ কুরআন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে যেন যায়েদ ইবন ছাবেতের নিকট যায়...

কেউ ফিকহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে যেন মুয়ায ইবনে জাবালের নিকট যায়...

কেউ সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে চাইলে সে যেন আমার নিকট আসে। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে তার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন এবং তার বণ্টনকারী বানিয়েছেন।

* * *

সাহাবা কেরাম ও তাবেয়ীদের মাঝে যাঁরা তালেবে ইলম ছিলেন তাঁরা হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. এর মর্যাদাকে যথাযথভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তাই তারা তাঁর হৃদয়ের মাঝে ইলমের দৃঢ় অবস্থানের কারণে তাঁকে ইজ্জত ও সম্মান করতেন ।

ঐ তো ইলমের মহাসমুদ্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাকিয়ে দেখছেন, হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁর বাহনে রোহন করতে চাচ্ছেন। তখন তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বাহনের রিকাব মজবুতভাবে ধরলেন এবং বাহনের লাগাম ধরলেন...

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচার পুত্র ! তুমি বিরত থাক।

তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আলেমদের সাথে এমনই করার হুকুম আমাদের দেয়া হয়েছে।

তখন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. বললেন,তোমার হাতটি আমাকে দেখাও। তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. তাঁর হাত বের করে দেখালেন। সাথে সাথে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাতে ঝুকে পড়ে চুমু খেয়ে বললেন,

নবীর পরিবার-পরিজনের সাথে এমনই করার হুকুম আমাদের দেয়া হয়েছে।

* * *

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে গিয়ে মিলিত হলে মুসলমানগণ তাঁর ঐ ইলমের কারণে কাঁদলেন যা তাঁর সাথে সমাধিস্থ হয়ে গেছে। তাই হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন,

আজ এ উম্মতের বিজ্ঞ আলেম মৃত্যুবরণ করলেন। হয়তো আল্লাহ তাআলা ইবনে আব্বাসের মাঝে তাঁর প্রতিনিধি বানাবেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি হাস্‌সান ইবনে ছাবেত রাযি. তাঁর মৃত্যুতে শোক-কাব্য আবৃত্তি করলেন এবং তার সাথে নিজের শোকগাঁথা আবৃত্তি করলেন,

فَمَنْ لِلْقَوَافِي بَعْدَ حَسَّانٍ وَابْنِهِ

وَمَنْ لِلْمَعَانِيِّ بَعْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

হাসসান ও তার পুত্রের পর কে আর আছে কবিতার?

যায়েদ ইবনে ছাবেতের পরে কেবা আছে ভাব ও চেতনার?

হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি.

دأب رَبِيْعَةُ بْنُ كَعْبٍ فِي الْعِبَادَةِ لَيَحْظَى

بِمَرَافِقَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ ...

كَمَا حَظِيَ بِخِدْمَتِهِ وَصُحْبَتِهِ فِي الدُّنْيَا.

জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে **থাকা**র সৌভাগ্য অর্জনের জন্য রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি. অবিরাম ইবাদতে **লেগে** রইলেন।...যেমনিভাবে তিনি দুনিয়াতে তাঁর সাহচর্যে ও খিদমতে **লেগে** থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি.

হযরত রাবীয়া ইবনে কা'ব রাযি. বলেন,

যখন ঈমানের আলোয় আমার হৃদয় আলোকিত হয়েছিল আর ইসলামের মর্মসমূহে আমার অন্তর উদ্ভাসিত হয়েছিল, তখন আমি ছিলাম উঠতি বয়সের যুবক।

সর্বপ্রথম আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবলোকন করলাম, তখন তাঁকে এমনভাবে মহব্বত করলাম যে, তাঁর মহব্বত আমার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আধিপত্য কায়েম করল...

আমি তাকে এমনভাবে ভালবাসলাম যে, তাঁর ভালবাসা আমাকে সব কিছু থেকে ফিরিয়ে আনল।

তাই আমি একদা নিজেকে বললাম, ছি, ছি, রবীয়া ! এ কেমন কথা ? তুমি কেন রাসূলের খেদমতের জন্য নিজেকে সব কিছু থেকে মুক্ত করছো না !? তুমি নিজেকে তাঁর নিকট পেশ কর ... যদি তিনি রাজি হন তাহলে তো তুমি তার নৈকট্যে সৌভাগ্যবান হবে। তাঁর মহব্বতে কামিয়াব হবে। দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জন করে তুমি ভাগ্যবান হবে।

তারপর আমি আর দেরি করলাম না। নিজেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। আশা করলাম, তিনি আমাকে তাঁর খেদমতের জন্য কবুল করবেন।

আমার আশা ব্যর্থ হল না। আমি তাঁর খাদেম হব, তিনি তাতে রাজি হলেন। সে দিন থেকে আমি ছায়ার মত নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে লেগে রইলাম।

তিনি যেখানে গমন করেন আমি সেখানে গমন করি। আমি তাঁর কক্ষপথে আবর্তিত হই যেভাবে তিনি আবর্তিত হন।

তিনি আমার দিকে আড় নয়নে তাকালেই আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যেতাম। কোন প্রয়োজন অনুভব করলেই তিনি আমাকে দেখতেন,

আমি তা পূরণে ছুটে গেছি। আমি সারা দিন তাঁর খেদমত করতাম। দিবস শেষে তিনি যখন ইশার নামাযের পর ঘরে যেতেন তখন আমি চলে যেতে ইচ্ছে করতাম। কিন্তু আমি মনে মনে বলতে শুরু করলাম, হে রবীয়া ! তুমি কোথায় যাচ্ছো? !...

হয়তো রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তাই আমি তাঁর দরজায় বসে রইলাম। তাঁর দরজার চৌকাঠ থেকে আমি দূরে সরে রইলাম না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তেই রাত কাটিয়ে দিতেন।

মাঝে মাঝে আমি শুনতাম, তিনি সূরা ফাতেহা পাঠ করছেন। রাতের এক অংশ তিনি তা পুনরাবৃত্তি করতে করতেই কাটিয়ে দিতেন। ফলে আমি অপারগ হয়ে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতাম অথবা আমার চোখ আমাকে পরাভূত করত। ফলে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। মাঝে মাঝে আমি শুনতাম, সূরা ফাতেহাকে বারবার পাঠ করার চেয়ে অধিক সময় ধরে তিনি বারবার

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ পাঠ করছেন।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যাস ছিল, কেউ তার সাথে সদাচরণ করলে তিনি তার চেয়ে উত্তম বিনিময় প্রদান পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার খেদমতের বিনিময় দিতে পছন্দ করলেন। তাই একদা আমার অভিমুখী হয়ে বললেন, হে রাবীয়া ইবনে কা'ব!

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি হাজির। আমি উপস্থিত।

তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও, আমি তোমাকে তা দিব।

আমি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে সময় দিন। আমি আপনার নিকট কী চাব তা একটু ভেবে দেখি। তারপর আপনাকে তা জানাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে।

আর আমি তখন ছিলাম বিত্তহীন এক যুবক। আমার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ বা ঘরবাড়ি কিছুই ছিল না। আমি মসজিদে নববীর সুফ্ফায় অন্যান্য বিত্তহীন মুসলমানদের সাথে অবস্থান করতাম। লোকেরা আমাদেরকে 'ইসলামের মেহমান' বলে ডাকত।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন মুসলমান সদকার কিছু নিয়ে এলে তিনি তার সবটুকু আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। আর কেউ উপঢৌকনের কিছু পাঠালে তিনি তার কিছু রেখে বাকিটুকু আমাদের নিকট পাঠিয়ে দিতেন।

আমার মন আমাকে বলছে, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুনিয়ার সম্পদের কিছু চেয়ে নেই, যার সাহায্যে আমি দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাব এবং অন্যদের মত সম্পদ, স্ত্রী-পরিজন ও সন্ত ানের অধিকারী হব। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আমি বললাম, হে রাবীয়া ! তোমার ধ্বংস হোক! দুনিয়া অপসৃয়মান, ধ্বংসশীল। আর এতে তোমার যা রিযিক রয়েছে তার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিয়েছেন। সুতরাং তা অবশ্যই তোমার নিকট পৌঁছবে।

আর রাসূল তো তাঁর রবের নিকট মর্যাদার এমন এক স্থানে রয়েছেন যে তাঁর প্রার্থনা ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সুতরাং তুমি তাঁর নিকট আবেদন কর তিনি যেন আল্লাহর নিকট আখেরাতের কল্যাণের কিছু প্রার্থনা করেন।

সুতরাং তা আমার নিকট ভাল লাগল। তাতে আমার মন প্রশান্ত হল।

তারপর আমি রাসূলের নিকট এলাম। তিনি বললেন, হে রবীয়া ! তুমি কী চাইবে বল?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নিকট আপনি দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে আপনার সাথী বানান। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কে তোমাকে তা বলে দিয়েছে?

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি, কেউ আমাকে তা বলে দেয়নি। কিন্ত আপনি যখন আমাকে বললেন, তুমি আমার নিকট কিছু চাও,

আমি তোমাকে তা দিব,তখন আমার মন বলল, যেন আমি আপনার নিকট দুনিয়ার কিছু চাই...

কিন্তু এর কিছুক্ষণ পরই আমি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার উপর স্থায়ী জান্নাতকে প্রাধান্য দেয়ার দিশা পেলাম। তাই আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আল্লাহর নিকট আপনি দুআ করুন, যেন তিনি আমাকে জান্নাতে আপনার সাথী বানান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, হে রবীয়া ! তা ছাড়া অন্য কিছু চাও কি?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! মোটেই না। কারণ আমি যা চেয়েছি অন্য কিছুকে তার সমতুল্য মনে করি না।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِذَنْ أَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ

তাহলে সেজদার আধিক্যের মাধ্যমে তুমি আমাকে সহায়তা কর।

তখন থেকে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য আমি মুজাহাদা করতে লাগলাম যেমনিভাবে দুনিয়াতে তাঁর সাহচর্য ও খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

* * *

এরপর আর বেশী সময় গেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমায় ডেকে বললেন,

হে রবীয়া ! তুমি কি বিয়ে করবে না ?

আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন কিছু আমাকে আপনার খেদমত থেকে বিমুখ করবে, এটা আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া আমার নিকট এমন অর্থ-সম্পদ নেই যা দ্বারা আমি স্ত্রীর মহর দিব, যা ব্যয় করে আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন।

তারপর তিনি আমাকে দ্বিতীয় বার দেখলেন এবং বললেন, হে রবীয়া ! তুমি কি বিয়ে করবে না ?

প্রথম বারে আমি তাঁকে যা বলেছিলাম সে ধরনের কথার দ্বারাই আমি তাঁকে উত্তর দিলাম।

কিন্তু আমি একাকী হলেই স্বীয় কর্মের কারণে লজ্জিত হলাম। বললাম, ছি, হে রবীয়া !...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, নিশ্চয় দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষেত্রে তোমার জন্য যা সবচেয়ে বেশী উপযোগী তা নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার চেয়ে সমধিক জ্ঞাত। আর তোমার নিকট যা আছে তা তিনি তোমার চেয়ে বেশী জানেন।

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এরপর যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিয়ের জন্য আহবান করেন তাহলে আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিব।

*　　*　　*

এরপর আর বেশী সময় গেল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমায় ডেকে বললেন,

হে রবীয়া ! তুমি কি বিয়ে করবে না ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ !

কিন্তু কে আমাকে তার মেয়ের সাথে বিয়ে দিবে ? আর আমার অবস্থা যে কেমন আপনি তা জানেন?!

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অমুক ব্যক্তির পরিজনের নিকট যাও এবং তাদের বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের অমুক মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন।

আমি তখন সলজ্জ অবস্থায় তাদের নিকট এলাম এবং তাদেরকে বললাম, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন, যেন তোমরা আমার সাথে তোমাদের অমুক মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দাও।

তারা বলল, অমুককে ?!

আমি বললাম, হ্যাঁ, অমুককে।

তারা বলল,আল্লাহর রাসূলকে স্বাগতম। আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত পুরুষকে স্বাগতম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আল্লাহর রাসূলের প্রেরিত পুরুষ তাঁর হাজত পূরণ করেই ফিরবে।

আমার সাথে তার বিয়ের আকদ করে দিল।

তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি একটি উত্তম পরিবারের নিকট থেকে এসেছি...

তারা আমাকে বিশ্বাস করেছে। স্বাগত জানিয়েছে। তাদের মেয়ের সাথে আমার আকদ করে দিয়েছে।

সুতরাং আমি কোত্থেকে তাদের নিকট মহর নিয়ে যাব?!

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বুরাইদা ইবনে খুছাইব রাযি. কে ডেকে পাঠালেন। তিনি আমার গোত্র বনু আসলামের একজন সরদার ছিলেন। তাঁকে বললেন,

হে বুরাইদা! রবীয়ার জন্য এক দানা পরিমাণ স্বর্ণ জমা কর... তিনি তা জমা করলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এ টুকু নিয়ে তাদের নিকট যাও এবং তাদের বল, এটা আপনাদের মেয়ের মহর। তখন আমি তাদের নিকট এলাম এবং তা তাদের দিলাম। তারা তা কবুল করল, তাতে সন্তুষ্ট হল এবং বলল, এ তো প্রচুর ও উত্তম...

তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ওলিমা করার অর্থ পাবো কোত্থেকে?

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বুরাইদা রাযি. কে বললেন, রবীয়ার জন্য একটি দুম্বার ব্যবস্থা কর। তখন তিনি আমার জন্য একটি বড় মোটা দুম্বা কিনে আনলেন।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন,আয়েশার নিকট যাও। তাকে বল, তার নিকট যেটুকু যব আছে তা যেন সে তোমাকে দিয়ে দেয়। আমি তার নিকট এলে তিনি বললেন, থলেটি নিয়ে যাও, তাতে সাত ছা যব আছে, আল্লাহর কছম করে বলছি, আমাদের কাছে আর কোন খাবার নেই।

এরপর আমি দুম্বা ও যব নিয়ে আমার স্ত্রীর পরিজনের কাছে গেলাম।

তারা বলল, যব দ্বারা আমরা রুটি তৈরী করছি।

আর তুমি তোমার বন্ধুদের বল, তারা যেন দুম্বা দ্বারা তরকারী তৈরী করে দেয়।

তখন আমি ও বনু আসলামের কিছু লোক দুম্বাটি নিয়ে যবাহ্ করলাম। তাকে চামড়া মুক্ত করলাম ও পাক করলাম। তখন আমাদের নিকট গোস্ত ও রুটি হল।

তখন আমি ওলিমা করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত দিলাম। তিনি আমার দাওয়াত গ্রহণ করলেন।

* * *

তারপর হযরত আবু বকর রাযি.-এর জমির পাশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কিছু জমি দিলেন। তখন দুনিয়া আমাকে পেয়ে বসল। অবশেষে আমি একটি খেজুর বৃক্ষ নিয়ে হযরত আবু বকর রাযি.-এর সাথে মতানৈক্যে লিপ্ত হলাম।

আমি বললাম, এটা আমার জমিতে।

তিনি বললেন, বরং তা আমার জমিতে।

আমি তাঁর সাথে তর্কে লিপ্ত হলাম। তখন তিনি আমাকে এমন এক কথা বললেন যা আমি অপছন্দ করলাম।

কথাটি তাঁর থেকে বেরিয়ে পড়লে তিনি লজ্জিত হলেন। বললেন, হে রবীয়া ! তুমি আমাকে তেমন একটি কথা বলে দাও। তাহলে তা কেসাস হয়ে যাবে।

আমি বললাম, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তা করব না ।

তিনি বললেন, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যাব এবং তুমি আমার থেকে কেসাস না নেয়ার অভিযোগ করব।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তখন আমি তার অনুসরণ করে গেলাম।

তখন আমার গোত্র বনু আসলামের লোকেরা আমার অনুসরণ করে গিয়ে বলল,

তিনিইতো আগে তোমাকে গালি দিয়েছে তারপর তোমার আগে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে!!!

আমি তখন তাদের দিকে ফিরে বললাম, ছি, ছি, তোমরা কী বলছো? তোমরা কি জানো ইনি কে?

ইনি হলেন সিদ্দিক...

মুসলমানদের মাঝে বর্ষিয়ান ব্যক্তি...

তিনি তোমাদের দেখার পূর্বে তোমরা ফিরে যাও। তা না হলে তিনি ধারনা করবেন, তোমরা আমাকে সাহায্য করার জন্য এসেছো। আর তিনি রাগ করবেন। তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসব আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাগ করার কারণে রাগ করবেন। আর তাদের রাগের কারণে আল্লাহ রাগ করবেন। তখন রবীয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন তারা ফিরে এল।

তারপর হযরত আবু বকর রাযি. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন এবং ঘটনাটি যেমন ঘটেছে তেমনিই তার নিকট বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার দিকে শির তুলে বললেন,

হে রবীয়া ! সিদ্দীকের সঙ্গে তোমার কী হয়েছে?!

আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমাকে যেমন বলেছেন আমি যেন তেমন বলি তাই তিনি চেয়েছেন। কিন্তু আমি তা করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, সে তোমাকে যেমন বলেছে তুমি তাকে তেমন বলো না।

তবে তুমি বল, আল্লাহ আবু বকরকে ক্ষমা করে দিন।

তখন আমি তাকে বললাম, হে আবু বকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিন।

তখন তিনি অশ্রুসজল নয়নে এ কথা বলতে বলতে চলে গেলেন...

হে রবীয়া ইবনে কা'ব ! আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন...

হে রবীয়া ইবনে কা'ব ! আল্লাহ তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উত্তম বিনিময় দান করুন...

যুল্‌বিযাদাইন
হযরত আব্দুল্লাহ আল্ মুযানি রাযি.

لَقَدْ نَادَتُ الدُّنْيَا ذَا الْبِجَادَيْنِ .

فَأَصَمَّ أُذُنَيْهِ عَنْ سِمَاعِ أَصْوَاتِهَا ،

وَأَقْبَلَ عَلَى الْآخِرَةِ

يَطْلُبُهَا مِنْ كُلِّ سَبِيْلٍ.

দুনিয়া যুলবিযাদাইন রাযি. কে আহবান করেছে,
তখন তিনি তার আহবান শুনা হতে কানকে বধির করেছেন।
আর আখেরাতকে তার প্রত্যেক পথ দিয়ে অনুসন্ধান করেছেন।

যুল্‌বিযাদাইন
হযরত আব্দুল্লাহ আল্‌ মুযানি রাযি.

মদীনা মুনাওয়ারা থেকে মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার পথে পথিকের ডান পাশে সবুজ পাদদেশবিশিষ্ট একটি পাহাড় রয়েছে...

যার চূড়া অত্যন্ত চমৎকার...

যার ছায়া সুদীর্ঘ...

তাকে অরকান পাহাড় বলে ডাকা হয়।

এ পাহাড়ে মুযাইনা কবিলার এক শাখা বসবাস করত।

*　　*　　*

ইয়াসরিবের নিকটবর্তী সেই পাহাড়ের এক গিরিপথে আব্দুল উয্‌যা ইবনে আবদে নাহাম আল্‌ মুযানি দরিদ্র পিতামাতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন।

মক্কা মুকাররমায় নূর বিকশিত হওয়ার কিছুকাল পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। তবে কিছুকাল যেতে না যেতেই মৃত্যুর হাত মুযানি শিশুর পিতাকে ছিনিয়ে নেয়। তখন সে হাঁটতেও পারত না। তখন দারিদ্র্য ও পিতৃহীনতা তার চিরসাথী হয়ে যায়। কিন্তু এই অর্থসম্পদহীন এতিম বালকের ছিলো বিপুল ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যময় জীবনের অধিকারী এক চাচা...

তার এই চাচার কোন সন্তান ছিল না যে তার জীবনকে সুশোভিত করবে...

অথবা এমন কোন উত্তরাধীকারী ছিল না যে তার সম্পদের উত্তরাধীকারী হবে...

তাই সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুব ভালবাসল এবং তাকে তার সম্পদ ও মনের ঐ জায়গায় স্থান দিল যেখানে পিতা পুত্রকে স্থান দেয়।

*　　*　　*

মুযানি বালক যুবক হয়ে গেল। কিন্তু তখনো সে নতুন ধর্মের কোন কথা শুনতে পেলো না এবং তার প্রবক্তা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন খবরাখবরই তার নিকট পৌঁছল না ।

সময় দীর্ঘ হল। অবশেষে ইয়াসরিব উজ্জ্বল আলোকময় মুবারক দিনটিতে সৌভাগ্যবান হয়ে উঠল, যে দিন রাসূলে আ'জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে সেখানে এলেন।

মুযানি যুবক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদসমূহ অনুসন্ধান করতে লাগল। তাঁর অবস্থাসমূহ তালাশ করতে লাগল এবং দিনের অধিকাংশ সময় মদীনাগামী পথের পাশে অবস্থান করে মদীনায় গমনাগমনকারী ব্যক্তিদের নতুন ধর্ম ও তার সাহায্যকারীদের সম্পর্কে, নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সংবাদসমূহ অনুশোচনায়দগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় জিজ্ঞেস করত।

অবশেষে আল্লাহ তার পবিত্র হৃদয়কে ইসলামের জন্য খুলে দিলেন।

ঈমানের আলোর জন্য তার সজিব হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিলেন।

তাই তিনি সাক্ষ্য দিলেন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

আর তা ঘটেছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বে...

এবং তার দু'কান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শোনার পূর্বে...

তাই তিনি ছিলেন অরকান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তাঁর গোত্রের সর্ব প্রথম মুসলিম।

* * *

মুযানী যুবক তাঁর ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোত্রের সকলের থেকে গোপন রাখলেন। বিশেষভাবে তিনি তা তার চাচা থেকে গোপন রাখলেন। তিনি প্রায়ই দূরবর্তী গিরিপথে বেরিয়ে যেতে লাগলেন মানুষের দৃষ্টি থেকে দূরে থেকে গিরিপথের প্রান্তে প্রান্তে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য।

আর অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাথে ঐ দিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন যে দিন তাঁর চাচা ইসলাম গ্রহণ করবে,

যেন তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথাটি ঘোষণা করতে সক্ষম হন...

যেন তিনি তাঁর চাচাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গমন করতে পারেন...

আর তা হয়েছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের আগ্রহ তাঁর হৃদয়কে পরাভূত করার পর ও তাঁর চিন্তা-শক্তিকে ব্যতিব্যস্ত করার পর।

* * *

মুমিন যুবক যখন দেখল, তাঁর ধৈর্য দীর্ঘ হচ্ছে...

আর তার চাচা ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বেশ দূরে...

অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রণাঙ্গণে যুদ্ধের সুযোগ একের পর এক ছুটে যাচ্ছে তখন তিনি তার কর্মের পরিণতির ব্যাপারে সচেতন থেকেই তার কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। তিনি বললেন,

হে চাচা, দীর্ঘ দিন যাবৎ আপনার ইসলাম গ্রহণের অপেক্ষায় আছি। এখন আমার ধৈর্য শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং যদি আপনি আগ্রহী হন যে, আপনি ইসলাম গ্রহণ করবেন আর আল্লাহ আপনার জন্য সৌভাগ্য লিপিবদ্ধ করবেন তা হলে তো আপনি এক চমৎকার কাজ করলেন। আর যদি তা না করেন তা হলে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, যেন আমি মানুষের মাঝে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে পারি।

* * *

যুবকের কথাগুলো তাঁর চাচার কান স্পর্শ করতে না করতেই তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। বললেন, আমি লাত ও উয্যার কসম খেয়ে বলছি, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর তাহলে আমি তোমার হাত থেকে ঐ সব কিছু ছিনিয়ে নিব যা আমি তোমাকে দিতাম। আর আমি তোমাকে দারিদ্র্যের হাতে সমর্পণ করব।

আমি তোমাকে অভাব আর ক্ষুধার শিকার বানিয়ে ছাড়ব।

কিন্তু এ ধমকি মুমিন যুবকের প্রশান্তিতে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলো না।

তাঁর প্রতিজ্ঞায় কোন দুর্বলতা সৃষ্টি করতে পারলো না।

তাই তাঁর চাচা তাঁর বিরুদ্ধে গোত্রের সহায়তা প্রার্থনা করল।

ফলে তারা তাঁকে ভীতিপ্রদর্শন করতে ও হুঁশিয়ার করতে লাগল।

তারা তাঁকে ধমকাতে ও শাসাতে লাগল। তাই তিনি তাদের বলতেন, তোমাদের যা ইচ্ছে কর, তবে আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি

মুহাম্মাদের অনুসরণ করে যাব। আর মূর্তিপূজা পরিহার করতেই থাকব। মহাপরাক্রমশালী এক সত্তার ইবাদতে ছুটেই চলবো।...

এ ক্ষেত্রে তোমাদের পক্ষ থেকে আর আমার চাচার পক্ষ থেকে যাই হোক না কেন!...

সুতরাং তার চাচা থেকে এটাই ঘটল যে, সে তাকে যা কিছু দিয়েছিলো তা সব ছিনিয়ে নিল।...

তার সাহায্য বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে তার দান থেকে বঞ্চিত করল।

তাকে কেবল এতটুকু চাদরই প্রদান করল যা দ্বারা তিনি তারঁ শরীর ঢাকতে পারেন।

* * *

মুযানি যুবক তাঁর দ্বীন নিয়ে শৈশবের নিবাস আর কৈশোরের খেলার প্রান্তর পশ্চাতে ফেলে আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকট হিজরত করলেন ...

তাঁর চাচার হাতে যে সম্পদ আর প্রাচুর্য রয়েছে তা থেকে বিমুখ হয়ে...

আল্লাহর নিকট যে সওয়াব ও প্রতিদান রয়েছে তার প্রতি আগ্রহী হয়ে...

মদীনার দিকে তিনি ছুটতে লাগলেন যখন আগ্রহেরা দলে দলে তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার হৃদয়কে ছিন্নভিন্ন করে।

ইয়াসরিবের নিকটে পৌঁছে তিনি তাঁর চাদরকে দু'টুকরা করে ফেললেন...

এক টুকরাকে লুঙ্গি বানালেন...

অপর টুকরাকে চাদর বানালেন...

তারপর তিনি মসজিদে নববীতে গেলেন এবং সে রাতটুকু সেখানেই কাটালেন। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়তেই তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কামরার অদূরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং শওক ও আগ্রহের সাথে কামরা থেকে রাসূলে আ'জমের বের হওয়ার অপেক্ষা করতে লাগলেন।

রাসূলের উপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর উভয় কপোলের উপর আনন্দের

অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি অনুভব করলেন, যেন তাঁর হৃদয় পাঁজর ভেদ করে রাসূলকে সালাত ও সালাম পেশ করার জন্য লাফ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছে।

* * *

নামাযের পর নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অভ্যাস মত দাঁড়িয়ে লোকদের চেহারা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। মুযানি যুবকের উপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই তিনি বললেন,

হে যুবক ! তুমি কোন গোত্রের ?

তিনি তাঁর নিকট তার বংশ-পরিচয় দিলেন।

তখন রাসূল তাঁকে বললেন, তোমার নাম কি ?

তিনি বললেন, আব্দুল উয্যা।

তখন রাসূল বললেন, না, বরং তোমার নাম আব্দুল্লাহ।

তারপর তার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, তুমি আমাদের নিকটে থাকো এবং আমাদের অতিথির একজন হয়ে যাও ...

সে দিন থেকে লোকেরা তাঁকে আব্দুল্লাহ নামে ডাকতে শুরু করল।

আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে দুই চাদর পরিহিত দেখে যুল্‌বিযাদাইন (দুই চাদর পরিহিত) উপাধি দিলেন এবং তাঁর কাহিনী জানলেন।

তাই ইতিহাসে তিনি এ উপাধিতেই অধিক খ্যাতি লাভ করেছেন।

হে প্রিয় পাঠক ! তুমি কিন্তু হযরত যুল্‌বিযাদাইন রাযি.-এর সৌভাগ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না, যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশ্রয়ে রইলেন তারপর তার মজলিসসমূহে উপস্থিত হতে থাকলেন...

তিনি তাঁর পশ্চাতে নামায আদায় করেন ...

তাঁর হিদায়াতের ঝর্ণাধারা থেকে পিয়াসা দূর করেন।

তাঁর চরিত্রমাধুরী থেকে পরিতৃপ্ত হন।

* * *

দুনিয়া তাঁকে আহবান করেছে আর তিনি তার গুঞ্জন শোনা থেকে কানকে বধির করে রেখেছেন ...

আর প্রত্যেক পথে আখেরাতকে অনুসন্ধান করতে তিনি ধাবিত হয়েছেন। দু'আর মাধ্যমে তিনি আখেরাতকে অনুসন্ধান করেছেন, ভয়-ভীতি আর বিনয়-নম্রতার সাথে তিনি যার আশ্রয় নিতেন।

ফলে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর নাম রাখলেন " আউওয়াহ"

কুরআনের মাধ্যমে তিনি আখেরাতকে অনুসন্ধান করেছেন। তাই তিনি তার সুস্পষ্ট আয়াতের সুগন্ধি দ্বারা মসজিদে নববীর চারপাশকে সুবাসিত করতেন ...

কুরআনের মাধ্যমে তিনি আখেরাতকে অনুসন্ধান করেছেন।

তাই রাসূল যে সব গাজওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন তার একটিও তার জীবন থেকে ছুটে যায়নি।

* * *

তাবুকের যুদ্ধে হযরত যুল্‌বিযাদাইন রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আবেদন করলেন, যেন তিনি তার জন্য শাহাদাতের দু'আ করেন।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, যেন কাফেরের তরবারী থেকে তাঁর রক্তকে আল্লাহ হিফাজত করেন।

তিনি তখন রাসূলকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত। আমি তো আপনার নিকট এটা কামনা করিনি।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِذَا خَرَجْتَ غَازِيًا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَمَرِضْتَ فَمُتَّ فَأَنْتَ شَهِيدٌ

وَإِذَا جَمَحَتْ بِكَ دَابَّتُكَ فَسَقَطْتَ فَقُتِلْتَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ.

তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হয়ে অসুস্থ হও। তারপর মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তুমি শহীদ। আর যদি তোমার বাহনপশুটি অবাধ্য হয় আর তুমি পড়ে যাও। তারপর নিহত হও, তাহলে তুমি শহীদ।

* * *

এ আলোচনার পর মাত্র একদিন ও একরাত অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুযানি যুবক জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং মৃত্যুবরণ করলেন।

তিনি আল্লাহর পথে হিজরত করে মুত্যুবরণ করলেন

আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় মুত্যুবরণ করলেন ...

পরিজন ও গোত্র থেকে দূরে ...

স্বদেশ ও বাড়ি থেকে পরদেশে...

এ সব কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ তাঁকে উত্তম বিনিময় প্রদান করলেন।

সাহাবায়ে কেরাম তাদের পবিত্র হাতে তাঁর কবর খনন করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর কবরে নামলেন।

এবং তিনি তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা তা সমান করলেন।

আর শাইখাইন হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি. তাঁকে কবরে নিয়ে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

قَرِّبَا إِلَيَّ أَخَاكُمَا

তোমরা তোমাদের ভাইকে আমার নিকটবর্তী কর।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছ থেকে তাঁকে নিয়ে তাঁর কবরে শুইয়ে দিলেন...

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. দাঁড়িয়ে ঐসব কিছু দেখছিলেন। তাই তিনি বললেন,

لَيْتَنِي كُنْتُ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ....

وَاللهِ . وَدِدْتُ لَوْ كُنْتُ مَكَانَهُ

وَقَدْ أَسْلَمْتُ قَبْلَهُ بِخَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً.

"হায় আফসোস ! যদি আমি এই সমাধির সমাধিস্থ ব্যক্তিটি হতাম। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তাঁর স্থানে হওয়ার আশা করছি, অথচ আমি তার পনের বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছি।"

হযরত আবুল আস ইবনে রবীয় রাযি.

حَدَّثَنِي أَبُو الْعَاصِ فَصَدَقَنِي

وَوَعَدَنِي فَوَفَىٰ لِي

– محمد رسول الله

আবুল আস আমার সাথে কথা বলেছে,অতঃপর সে তা সত্যে পরিণত করেছে।

সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তা পূরণ করেছে।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আবুল আস ইবনে রবীয় রাযি.

আবুল আস ইবনে রবীয় আবশামী কুরাইশী ছিলেন ভরপুর যৌবনের যুবক, মোহনীয় উজ্জ্বলতা ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। প্রাচুর্য তার উপর ছায়া বিস্তারিত করেছে। বংশমর্যাদা তার চাদর দ্বারা তাকে মহিমাময় করেছে। তাই তিনি অহংকার, আত্মমর্যাদাবোধ, পৌরুষ ও বীরত্ব এবং ওয়াদাপূরণের গুণে গুণান্বিত আর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্যে গর্বিত হওয়ার সাথে সাথে আরবদের ঘোড় সওয়ারীতে ছিলেন উপমা।

আবুল আস শীত ও গ্রীষ্মের বাণিজ্যে খ্যাতিমান কুরাইশ থেকে বাণিজ্য-প্রীতি উত্তরাধিকারী সূত্রে লাভ করেছিলো। তাই তার বাণিজ্য কাফেলাসমূহ মক্কা ও শামের মাঝে যাতায়াত করত। তার কাফেলায় এক শত উট আর দু'শত লোক হত। আর লোকেরা তাকে তাদের অর্থ দিত যেন তিনি তাদের হয়ে ব্যবসা করেন। কেননা তার দক্ষতা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা তাদের কাছে পরীক্ষিত।

* * *

তার খালা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর স্ত্রী খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ তাকে নিজ সন্তানের মত ভালবাসতেন এবং তাকে মর্যাদা ও মমতার সাথে তার গৃহে ও অন্তরে একটি সম্মানজনক স্থানে অবস্থান দিতেন।

আবুল আসের প্রতি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর ভালবাসা খাদীজার ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না।

* * *

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর গৃহে বৎসরগুলো অত্যন্ত দ্রুত কেটে গেল। তাঁর সবচেয়ে বড় মেয়ে যায়নাব যুবতী হয়ে উঠল। বিকশিত হল যেমন ফুল বিকশিত হয়ে সুবাস ছড়ায়, চমৎকার শোভা ধারণ করে। তখন মক্কার সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্য হতে যারা সর্বগুণে সুষমামণ্ডিত তাদের সন্তানদের মন তাঁর দিকে লোভাতুর হয়ে উঠল...

আর কেনইবা তা হবে না?...তিনি তো বংশমর্যাদায় কুরাইশের

মেয়েদের মাঝে সবচেয়ে মর্যাদাবান, পিতা ও মাতা উভয় কুলে সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারীনী, শিষ্টাচার আর ভদ্রতায় সবচেয়ে বেশী পবিত্রা।

কিন্তু কীভাবে তারা তাঁকে পেয়ে সফল হবে?!

অথচ তাঁর খালার ছেলে মক্কার শ্রেষ্ঠ যুবক আবুল আস ইবনে রবীয় ইতিমধ্যে তাদের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

* * *

আবুল আসের সাথে যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদের বিয়ের পর মাত্র কয়েক বৎসর অতিক্রান্ত হল। ইতিমধ্যে ইলাহী নির্মল আলোয় মক্কার কঙ্কর ও বালুকাময় বিস্তৃত উপত্যকা আলোকিত হয়ে উঠল। আল্লাহ্ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য ও হিদায়াতের ধর্মসহ প্রেরণ করলেন। তাঁকে নির্দেশ দিলেন, যেন তিনি তাঁর নিকটতম স্বজনদের সতর্ক করেন। তখন নারীদের মধ্য হতে যাঁরা সর্বপ্রথম ঈমান আনলো তারা হলেন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ, তাঁর মেয়ে যায়নাব, রুকাইয়া, উম্মে কুলসূম, ফাতেমা। অথচ ফাতেমা তখন ছোট ছিলেন।

তবে জামাতা আবুল আস ইবনে রবীয় পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করাকে অপছন্দ করলেন। তার স্ত্রী যায়নাব যে ধর্মে প্রবেশ করেছে সে ধর্মে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন। অথচ সে তার স্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে। অকৃত্রিমভাবে মহব্বত করে।

* * *

যখন কুরাইশ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে বিরোধ চরম আকার ধারণ করল তখন কুরাইশের লোকেরা একে অপরকে বলল,

ছি, তোমরা তোমাদের যুবকদের মুহাম্মাদের মেয়েদের সাথে বিয়ে দিয়ে তার দুশ্চিন্তা বহন করে নিয়েছো। তাই তোমরা যদি তার মেয়েদেরকে তার নিকট ফিরিয়ে দাও, তাহলে সে তোমাদের ছেড়ে তার মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে...

সবাই বলল, এ তো এক চমৎকার প্রস্তাব। তখন তারা সবাই আবুল আসের নিকট গিয়ে বলল,

হে আবুল আস! তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ কর। তাকে তার পিতার বাড়িতে পাঠিয়ে দাও। আমরা তোমাকে কুরাইশের বুদ্ধিমতি, মর্যাদার অধিকারীনী যাকে ইচ্ছে কর তাকেই তোমার সাথে বিয়ে দিয়ে দিব।

আবুল আস বলল, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করব না। আর তার পরিবর্তে দুনিয়ার সকল নারীও যদি আমার জন্য হয় তাহলেও আমি তা পছন্দ করি না ...

তবে তাঁর দুই মেয়ে রুকাইয়া ও উম্মে কুলসূম তালাক প্রাপ্তা হয়ে তাঁর বাড়িতে চলে এল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত হলেন এবং তামান্না করলেন, যদি আবুল আসও অন্য দুই জামাতার মত তা করত। আর তিনি তো তখন এমন শক্তিরও অধিকারী ছিলেন না যে, তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য করবেন। আর তখনো মুশরিক পুরুষের সাথে মুমিনা নারীর বিয়ে হারাম হওয়ার বিধান নাযিল হয়নি।

* * *

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করলেন এবং সেখানে তার শক্তি সুসংহত হলো আর কুরাইশরা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বদরে বেরিয়ে এল তখন আবুল আস তাদের সাথে একেবারে নিরুপায় হয়ে যুদ্ধে আসতে বাধ্য হল...

কারণ মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তার কোনই আগ্রহ ছিল না। মুসলমানদের গালমন্দ করার ব্যাপারেও তার কোন স্পৃহা ছিল না। তবে গোত্রের মাঝে তার অবস্থান তাকে তাদের সাথে যেতে বাধ্য করল কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয়ের মাধ্যমে বদর প্রান্তর উন্মুক্ত হয়ে গেল, যা শিরকের হোতাদের লাঞ্ছিত করল আর তাগুতী শক্তির পিঠকে ভেঙ্গে দিল। এক দল নিহত হল, এক দল বন্দী হল, আরেক দল পালিয়ে আত্মরক্ষা করলো।

তখন বন্দীদের দলে ছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেয়ে যায়নাবের স্বামী আবুল আস।

* * *

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বন্দীদের উপর মুক্তিপণ নির্ধারণ করলেন, যে মুক্তিপণ দিয়ে তারা মুক্ত হবে। গোত্রের মাঝে বন্দীর অবস্থান ও তার স্বচ্ছলতা বিবেচনায় মুক্তিপণ এক হাজার দিনার থেকে চার হাজার দিনারে উঠানামা করতে লাগল। মুক্তিপণ দিয়ে বন্দীদের মুক্তি করার অর্থ নিয়ে মক্কা মদীনার মাঝে দূতরা যাতায়াত করতে লাগল।

তখন যায়নাব তাঁর দূতকে তাঁর স্বামী আবুল আসের মুক্তিপণসহ মদীনায় প্রেরণ করল। তাতে একটি হার ছিল যা তাঁর মা খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ তাকে স্বামীর নিকট পাঠানোর দিন উপহার দিয়েছিলেন... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মালাটি দেখার পর গভীর বেদনার এক স্বচ্ছ আবরণ তার চেহারাকে আচ্ছাদিত করল। মেয়ের জন্য তাঁর হৃদয় একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তারপর সাহাবায়ে কেরামের দিকে তাকিয়ে বললেন,

"আবুল আসের মুক্তির জন্য যায়নাব এ অর্থ প্রেরণ করেছে, সুতরাং তোমরা ইচ্ছে করলে তাকে মুক্ত করে দাও এবং যায়নবের সম্পদ যায়নাবকে ফিরিয়ে দাও।"

তাঁরা বলল, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আপনার চোখের শীতলতার জন্য শীঘ্রই আমরা তা করছি।

*   *   *

তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তির পূর্বেই আবুল আসের উপর শর্তারোপ করলেন, যেন সে অবিলম্বে তাঁর মেয়ে যায়নাবকে পাঠিয়ে দেয়...

আবুল আস মক্কায় পৌঁছেই তার কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণে অগ্রসর হল...

সে তার স্ত্রীকে সফরের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়ে বললো, তোমার পিতার প্রেরিত দূতদ্বয় মক্কার অদূরে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারপর সে তার জন্য পাথেয় ও বাহনের ব্যবস্থা করে দিল এবং তার ভাই আমর ইবনে রবীয়কে তার সাথে মক্কার বাইরে অবস্থানরত দূতদের নিকট হাতে হাতে পৌঁছে দিতে উৎসাহিত করল।

*   *   *

আমর ইবনে রবীয় তার ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন। তুনীর বহন করলেন। যায়নাবকে হাওদায় তুলে নিলেন। তারপর দিবালোকে প্রকাশ্যে কুরাইশের সামনে দিয়ে তাঁকে নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন কুরাইশের লোকেরা ক্ষীপ্ত হয়ে উঠল। উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা তাদের পশ্চাতে ছুটল এবং অদূরেই তাদের ধরে ফেলল। তারা যায়নাবকে ভয় দেখাল। আতঙ্কিত করল...

তখন আমর তার ধনুকে তীর যোজনা করল। তার সামনে তুনীর খুলে রাখল। বলল, আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাদের কেউ তার নিকটবর্তী হলে আমি আমার তীর তার কণ্ঠনালীতে বসিয়ে দিব। আর তিনি তীরান্দাজে পারদর্শী ছিলেন। তার নিক্ষিপ্ত তীর কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না...

তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হরব এগিয়ে এসে বলল, শোন ভাতিজা! আগে তুমি তোমার তীর আমাদের থেকে সরাও তারপর আমরা তোমার সাথে কথা বলব। তখন সে তাদের থেকে তার ধনুক নামিয়ে রাখল। আবু সুফিয়ান তাকে বলল, তুমি কিন্তু সঠিক কাজ করো নি...প্রকাশ্যে মানুষের সামনে দিয়ে তুমি যায়নাবকে নিয়ে বেরিয়ে গেছো আর আমাদের গুপ্তচররা তা দেখছে ... আর আরবের সবাই বদর প্রান্তরে আমাদের পরাজয় ও তার পিতার হাতে আমাদের যা ঘটেছে তা সম্পর্কে জানে। এমনি অবস্থায় যদি তুমি তাকে নিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে যাও যেমন তুমি করেছো তাহলে সকল কবীলার লোকেরা আমাদেরকে ভীরু বলবে। আমাদের লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করবে। সুতরাং তুমি তাকে নিয়ে ফিরে যাও। কয়েকদিন তাকে তার স্বামীর গৃহে রাখ। তারপর মানুষ যখন বলাবলি করবে, আমরা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি তখন গোপনে তাকে নিয়ে আমাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যাও এবং তাকে তার পিতার নিকট পৌঁছে দাও। কারণ তাকে আটকে রাখার ব্যাপারে আমাদের কোন স্পৃহা নেই...

আমর এতে সন্তুষ্ট হয়ে যায়নাবকে নিয়ে মক্কায় ফিরে এল...

এর কিছুদিন পর এক রাতে সে যায়নাবকে নিয়ে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়ল এবং তার ভাইয়ের নির্দেশ মুতাবিক তাঁকে তাঁর পিতার দূতদের নিকট সমর্পণ করলেন।

* * *

স্ত্রী থেকে বিচ্ছেদের পর আবুল আস বেশ কিছুদিন মক্কায় অবস্থান করল। মক্কা বিজয়ের অল্প কিছুদিন আগে আবুল আস তার ব্যবসায়িক কাজে শামে রওনা হল। তারপর সে যখন মক্কায় ফিরে আসছিল আর তার সাথে তার কাফেলায় ছিল একশত উষ্ট্রী ও প্রায় একশত সত্তর জন লোক, তখন হঠাৎ মদীনার নিকটবর্তী স্থান থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রেরিত একটি ছোট যোদ্ধাবাহিনী তার সামনে প্রকাশিত হল। কাফেলাকে পাকড়াও করল। লোকদের গ্রেফ্‌তার করল। কিন্তু আবুল আস পালিয়ে গেল। তারা তাকে ধরতে পারল না।

তারপর রাত যখন তার চাদর ঢেলে দিল অন্ধকারের আড়ালে আবুল আস আচ্ছাদিত হল এবং ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করল ও যায়নাবের নিকট গিয়ে পৌঁছল। তাঁর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল এবং তিনি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করলেন...

* * *

ফজরের নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে এসে যখন মিহরাবে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং নিয়ত বাঁধার জন্য তাকবীর দিলেন ও সাহাবায়ে কেরামরাও তাঁর সাথে তাকবীর দিলেন তখন নারীদের সারি থেকে যায়নাব রাযি. চিৎকার করে বলল,

"হে লোক সকল ! আমি যায়নাব বিনতে মুহাম্মাদ। আমি আবুল আসকে নিরাপত্তা প্রদান করেছি। সুতরাং তোমরাও তাকে নিরাপত্তা দাও।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে সালাম ফিরানোর পর সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন,

আমি যা শুনেছি তোমরা কি তা শোনেছো ?!

তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা শুনেছি।

এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, তোমরা যা শুনেছো তা শুনার পূর্বে আমি কিছুই জানতাম না। আর একজন সাধারণ মুসলমানও আশ্রয় দিতে

পারে।” তারপর তিনি গৃহে ফিরে গিয়ে মেয়েকে বললেন, “আবুল আসকে একটি ভাল জায়গায় থাকতে দাও আর জেনে রাখ, তুমি কিন্তু তার জন্য বৈধ নও।”

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিনীর লোকদের যারা কাফেলাকে পাকড়াও করেছে ও লোকদের বন্দী করেছে তাদের ডেকে বললেন,

“এই লোকটির সাথে আমাদের কী সম্পর্ক তা তোমরা জান। আর তোমরা তার ধনসম্পদ ছিনিয়ে এনেছো। সুতরাং তোমরা যদি ভাল মনে কর তাহলে তাকে তার ধনসম্পদ ফিরিয়ে দাও যা আমরা কামনা করি। আর যদি তোমরা অস্বীকার কর তাহলে তা আল্লাহর দেয়া যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তিনি তোমাদেরকে প্রদান করেছেন। আর তোমরা তার অধিক হকদার। ”

তখন তারা বলল, বরং আমরা তা তার নিকট ফিরিয়ে দিব. ইয়া রাসূলাল্লাহ!

তারপর তিনি তা গ্রহণ করতে এলে তারা তাকে বলল, হে আবুল আস! তুমি কুরাইশের মাঝে একজন সম্মানী ব্যক্তি। তুমি রাসূলুল্লাহর চাচার ছেলে ও তাঁর জামাতা। সুতরাং তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে না। আর আমরা তো এ সব সম্পদ তোমাকে দিয়ে দিব। তখন তুমি তোমার সাথে থাকা মক্কার লোকদের সম্পদসমূহ ভোগ করবে আর আমাদের সাথে মদীনায় অবস্থান করবে ?

সে তখন বলল, তোমরা আমাকে খুব খারাপ প্রস্তাব দিয়েছো, কারণ এর অর্থ, আমি আমার নতুন ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে শুরু করব।

* * *

আবুল আস কাফেলা ও তার সমূদয় সম্পদ নিয়ে মক্কার পথে রওনা হয়ে গেলেন মক্কায় পৌঁছে তিনি প্রত্যেককে তার হক পৌঁছে দিলেন। তারপর বললেন,

"হে কুরাইশের লোকেরা! তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ বাকি আছে যার সম্পদ সে আমার থেকে নেয়নি?"

তারা বলল, না, বাকি নেই।... আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমরা তোমাকে বিশ্বস্ত ও সম্মানী পেয়েছি।

তখন সে বলল, তাহলে তোমরা শুনে নাও, আমি তোমাদের নিকট তোমাদের হক পরিপূর্ণভাবে পৌঁছে দিয়েছি আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল...

আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, মদীনায় মুহাম্মাদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করতে শুধু এ বিষয়ই আমাকে বাধা দিয়েছে যে, তোমরা আমার সম্পর্কে ধারণা করবে, আমি তোমাদের সম্পদ খাওয়ারই ইচ্ছে করেছি ...

তারপর আল্লাহ যখন তা তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলেন আর আমি আমার জিম্মামুক্ত হয়ে গেলাম তখন আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি...

তারপর মক্কা থেকে বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট আগমন করলেন। তখন রাসূল তার সম্মানজনক আতিথেয়তার ব্যবস্থা করলেন। তার স্ত্রীকে তার নিকট ফিরিয়ে দিলেন। এবং তার সম্পর্কে বলতেন,

" আবুল আস আমার সাথে কথা বলেছে, অতঃপর সে তা সত্যে পরিণত করেছে। সে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অতঃপর তা পূরণ করেছে। "

হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযি.

مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ

– محمد بن عبدالله

কেউ যুদ্ধ করতে চাইলে সে যেন আসেম ইবনে ছাবেতের মত যুদ্ধ করে।

–মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আসেম ইবনে ছাবেত রাযি.

কুরাইশদের মনিব-গোলাম সকলেই উহুদ প্রান্তরে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছে ...

বিদ্বেষ তাদের হৃদয়গুলোকে শান দিচ্ছিল। বদর প্রান্তরে তাদের মৃত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ-স্পৃহা তাদের খুনে আগুন ধরাচ্ছিল।

তা যথেষ্ট হল না। বরং তারা কুরাইশের বুদ্ধিমতি নারীদের সাথে নিয়ে গেল, যেন তারা পুরুষদের যুদ্ধে উৎসাহিত করে বীর যোদ্ধাদের হৃদয়ে প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুন জ্বালায় আর যখনই তারা দুর্বলতা ও হীনতায় আক্রান্ত হবে তখন তাদের মনোবলকে চাঙ্গা করে তোলে।

তাদের সাথে যারা বের হয়েছে তারা হল, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উৎবা, আমর ইবনে আসের স্ত্রী ওরাইতা বিনতে মুনাব্বিহ, সুলাফা বিনতে সাআদ আর তার সাথে তার স্বামী, তার তিন ছেলে মুসাফি, জুলাস ও কিলাব। এদের ছাড়া আরো অনেক নারী।

* * *

উহুদে যখন উভয় দল মুখোমুখি হল আর যুদ্ধের আগুন জ্বলতে লাগল তখন হিন্দ বিনতে উৎবা ও তার সঙ্গীনীরা গিয়ে সারির পশ্চাতে দাঁড়াল এবং দফ বাজিয়ে বাজিয়ে গান গাইতে লাগল,

إِنْ تُقْبِلُوا نُعَانِقْ وَنَفْرُشِ النَّمَارِقْ

أَوْ تُدْبِرُوا نُفَارِقْ فِرَاقَ غَيْرِ وَامِقْ

যদি রণক্ষেত্রে এগিয়ে যাও

তাহলে আমরা তোমাদের জড়িয়ে ধরব

আর তোমাদের বিশ্রামের জন্য তাকিয়া বিছিয়ে দিব।

আর যদি পিছন ফিরে পালাও

তাহলে আমরা তোমাদেরকে চিরতরে

তুচ্ছতার সাথে পরিত্যাগ করব।

তাদের এই গান অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধের আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছিল এবং তাদের স্বামীদের অন্তরে যাদুর মত কাজ করছিল...

তারপর যুদ্ধ শেষ হল... সে যুদ্ধে কুরাইশরা মুসলমানদের উপর বিজয় লাভ করল। আর বিজয়ের মদ-মত্ততা সেই নারীদের উদ্বেলিত করে ফেলল। তারা চিৎকার করতে করতে রণক্ষেত্রের মাঝে ঘুরত লাগল...

তারা নির্মমভাবে নিহতদের দেহ বিকৃতি করতে লাগল। পেট চিরে ফেলল। চোখ ফুঁড়ে দিল। নাক-কান কেটে ফেলল।

বরং তাদের একজনের ক্রোধ তো এতেও প্রশমিত হল না। সে নাক-কান দিয়ে গলার মালা আর পায়ের নূপুর বানাল। তার পিতা, ভাই, চাচা আর বদর প্রান্তরে নিহতদের প্রতিশোধ-স্পৃহায় সে তা দ্বারা সজ্জিত হল।

* * *

কিন্তু সুলাফা বিনতে সাআদের অবস্থা সমবয়সী অন্যান্য কুরাইশী নারীদের থেকে ভিন্ন ছিল...

সে ছিল অস্থির বেচাইন। সে তার স্বামী বা তিন ছেলের এক জনের আগমনের প্রত্যাশায় আপেক্ষা করছিল। তাহলে সে তাদের খবরাখবর জানতে পারবে। তারপর অন্যান্য নারীদের সাথে বিজয়-আনন্দে শরীক হবে। কিন্তু তার অপেক্ষা নিষ্ফলভাবেই দীর্ঘ হল। তাই সে রণাঙ্গনের গভীরে প্রবেশ করল। এবং নিহতদের চেহারা খুঁটেখুঁটে দেখতে লাগল। সহসা সে তার স্বামীকে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পেল। সাথে সাথে ভয়াতুরা সিংহীর ন্যায় লাফিয়ে উঠল এবং তার ছেলে মুসাফি, জুলাস ও কিলাবের সন্ধানে চারদিকে দৃষ্টি ফেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তাদের উহুদ প্রান্তরে সটান পড়ে থাকতে দেখতে পেল ...

মুসাফি আর কিলাব তো ইতিমধ্যে দুনিয়া ত্যাগ করে চলে গেছে। আর জুলাসকে একেবারে মুমূর্ষু অবস্থায় পেল।

* * *

সুলাফা মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফটরত ছেলের উপর ঝুঁকে পড়ল। মাথা কোলের উপর রাখল। কপাল ও মুখ থেকে রক্ত মুছে দিতে লাগল। বিপর্যয়ের ভয়াবহতায় তার চোখে অশ্রু শুকিয়ে গেছে। তারপর ঝুঁকে পড়ে বলতে লাগল, হে ছেলে ! কে তোমাকে ধরাশায়ী করেছে ?... সে উত্তর দিতে ইচ্ছে করল কিন্তু মৃত্যুর গড়গড়ানির কারণে উত্তর দিতে পারল না। তখন বারবার তাকে প্রশ্ন করলে বলল, আসেম ইবনে ছাবেত আমাকে ধরাশায়ী করেছে আর আর ভাই মুসাফিকে ধরাশায়ী করেছে আ... তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।

* * *

সুলাফা বিনতে সাআদ এবার একেবারে পাগল হয়ে গেল। চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। বিলাপ করতে লাগল। লাত ও উজ্জার নামে কসম খেয়ে বলল, কুরাইশরা আসেম ইবনে ছাবেত থেকে প্রতিশোধ নিয়ে তার মাথার খুলি তাকে দিলে সে তাতে মদ পান করার পরই তার হৃদয়-জ্বালা শান্ত হবে। তার চোখের অশ্রু শুকাবে।

তারপর মান্নত করল, যে তাকে বন্দী করবে, হত্যা করবে বা তার মাথা এনে দিবে তাকে সে তার চাহিদা মত মূল্যবান বস্তু প্রদান করবে।

কুরাইশের মাঝে তার মান্নতের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। আর মক্কার প্রত্যেক যুবকই তাকে ধরে তার শির সুলাফাকে দেয়ার তামান্না করতে লাগল। তাহলে হয়তো সে-ই পুরস্কার পেয়ে কামিয়াব হবে।

* * *

উহুদের যুদ্ধের পর মুসলমানগণ মদীনায় ফিরে এল। রণাঙ্গন ও তাতে ঘটে যাওয়া বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করতে লাগল। যে সব বীরযোদ্ধারা শহীদ হয়েছেন তাদের জন্য রহমত কামনা করতে লাগল। আর যে সব অস্ত্র সজ্জিত বীর যোদ্ধা তরবারী দিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছে তাদের প্রশংসা করতে লাগল... তখন তারা তাদের মাঝে আসেম ইবনে ছাবেতের আলোচনা করল। তারা বিস্মিত হল, কীভাবে সে যাদের হত্যা করেছে তাদের মধ্যে একই পরিবারের তিন ভাইকে হত্যা করল।

তখন তাদের একজন বলল, এতে আশ্চর্যের কী আছে ?!!

তোমাদের কি স্মরণ নেই, বদরের যুদ্ধের কিছুক্ষণ পূর্বে রাসূল যখন জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কীভাবে যুদ্ধ করবে? তখন আসেম ইবনে ছাবেত দাঁড়িয়ে ধনুক ধরে বলল,

যদি কুরাইশের লোকেরা আমার থেকে এক শ' হাত দূরে থাকে তাহলে তীর নিক্ষেপ করব...

আর যদি তারা এতটুকু নিকটবর্তী হয়ে যায় যে, বর্শা তাদের নাগাল পায় তাহলে ভেঙ্গে যাওয়া পর্যন্ত তাদের বর্শা দ্বারা আঘাত করব।

তারপর বর্শা ভেঙ্গে গেলে তা ফেলে দিয়ে তলোয়ার ধারণ করব। তারপর তলোয়ার দ্বারা যুদ্ধ চলবে।

তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যুদ্ধ এভাবেই করতে হয় ...

مَنْ قَاتَلَ فَلْيُقَاتِلْ كَمَا يُقَاتِلُ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ

"কেউ যুদ্ধ করতে চাইলে সে যেন আসেম ইবনে ছাবেতের মত যুদ্ধ করে।"

* * *

উহুদের যুদ্ধের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছয়জন সম্মানিত সাহাবীকে একটি বিশেষ কাজে প্রেরণের জন্য আহবান করলেন এবং আসেম ইবনে ছাবেতকে তাদের আমীর বানালেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা বাস্তবায়নের জন্য শ্রেষ্ঠ দলটি চলতে লাগল। উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী এক পথে তারা পৌছলে হুজাইল গোত্রের একদল লোক তাদের ব্যাপারে জানতে পারল। তখন তারা তাদের নিকট ছুটে এল এবং বেড়ী যেভাবে ঘাড়কে পরিবেষ্টন করে সেভাবে তাদের পরিবেষ্টন করে ফেলল।

তখন আসেম ও তার সঙ্গীরা তরবারী কোষমুক্ত করল এবং পরিবেষ্টনকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে ইচ্ছে করল।

হুজাইলীরা তখন বলল, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তোমাদের কোন শক্তি নেই। আমরা হলাম এ দেশের মানুষ। আমরা সংখ্যায় অসংখ্য অগণিত। আর তোমরা স্বল্প, তুচ্ছ...

তারপর আমরা কাবার রবের কসম করে বলছি, যদি তোমরা আত্মসমর্পণ কর তাহলে আমরা তোমাদের ক্ষতিকর কিছু করব না। সে ব্যাপারে তোমাদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার রইল...

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল, যেন তারা কী করবে সে ব্যাপারে পরামর্শ করছে ...

তখন আসেম তাঁর সাথীদের দিকে ফিরে বললেন,

"আমি কিন্তু কোন মুশরিকের দেয়া যিম্মায় যুদ্ধ ত্যাগ করছি না ... তারপর সুলাফা যে মান্নত করেছে তার কথা স্মরণ করলেন ও তরবারী কোষমুক্ত করে বললেন,

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَحْمِىْ لِدِيْنِكَ وَأُدَافِعُ عَنْهُ ....

فَاحْمِ لَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَلَا تُظْفِرْ بِهِمَا أَحَدًا مِنْ أَعْدَاءِ اللّٰهِ ...

"হে আল্লাহ! আমি আপনার ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছি এবং তার হিফাজতের জন্য লড়াই করছি ...

সুতরাং আপনি আমার গোশত ও হাড়কে রক্ষা করুন এবং আল্লাহর শত্রুদের কাউকে তা নিয়ে কামিয়াব হতে দিবেন না..."

তারপর তিনি হুজাইলীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন আর তাঁর সাথে তাঁর সঙ্গীদের দু'জন তাকে অনুসরণ করল। তাঁরা হলেন মারছাদ আল্ গানাবী ও খালিদ আল্ লাইছী... তাঁরা যুদ্ধ করতে করতে একের পর এক ধরাশায়ী হলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের অপর তিন জন হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে তারেক, যায়েদ ইবনে দিছিন্নাহ ও খুবাইব ইবনে আদী। তাঁরা আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু হুজাইলীরা তার পরপরই অত্যন্ত ঘৃণ্যভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল।

* * *

শুরুতে হুজাইলীরা জানত না যে, আসেম ইবনে ছাবেত তাদের নিহত ব্যক্তিদের একজন। তারপর তারা তা জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হল। তারা নিজেদেরকে বিরাট পুরস্কারের আশায় আশান্বিত করল।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই ... সুলাফা বিনতে সাআদ কি মান্নত মানে নি যে, যদি সে আসেম ইবনে ছাবেতকে পায় তাহলে সে তার মাথার খুলি দিয়ে মদ পান করবে ?

জীবিত বা মৃত অবস্থায় যে তাকে ধরে এনে দিবে তার জন্য কি সে তার চাহিদা মত সম্পদের প্রতিশ্রুতি দেয় নি ?!

* * *

আসেম ইবনে ছাবেতের শাহাদাতের কিছুক্ষণ পরই কুরাইশরা তাঁর নিহত হওয়ার বিষয়টি জানতে পারল। কারণ হুজাইল গোত্র মক্কার অদূরেই বসবাস করত।

তখন কুরাইশের সরদাররা আসেম ইবনে ছাবেতের হত্যাকারীদের নিকট তার মাথা চেয়ে একজন দূত পাঠাল। তারা তা দ্বারা সুলাফা বিনতে সাআদের শত্রুতার আগুন নিভাবে, তাকে তার কসম থেকে মুক্ত করবে এবং আসেম স্বহস্তে তার যে তিন ছেলেকে হত্যা করেছে তাদের দুঃখ-বেদনা কিছুটা লাঘব করবে ...

তারা দূতের সাথে প্রচুর সম্পদ দিয়ে দিল এবং তাকে নির্দেশ দিল, আসেমের মাথার বিনিময়ে তারা যেন তা উদার হস্তে হুজাইলীদের প্রদান করে।

* * *

হুজাইলীরা আসেম ইবনে ছাবেতের শরীর থেকে মাথা ছিন্ন করতে এগিয়ে গেল। তারা সহসা দলে দলে মৌমাছি আর বোলতা এসে তাঁর শরীরে বসতে দেখতে পেল। আর তারা তাঁকে সব দিক থেকে ঘিরে ফেলল...

তারপর তারা যখনই তাঁর লাশের নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করল তখনই তা তাদের চেহারা লক্ষ্য করে উড়ে এল এবং তাদের চোখে ও

কপালে শরীরের সব জায়গায় হুল ফোটাল এবং তাদেরকে তাঁর লাশ থেকে বিরত রাখল...

বারবার চেষ্টা করার পর যখন তারা তাঁর নিকট পৌঁছার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল তখন একে অপরকে বলল,

"রাতের আগমন পর্যন্ত তাকে রেখে দাও। অন্ধকারে বোলতারা তার থেকে দূর হয়ে যাবে এবং তোমাদের জন্য তাকে মুক্ত করে দিবে।

তারপর তারা অদূরে বসে রাতের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগল...

*   *   *

কিন্তু দিনের প্রত্যাগমন আর রাতের আগমনের সাথে সাথেই ঘন অন্ধকার মেঘমালায় আকাশ ছেয়ে গেল ...

আকাশ বজ্রপাত করল। ক্রোধোন্মাদ হল... মেঘ এমন মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণ করল বর্ষীয়ান ব্যক্তিরাও জন্মের পর থেকে তেমনটি দেখেনি ...

দ্রুত পাহাড়ি পথঘাট প্রবাহিত হল। রাস্তাঘাট ভরে গেল। উপত্যকা নিমজ্জিত হল...

বাঁধভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় তীব্র প্লাবন গোটা অঞ্চলকে ভাসিয়ে নিল...

প্রভাত আলোকিত হয়ে উঠলে হুজাইল গোত্রের লোকেরা চারদিকে আসেম ইবনে ছাবেতের লাশ তালাশ করল। কিন্তু তারা তার কোন আলামত খুঁজে পেল না...

তার কারণ প্লাবন তাকে অনেক অনেক দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে... অজ্ঞাত স্থানে তাকে নিয়ে চলে গেছে...

আল্লাহ তাআলা আসেম ইবনে ছাবেতের দুআ কবুল করেছেন। তাই তিনি তার পবিত্র দেহকে বিকৃতি করা থেকে হেফাজত করেছেন...

তাঁর মাথার খুলি দ্বারা মদ পান করা থেকে তাঁর মাথাকে হেফাজত করেছেন।

আর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ খুলে দেন না...

*   *   *

হযরত আবু ত্বালহা আনসারী রাযি.

عَاشَ أَبُو طَلْحَةَ حَيَاتَه صَائِمًا مُجَاهِدًا ...

وَمَاتَ كَذٰلِكَ صَائِمًا مُجَاهِدًا ...

আবু ত্বালহা তাঁর জীবনটি জিহাদে আর সিয়াম সাধনায় কাটিয়ে দিলেন...
আর মৃত্যুবরণও করলেন জিহাদে আর সিয়াম সাধনায়...

হযরত আবু ত্বালহা আনসারী রাযি.

যায়েদ ইবনে সাহল নাজজারী, যাঁর ডাকনাম আবু ত্বালহা তিনি জানলেন যে, রুমাইসা বিনতে মিলহান নাজজারিয়া যাঁর ডাকনাম উম্মে সুলাইম স্বামীর ইনতেকালের পর স্বামীহীন হয়ে গেছেন। এ সংবাদে তিনি আনন্দে উদ্বেলিত হলেন। আর এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। কারণ উম্মে সুলাইম ছিলেন সুদৃঢ়, গম্ভীর, অধিক জ্ঞান ও পবিত্রপূর্ণ চরিত্রের অধিকারিনী এক মহিয়সী নারী। তাই যারা তাঁর মতো নারীদের প্রতি আকৃষ্ট তাদের কেউ তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার আগেই তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার প্রতিজ্ঞা করলেন। আর আবু ত্বালহার আত্মবিশ্বাস ছিল যে, উম্মে সুলাইম তার আকাঙ্ক্ষীদের কাউকেই তার উপর প্রাধান্য দিবে না। কারণ তিনি পরিপূর্ণ পৌরুষ, শীর্ষস্থানীয় মর্যাদা আর অঢেল সম্পদের অধিকারী এক ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বনু নাজ্জার গোত্রের অশ্বারোহী যোদ্ধা ও ইয়াসরিবের হাতে গোনা কয়েকজন তীরান্দাজের একজন।

* * *

আবু ত্বলহা উম্মে সুলাইমের বাড়িতে গেলেন।...

পথেই তার আকাংখার মরণ হল। সে শুনলো, উম্মে সুলাইম তো মক্কার এই দাঈ মুসআব ইবনে উমাইর-এর কথা শুনে মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তার ধর্মের অনুসরণ করেছে। কিন্তু সাথে সাথেই সে মনে মনে বলল, আরে ! এতে দোষের কী আছে ? ...তার যে স্বামী ইনতেকাল করেছে সে কি তার পূর্বপূরুষদের ধর্ম আঁকড়ে ধরে মুহাম্মাদ ও তাঁর দাওয়াত থেকে বিমুখ থাকেনি ?!

* * *

আবু ত্বালহা উম্মে সুলাইমের বাড়িতে পৌঁছলেন। তার নিকট প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। তখন উম্মে সুলাইমের ছেলে আনাস সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আবু ত্বালহা তাকে নিজের জন্য প্রস্তাব করলে উম্মে সুলাইম বললেন,

"হে আবু ত্বালহা তোমার মতো লোককে ফিরিয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু আমি তো তোমাকে বিয়ে করব না। কারণ তুমি একজন কাফের...

আবু ত্বালহা ধারনা করলেন, উম্মে সুলাইম এর মাধ্যমে একটি কারণ দেখিয়েছেন। আসলে সে তার চেয়ে আরো অধিক সম্পদশালী ও সম্মানের অধিকারী কাউকে প্রধান্য দিচ্ছেন।

তাই তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, হে উম্মে সুলাইম! আসলে এ বিষয়টি অন্তরায় নয়।

উম্মে সুলাইম বললেন, অন্তরায় তাহলে কী?!

আবু ত্বালহা বললেন, দিনার-দেরহাম... আর সোনা চাঁদি ...

উম্মে সুলাইম বললেন, সোনা -চাঁদি?! ...

আবু ত্বালহা বললেন, হ্যাঁ।

উম্মে সুলাইম বললেন, বরং হে আবু ত্বলহা ! আমি তোমাকে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাক্ষ্য রেখে বলছি, যদি তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর তাহলে সোনা আর চাঁদি ছাড়াই আমি তোমাকে স্বামী হিসাবে বরণ করে নিব। তোমার ইসলাম গ্রহণকেই আমি আমার মহর বানিয়ে নিলাম...

* * *

উম্মে সুলাইমের কথা শুনার সাথে সাথে আবু ত্বালহার মন তার মূর্তির দিকে চলে গেল, যাকে সে মূল্যবান কাঠ দিয়ে বানিয়েছে এবং তাকে নিজের জন্যই নির্ধারিত করেছে যেমন গোত্রের নেতারা করে থাকে।

কিন্তু উম্মে সুলাইম সুযোগটি হাতছাড়া করতে চাইলেন না। তাই বলতে লাগলেন, হে আবু ত্বালহা! তুমি কি জান না, তুমি আল্লাহকে ছেড়ে যে ইলাহের ইবাদত করছো সে তো মাটি থেকে উদ্‌গত ?!

আবু ত্বালহা বললেন, হ্যাঁ জানি।

উম্মে সুলাইম বললেন,তুমি একটি গাছের গুড়ির ইবাদত করছো, তার একাংশকে তুমি ইলাহ বানিয়েছো অথচ অপরাংশকে অন্যজন ইন্ধন বানিয়েছে, যা দ্বারা সে আগুন পোহায় অথবা তার উত্তাপে খামির করা আটা দিয়ে রুটি বানায়... হে আবু ত্বালহা ! যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ কর

তাহলে আমি তোমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করব। ইসলাম ছাড়া আমি তোমার নিকট অন্য কোন মহর চাই না।

আবু ত্বালহার চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই আর সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারপর তিনি উম্মে সুলাইমকে বিয়ে করলেন।

তাই লোকেরা বলত, উম্মে সুলাইমের মহরের চেয়ে অধিক সম্মানজনক মহরের কথা আমরা ইতিপূর্বে শুনিনি। তিনি ইসলামকে তাঁর মহর বানিয়েছেন।

*   *   *

সে দিন থেকে হযরত আবু ত্বালহা রাযি. ইসলামের পতাকা তলে শামিল হলেন এবং তিনি তার সকল বিরল শক্তিকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করলেন।

তাই 'বাইয়াতুল আকাবা'-এ যে সত্তরজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বায়আত গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের একজন ছিলেন আর তার সাথে ছিলেন তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম।

তিনি বারজন আমীরের একজন ছিলেন যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে রাতে ইয়াসরিবের মুসলমানদের আমীর বানিয়েছিলেন।

অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাতে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন।

তবে জিহাদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আবু ত্বালহার সবচেয়ে কঠিন দিবস ছিল উহুদের দিবস। তুমি এখন সে দিবসের সংবাদ শুনে নাও।

*   *   *

হযরত আবু ত্বলহা রাযি. রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন ভালবাসলেন যে তা তাঁর হৃদয়ের গভীরে মিশে গেল। শিরা উপশিরায় রক্ত প্রবাহের সাথে প্রবাহিত হল। তাই তাঁকে দেখে তিনি পরিতৃপ্ত হতেন না। তার মিষ্টি কথা শুনে তিনি তৃষ্ণাহীন হতেন না।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একাকী থাকলে তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে যেতেন এবং বলতেন, আমার জীবন আপনার জীবনের জন্য উৎসর্গ হবে আর আমার চেহারা আপনার চেহারার জন্য ঢাল হবে।

উহুদের দিবসে মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দূরে সরে পড়লে কাফেররা চারদিক থেকে এগিয়ে এল। তারা তাঁর কপালে ক্ষত করল। তাঁর ঠোঁট কেটে ফেলল। চেহারায় রক্ত প্রবাহিত করল। শুধু তাই নয়, বিশৃঙ্খলাকারীরা এ কথা ছড়িয়ে দিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহত হয়েছেন। ফলে মুসলমানদের দুর্বলতা চরম আকার ধারণ করল। আল্লাহর শত্রুদের নিকট তারা পরাজয় বরণ করতে লাগল।

তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খুব কম লোকই অবিচল রইলেন। আর তাদের সর্বাগ্রে হলেন আবু ত্বালহা রাযি.।

* * *

নিশ্চল পর্বতমালার ন্যায় হযরত আবু ত্বালহা রাযি. রাসূলুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। আর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ঢাল বানিয়ে তাঁর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রইলেন।

তারপর হযরত আবু ত্বলহা রাযি. তার অপরাজেয় ধনুকটি টেনে ধরলেন। তাতে তার অব্যর্থ তীর সংযোজন করলেন এবং তা দ্বারা রাসূলকে রক্ষা করতে লাগলেন ও একের পর এক মুশরিক বাহিনীকে তীর দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু ত্বলহা রাযি. এর পশ্চাত থেকে উঁচু হয়ে তার তীর নিপতিত হওয়ার স্থান দেখছিলেন। তখন তিনি তাঁকে ভয়ে ফিরাচ্ছিলেন আর বলছিলেন,

"আমি আমার পিতা মাতার শপথ করে বলছি, আপনি তাদের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবেন না। তাহলে তারা আপনাকে তীর বিদ্ধ করবে...

আমার শির আপনার শিরের জন্য উৎসর্গ, আমার বুক আপনার বুকের জন্য উৎসর্গ, আমি নিজেকে আপনার জন্য উৎসর্গ করে দিলাম...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অদূর দিয়ে একজন মুসলিম যোদ্ধা পালিয়ে যাচ্ছিল। তার তুনীরে তীর ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন,

তুমি তোমার তীরগুলো আবু ত্বালহার সম্মুখে ছড়িয়ে দাও, পালিয়ে যেয়ো না।

আবু ত্বালহা রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকলেন। এমনকি একে একে তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেললেন। এবং আল্লাহর ইচ্ছায় মুশরিক বাহিনীর বেশ কিছু যোদ্ধাকে হত্যা করলেন।

তারপর রণাঙ্গণ শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁর নবীকে নিরাপদে রাখলেন। হিফাজতে রাখলেন।

* * *

যুদ্ধের সময়গুলোতে হযরত আবু ত্বলহা রাযি. যেমন আল্লাহর পথে জীবন বিলাতে উদার-দানশীল অকৃপণ ছিলেন, তেমনি অর্থ ব্যয়ের স্থানগুলোতেও অর্থ ব্যয় করতে অধিক উদার ও দানশীল ছিলেন।

তাঁর একটি খেজুর আর আঙ্গুরের বাগান ছিল। বৃক্ষ, সুস্বাদু খেজুর আর মিষ্টি পানির ক্ষেত্রে ইয়াসরিব এর চেয়ে অধিক বড় বাগান আর দেখেনি।

হযরত আবু ত্বালহা রাযি. তার ছায়ায় যখন নামায আদায় করছিলেন তখন রঙিন পা, লাল চঞ্চু আর সবুজ রঙের একটি পাখি তাঁর মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করে দিল। পাখিটি নেচে নেচে গান গেয়ে উল্লসিত হৃদয়ে একের পর এক বৃক্ষের ডালে বসতে লাগল।... তার দৃশ্য আবু ত্বালহাকে বিমুগ্ধ করল। তিনি পাখিটির সাথেই স্বচিন্তায় সাঁতরে চললেন।... তারপরই তিনি নিজের মাঝে ফিরে এলেন। আর দেখলেন, তিনি কত রাকাত পড়েছেন তা ভুলে গেছেন... দু'রাকাত... তিন রাকাত... তিনি কিছুই জানেন না... নামায শেষ করেই তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ছুটে গেলেন এবং তাঁর নিকট নিজের মনোযোগের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করলেন, যাকে নামায থেকে ফিরিয়েছে বাগান, প্রাচুর্যময় বৃক্ষ আর গানের পাখি। তারপর তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ রাসূল ! আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি এ বাগানটিকে আল্লাহর পথে দান করে দিলাম। সুতরাং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যেখানে পছন্দ করেন সেখানে তা খরচ করুন।

* * *

হযরত আবু ত্বালহা রাযি. তাঁর জীবনটি জিহাদে আর সিয়াম সাধনায় কাটিয়ে দিলেন...আর মৃত্যুবরণও করলেন জিহাদে আর সিয়াম সাধনায়....

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতেকালের পর তিনি ত্রিশ বৎসর রোযা রেখেছেন। ঈদের দিন ছাড়া তিনি রোযা ভাঙ্গেননি,কারণ এ দিন রোযা রাখা হারাম।...

জীবন তাঁর দীর্ঘ হল। এমনকি মৃত্যুর পথযাত্রী বৃদ্ধে পরিণত হলেন। কিন্তু তাঁর বার্ধক্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ চালিয়ে যাওয়া, আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা ও ধর্মের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে অন্তরায় সৃষ্টি করেনি।

তার একটি ঘটনা হল, হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.-এর খেলাফত কালে মুসলমানগণ সমুদ্রপথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করল।

তখন হযরত আবু ত্বলহা রাযি. মুসলিম বাহিনীর সাথে জিহাদে বের হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর ছেলেরা তখন তাঁকে বলল,হে আমাদের পিতা! আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি তো বয়োবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হযরত আবু বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.-এর সাথে আপনি জিহাদ করেছেন। সুতরাং কেন আপনি বিশ্রাম নিবেন না এবং আমাদেরকে আপনার তরফ থেকে জিহাদ করতে ছেড়ে দিবেন না।

হযরত আবু ত্বলহা রাযি. বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا - তোমরা যে আবস্থায় থাক আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেরিয়ে পর, হাল্কা অস্ত্র নিয়ে হোক বা ভারি অস্ত্র নিয়ে হোক।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে জিহাদে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যুবক-বৃদ্ধ সবাইকে, বয়স নির্ধারিত করে দেননি। তারপর তিনি তার প্রতিজ্ঞায় অবিচল রইলেন।

* * *

বয়োবৃদ্ধ হযরত আবু ত্বলহা রাযি. যখন সমুদ্রের মাঝে মুসলিম বাহিনীর সাথে জাহাজের পিঠে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হলেন। তারপর ইহলোক ত্যাগ করলেন।

মুসলমানগণ তাঁকে দাফন করার জন্য একটি দ্বীপ তালাশ করতে লাগল। সাত দিন পর তারা একটি দ্বীপ খুঁজে পেল। তখন হযরত আবু ত্বলহা রাযি. তাদের মাঝে চাদরাবৃত আবস্থায় রইলেন।তাঁর শরীরে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন।

সমুদ্রের মাঝে...

পরিজন আর স্বদেশ থেকে দূরে...

জনবসতি আর স্ত্রী-স্বজন থেকে দূরে...

হযরত আবু ত্বলহা রাযি. কে সমাধিস্থ করা হল...

মানুষ থেকে দূরে থাকলে তাঁর আর তেমন কি বা ক্ষতি হবে যদি তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী থাকেন।

* * *

হযরত সুরাকা ইবনে মালেক রাযি.

كَيْفَ بِكَ يَا سُرَاقَةُ إِذَا لَبِسْتَ

سِوَارَىْ كِسْرَىٰ؟...

—محمد رسول الله

ঐ মুহূর্তটি কেমন হবে সুরাকা, যখন তুমি দু'হাতে পরবে

কিস্‌রার (কঙ্কন) বালা?

—মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

হযরত সুরাকা ইবনে মালেক রাযি.

একদিন সকালে কুরায়শ গোত্রের লোকেরা ঘুম থেকে উঠলো ভীত-শঙ্কিত হয়ে। কারণ তাদের সভাগুলোয় ছড়িয়ে পড়েছিলো যে, রাতের অন্ধকারে মুহাম্মাদ মক্কা ত্যাগ করেছে; কিন্তু কুরায়শ দলপতিগণ এ খবর বিশ্বাস করলো না।

তারা বনূ হাশেমের প্রত্যেকটি বাড়ীতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজা শুরু করলো এবং তাঁর প্রিয় ছাহাবীদের ঘরে ঘরেও তাঁকে খুঁজে বেড়ালো...। কোথাও না পেয়ে যখন তারা আবু বকরের বাসগৃহে হাজির হলো তখন তাদের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো হযরত আবু বকর রাযি.-এর বড় মেয়ে আসমা। আবু জাহল তাকে শুধালো, এই মেয়ে তোর বাবা কোথায়?

সে বললো, জানি না তিনি এখন কোথায়। তখন সে হাত তুলে তার গালে এমন এক চড় কষালো যে, তার দুলজোড়া মাটিতে ছিটকে পড়লো।

*　　*　　*

কুরায়শ নেতারা যখন নিশ্চিত হলো মুহাম্মাদ মক্কায় নেই তখন তাদের দিশেহারা অবস্থা। তৎক্ষণাত তারা জড়ো করলো কাছে ধারে যত পদাঙ্কচারী ছিলো। যেন পায়ের ছাপ দেখে অন্তত নিরূপণ করা যায়, তারা কতদূর গিয়েছে।

সবাই এগিয়ে চললো। ছাওর পর্বত-গুহার কাছে আসতেই পদাঙ্কচারী দল বললো, আল্লাহর কসম, তোমাদের সঙ্গী এই গুহা অতিক্রম করে যায়নি।

এদের কথায় কোন ভুল ছিলো না। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ছাহাবী গুহার ভিতরেই ছিলেন। আর কুরায়শ অবস্থান করছিলো তাদের দু'জনের মাথা বরাবর উপরে এবং এতটাই কাছে যে, হযরত সিদ্দীক রাযি. গুহার ওপরে ওদের পায়ের নড়াচড়া দেখতে পেলেন আর তখনই চোখ দু'টো তার ভিজে উঠলো...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার তাকালেন তার দিকে– ভালোবাসা, মায়া ও তিরস্কার মেশানো দৃষ্টিতে।

হযরত সিদ্দীক রাযি. ফিসফিসিয়ে বললেন, কসম খোদার! আমি তো নিজের জন্য কাঁদছি না...

আপনার না কিছু হয়ে যায় শুধু এই ভয়ে ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না আবু বকর, আল্লাহ তো আছেন আমাদের সঙ্গে'। ফলে সিদ্দীকের অন্তরে আল্লাহ প্রশান্তি ঢেলে দিলেন। তিনি তাকিয়ে থাকলেন ওদের পায়ের দিকে। তারপর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে লক্ষ করে তাহলেই দেখে ফেলবে আমাদের।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'ঐ দু'জন সম্পর্কে তোমার কী ধারণা আবুবকর, যাদের তৃতীয়জন স্বয়ং আল্লাহ?' এমন সময় তারা শুনতে পেলেন, এক কুরায়শী যুবক সবাইকে বলছে, চলো আমরা গুহার ভিতরে গিয়ে দেখি।

উমাইয়া ইবনে খালাফ তাকে পরিহাস করে বললো, গুহার মুখে এই যে মাকড়সাটি বাসা বেঁধেছে তা কি দেখছো?!! আল্লাহর কসম, এ তো মুহাম্মাদের জন্মেরও বহু আগের

আবু জাহল অবশ্য বললো, লাত-উয্যার কসম, আমার তো ধারণা, সে আমাদের খুব কাছেই রয়েছে। আমরা যা বলছি তা সবই শুনছে এবং যা করছি সব দেখছে। কিন্তু তার যাদু আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

* * *

এরপরও কুরায়শ গোত্রের লোকেরা হাল ছেড়ে দিলো না। মুহাম্মাদকে ধরার বিষয়ে তাদের সংকল্প রইলো আগের মতোই অটুট। সুতরাং মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী দীর্ঘপথের দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা গোত্রগুলোর মাঝে তারা এলান করে দিলো: যে ব্যক্তি মুহাম্মাদকে জীবিত বা মৃত এনে দিতে পারবে সে লাভ করবে একশটি দামী উট।

* * *

সুরাকা ইবনে মালেক, মাদলাজ বংশীয়। মক্কার অদূরে কুদায়দ নামক স্থানে সে তখন নিজ গোত্রের একটি সভায় আলাপরত। এসময় জনৈক কুরায়শী দূতের আবির্ভাব হলো। সে এসেই কুরায়শ ঘোষিত মহাপুরস্কারের খবরটি জোরেশোরে শুনিয়ে দিলো–'যে মুহাম্মাদকে ধরে দেবে জীবিত বা মৃত তার জন্য একশ' উট'।

এ খবর শুনতেই সুরাকার ভিতরে অজস্র লোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সে দারুণ লোভী হয়ে পড়লো। একশত উটের হাতছানি সে কিছুতেই ভুলতে পারলো না। তবে সে নিজেকে সামলে নিলো। মুখে একটি কথাও বললো না। যাতে না আবার সে অন্যদের লোভ উসকে দেয়।

সুরাকা মজলিস থেকে উঠতে যাবে তখনই তার গোত্রের এক লোক এসে সভাগৃহে ঢুকলো। সে সংবাদ দিলো, এইমাত্র সে তিনটা লোককে তার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছে এবং সে নিশ্চিত যে, এরা মুহাম্মাদ, আবু বকর ও তাদের রাহ্বর। সুরাকা বললো, না এরা বরং অমুক গোত্রের লোকজন। ওদের উট হারিয়েছে। তার খোঁজেই ওরা বেরিয়েছে।

আগন্তুক বললো, তাই হবে হয়ত। এই বলে চুপ রইলো। আর কিছু বললো না।

সুরাকা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। তাকে উঠতে দেখে কেউ না আবার টের পেয়ে যায়...

লোকজন অন্য আলোচনায় মশগুল হতেই সে কেটে পড়লো এবং একদম আওয়াজ না করে ক্ষিপ্রতার সাথে বাড়ীতে চলে এলো। দাসীকে চুপিচুপি বলে রাখলো– সকলের চোখ বাঁচিয়ে তার ঘোড়াটিকে 'বাতনুল ওয়াদি' তে নিয়ে বেঁধে রাখতে। আর গোলামকে নির্দেশ দিলো, তার অস্ত্রটি প্রস্তুত করে বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে খুব সাবধানে বেরিয়ে যেতে, যেন কেউ না দেখে... তারপর ঘোড়ার কাছাকাছি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এরপর সে এসে ...

* * *

সুরাকা বর্ম পরে নিলো। অস্ত্রসজ্জিত হলো এবং ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুতবেগে ছুটলো। যাতে অন্য কেউ নাগাল পাওয়ার আগেই সে মুহাম্মাদকে ধরতে সক্ষম হয় আর জিতে নেয় স্বপ্নের পুরস্কার।

* * *

অশ্ব-চালনায় সুরাকা ছিলো পাকা পালোয়ান। এ জন্য তার যথেষ্ট সুনাম ছিলো নিজ গোত্রের মাঝে। লম্বা গড়ন। বড় মাথা। চওড়া বুকের ছাতি দূরদর্শী বিচক্ষণ। পিছু ধাওয়ায় ওস্তাদ। তার ওপর সে ধৈর্যশীল। একটানা চলায় তার ক্লান্তি নেই। এ ছাড়াও সে ছিলো প্রতিভাবান কবি। দারুণ মেধাবী... আর তার ঘোড়াটিও ছিলো উন্নত জাতের।

* * *

সুরাকা মাটি কাঁপিয়ে পথ মাড়াচ্ছিলো, কিন্তু সে কিছুদূর যেতেই তার ঘোড়া তাকে সমেত আছাড় খেলো এবং সে পিঠ থেকে ছিটকে পড়লো। একে কুলক্ষণ ভেবে বিরক্ত সুরে বলে উঠলো, ধ্বংস তোর, একী উল্লুকে কাণ্ড?! এই বলে সে ফের পিঠে চাপলো। তবে খানিকটা অগ্রসর হতেই আবার সে হোঁচট খেলো। সেও উল্টে পড়লো। এবার সে আরো বেশি পেরেশান হলো, এবং যাত্রা শুভ নয় ভেবে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো। কিন্তু 'একশত উট'-এর লোভ তাকে ফিরতে দিলো না।

* * *

যেখানে এসে সুরাকার ঘোড়া আছাড় খেয়েছিলো তার থেকে সামান্য আগে বাড়তেই সে মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীদ্বয়কে দেখতে পেলো। তৎক্ষণাত সে ধনুকের দিকে হাত বাড়ালো। কিন্তু তার হাতটি ঐখানেই স্থির হয়ে রইলো

তার কারণ, সে লক্ষ করেছে যে, ঘোড়ার পাগুলো আস্তে আস্তে মাটিতে গেড়ে যাচ্ছে। আর তার সামনে দিয়ে সমানে ধুলা উড়ছে। যা ক্রমশ তার ও তার ঘোড়ার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে...। এবার সে সজোরে ঘোড়া হাঁকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ততক্ষণে ঘোড়াটি সম্পূর্ণরূপে মাটিতে দেবে গেছে, যেন লোহার পেড়েক ঠুকে তাকে মাটির সঙ্গে আটকে রাখা হয়েছে।

অনন্যোপায় সুরাকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর ছাহাবীর দিকে ফিরে কাতর স্বরে বললো, এই যে! তোমরা একটু আমার জন্য তোমাদের রবের কাছে প্রার্থনা করো, যেন আমার ঘোড়াটা মুক্তি পায়...

আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের খবর গোপন রাখবো। তোমাদের পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে না পারে সে জন্য যা করার সব করবো...

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন এবং আল্লাহর হুকুমে তার ঘোড়া ঐ বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেলো। পা গুলো আবার সচল হলো... কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বদলে গেলো। তার দুষ্ট লোভ আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো। সুতরাং পুনরায় সে তাদের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটালো এবং সেই একই রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হলো। এবার ঘোড়ার পাগুলো আগের চেয়েও বেশি পরিমাণে নীচে চলে গেলো। সুরাকা যথারীতি সাহায্য প্রার্থনা করলো এবং যারপর নাই অনুনয়ের সাথে বললো, আমার পাথেয়, রসদ আর হাতিয়ার আর সব তোমাদের দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো নাও তবু আমাকে বাঁচাও। এইবারে পাকা কথা দিচ্ছি, আল্লাহ সাক্ষী : তোমাদের পথ আমি আগলে রাখবো, কাউকেই তোমাদের নাগাল পেতে দেবো না...

জবাবে নবীজী ও তার ছাহাবী বললেন, তোমার পাথেয় বা রসদ আমাদের দরকার নেই তুমি শুধু লোকদেরকে ফেরাও ...

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দোয়া করলেন। ফলে তার ঘোড়াটি চলতে আরম্ভ করলো। সদ্যমুক্ত সুরাকা ফিরে যাবার মুহূর্তে কী যেন কী ভেবে কাফেলাকে চিৎকার করে থামতে বললো আর কসম খেয়ে বললো, সে তাদের কোন ক্ষতি করবে না, শুধু একটি কথা। তারা ফিরে তাকালেন, বললেন : আবার কী দরকার?

সে বললো, আল্লাহর কসম, হে মুহাম্মদ! আমি নিশ্চয়ই জানি, অচিরেই তোমার দ্বীন বিজয় লাভ করবে এবং তোমার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তুমি আমার সাথে অঙ্গীকার করো, তোমার রাজ্যে গেলে তুমি আমাকে সম্মান করবে এবং এ বিষয়ে লিখিত দাও...

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর সিদ্দীককে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মোতাবেক তিনি একটি হাড্ডির গায়ে ঐ কথা লিখে হস্তান্তর করলেন।

যখন সে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করলো; মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন,

'ঐ মুহূর্তটি কেমন হবে সুরাকা, যখন তুমি দু'হাতে পরবে কিস্‌রার বালা?!'

সুরাকা পেরেশান হয়ে বললো, কিস্‌রা ইবনে হুরমুয? (পারস্য সম্রাট)। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ, কিস্‌রা ইবনে হুরমুয'।

সুরাকা ফিরে এলো। যে পথ দিয়ে রওয়ানা হয়েছিলো ঐ পথেই সে ফিরলো। এসে দেখে, মানুষজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তালাশে বের হচ্ছে। তখন সে তাদের উদ্দেশে বললো, তোমরা ফিরে যাও। সমস্ত জায়গায় আমি তাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি... আর পায়ের ছাপ দেখে চিনতে আমি কতটা সক্ষম তা তোমরা ভালোই জানো।

অতএব তারা আর বের হলো না।

এদিকে মুহাম্মাদ ও তাঁর ছাহাবীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া তার ঘটনাটির কথা সে সম্পূর্ণ চেপে গেলো– যতক্ষণ না সে নিশ্চিত হলো যে, তারা মদীনায় পৌঁছে গেছেন এবং কুরায়শের শত্রুতা থেকে নিরাপদ একটি ঠিকানায় সকাল যাপন করেছেন। এটা নিশ্চিত হওয়ার পরই সে তার কাহিনীটি প্রচার করে দিলো...। আবু জাহল যখন সুরাকার ঐ সংবাদ ও নবী আলাইহিস্‌ সালাতু ওয়াস্‌ সালামের সঙ্গে তার আচরণের কথা জানতে পারলো তখন সে তাকে তার ব্যর্থতা, ভীরুতা ও সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য তিরস্কার করলো...। সুরাকা তার ভর্ৎসনার জবাবে বললো, আবুল হাকাম! খোদার কসম, তুমি যদি আমার ঘোড়ার অবস্থা দেখতে যখন তার পাগুলো দেবে গেলো,তাহলে বুঝতে এবং সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করতে যে, মুহাম্মাদ সত্য রাসূল। ঐশী প্রমাণ রয়েছে যার সঙ্গে। সুতরাং কে আছে তার সাথে পেরে ওঠে?

* * *

সময় এগিয়ে চললো তার পথে। রাতের অন্ধকারে একদিন যে মুহাম্মাদ মক্কা ছেড়ে গিয়েছিলেন ভীষণ অবহেলিত উপেক্ষিত হয়ে; সে-ই আবার এসেছেন এখানে বিজয়ী নেতার বেশে। চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে শত সহস্র বর্শা আর তলোয়ারে সজ্জিত মুজাহিদ বাহিনী...

আর কী! যে কুরায়শ দলপতিগণ এতদিন সদম্ভে আর দুঃসহ দাপটে পৃথিবী দাপিয়ে বেড়িয়েছে তারাই আজ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে নত শীরে। দৃষ্টি তাদের অবনত। ভয়ে অন্তরআত্মা কম্পিত, কণ্ঠে ঝরে পড়ছে বিনয়। তারা আজ তার দয়াপ্রার্থী– 'আমাদের সঙ্গে কী আচরণ করবে মুহাম্মাদ!'

উত্তরে তারা যা শুনতে পেলো তা হচ্ছে আম্বিয়া কেরামের দয়া আর মহানুভবতার ভাষা, সর্বকালের চিরপরিচিত সেই ভাষা। 'যাও আজকে তোমরা মুক্ত...'

এই সময় সুরাকা তার সওয়ারি প্রস্তুত করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেয়ার জন্য অগ্রসর হলো। আর তার সঙ্গে রয়েছে দশ বছর আগে লিখে দেওয়া ঐ চুক্তিপত্র।

সুরাকা বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি তখন জি'রানায় (এটি মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গা, মক্কা থেকে অপেক্ষাকৃত কাছে)। আমি আনসারীদের একটি দলে ঢুকে পড়লাম। তারা আমাকে বর্শার পিছন দিয়ে মারতে আরম্ভ করলো, আর বললো : এই! যাও যাও, কী চাও?!!

ওর মধ্যেই আমি কাতার ভেঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলাম। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে চলে এলাম। তিনি উটের ওপরে বসা। আমি ঐ পত্রটি উঁচুতে তুলে ধরে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সুরাকা ইবনে মালেক... আর এই যে আপনার দেয়া সেই পত্র...

তখন রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, কাছে এসো সুরাকা, আমার কাছে এসো। আজ সদাচার ও ওয়াদা রক্ষার দিন।

তখন আমি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার ইসলামের ঘোষণা দিলাম এবং তার অসংখ্য অগণিত কল্যাণ আর সদাচরণ লাভ করলাম।

* * *

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুরাকার সাক্ষাতের কয়েক মাস না যেতেই আল্লাহ তার নবীকে আপন সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। এতে সুরাকা ভীষণ মর্মাহত হলেন। অনেক বেশি দুঃখ পেলেন। দু'চোখে তার কেবলই ভেসে উঠলো ঐ দিনটির ছবি, যেদিন একশ উটের জন্য তিনি নবীকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলেন। আর আজ! দুনিয়ার তাবৎ উষ্ট্রী মিলেও তার সামনে নবীজীর একটুকরো নখের সমান হতে পারছে না। তার মনে পড়ে গেলো তাকে বলা নবীজীর ঐ কথাটি–

'সেই মুহূর্তটি কেমন হবে সুরাকা যখন তুমি দু'হাতে পরবে কিসরার বালা?'

দ্বিধাহীন উচ্চারণে কথাগুলো তিনি আওড়ে গেলেন আর শীঘ্রই যে ঐ বালাজোড়া তিনি পড়ছেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহও রইলো না তার মনে।

* * *

সময় আরো অগ্রসর হলো। কালের চাকা আবর্তিত হলো আরো একবার। মুসলমানদের শাসনভার এলো হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর হাতে। তিনি খলীফার পদে আসীন হলেন। তার কল্যাণযুগে মুসলিম সেনাদল আক্রমণ করলো পারসিক সাম্রাজ্যের উপর প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে, তুমুল ঝঞ্ঝা বায়ুর মত। একের পর এক বাহিনী পরাস্ত হলো তাদের কাছে। তাদের হাতে পতন হলো বহু শত্রুশহর আর দুর্গের। পদানত হলো সিংহাসন। হাতে এলো গণীমতের অঢেল সম্পদ। এভাবে আল্লাহর হুকুমে গোটা পারস্য সাম্রাজ্য তাদের করতলগত হলো ...

হযরত উমর রাযি. এর খেলাফতের শেষ দিনগুলোতে একদিন মদীনায় এলো সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের দূতদল। খলীফাতুল মুসলিমীনকে তারা শোনালো বিজয়ের খোশ খবর। মুসলমানদের বায়তুল মালে তারা জমা দিলো আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদীনের অর্জিত গণীমতের এক পঞ্চমাংশ সম্পদ।

হযরত উমরের সামনে যখন ঐ গণীমত আনা হলো তিনি হতবাক হয়ে

গেলেন। কিস্‌রার মুক্তাখচিত মুকুট, সোনার জরিদার কাপড়, হীরক সজ্জিত মালা, তার ব্যবহৃত দুর্লভ নয়নমোহন বালা জোড়া সবই ছিলো এতে। ছিলো মহামূল্যবান এমনই অসংখ্য প্রসাধনী, সাজবস্তু ও তৈজস

হযরত উমর রাযি. তার হাতের একটি কাঁচা ডাল দিয়ে এই অমূল্য রত্ন নেড়ে-চেড়ে দেখলেন... মানুষ এমন বিলাসী হতে পারে?!

তারপর তার চারপাশে যারা ছিলো তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যারা এগুলো জমা দিয়ে গেলো ওরা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই বিশ্বস্ত...

একথা শুনে হযরত আলী ইবনে আবি তালিব রাযি. বললেন– তিনিও সেখানে ছিলেন– আপনি সৎ, তাই আপনার প্রজারাও সৎ হতে পেরেছে হে আমীরুল মুমিনীন!... যদি আপনি আমুদে হতেন তবে তারাও গা ভাসিয়ে দিতো।

ইতিমধ্যে হযরত উমর ফারুক রাযি. সুরাকা ইবনে মালেককে ডেকে উপস্থিত করলেন এবং তাকে সম্রাট কিস্‌রার জামা-পা জামা, আবা কাবা ও মোজা জোড়া পরিয়ে দিলেন। কোমরে বেঁধে দিলেন কটিবন্ধ ও তলোয়ার, মাথায় মুকুট... হাতে এক জোড়া বালা... হ্যাঁ সেই বালা জোড়া... সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা চিৎকার করে বলে উঠলো আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ...

তারপর হযরত উমর রাযি. সুরাকার দিকে ফিরে বললেন, বাহ্ বাহ্, বনু মাদলাজের এক সামান্য বদ্দুর মাথায় কিস্‌রার মুকুট আর তার হাতে কিস্‌রার চুড়ি!!

এরপর তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি এই সম্পদ তোমার রাসূলকে দাওনি অথচ তিনি ছিলেন তোমার কাছে আমার চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় ও সম্মানিত...

আবু বকরকেও দাওনি তিনিও ছিলেন তোমার কাছে আমার চাইতে প্রিয় ও সম্মানিত...

আর এই আমাকে দিলে, তো আশ্রয় চাহি তোমার, তোমার এই দান যেন আমার প্রতি শাস্তিস্বরূপ না হয়...

এরপর ঐ মজলিসেই সমস্ত মাল মুসলমানদের মাঝে তাকসীম করে দিলেন।

হযরত ফায়রুয আদ্‌দায়লামী রাযি.

فَيْرُوْزُ رَجُلٌ مُبَارَكٌ

مِنْ اَهْلِ بَيْتٍ مُبَارَكِيْنَ

– محمد رسول الله

ফায়রুয কল্যাণীয়

এক কল্যাণময় পরিবারের লোক

–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ

হযরত ফায়রুয আদ্‌দায়লামী রাযি.

বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তার অসুখের খবর ছড়িয়ে পড়লো জাযীরাতুল আরবের সব জায়গায় তখন কিছু লোক ইসলাম ছেড়ে মুরতাদ হয়ে গেলো। এদের মধ্যে ইয়ামানের আসওয়াদ আনাসি, ইয়ামামার মুসায়লামা কাযযাব ও বনু আসাদের এলাকায় তুলায়হা আলআসাদি ছিলো প্রধান।

এই তিন মিথ্যুক দাবী করে বসলো যে,তারা নবী। প্রত্যেকেই তারা নিজ নিজ কওমের কাছে প্রেরিত হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ প্রেরিত হয়েছেন কুরায়শ-এর কাছে

* * *

আসওয়াদ আনাসি ছিলো গণক, যাদুকর। কালো মনের, ব্যাপক অনাচারী। বলিষ্ঠদেহের, বিরাটকায়। সেই সাথে সুবক্তা ও বিশুদ্ধ ভাষী। কথার যাদুতে সে মানুষকে সম্মোহিত করে ফেলতো। জ্ঞানীদেরও মাথা ঘুরে যেতো। সুধী সাধারণ সকলকে আকৃষ্ট করার এক অসাধারণ শক্তি ছিলো তার। তাছাড়া সে ছিলো অত্যন্ত চতুর ও ঝানু লোক। কাকে কীভাবে হাতে রাখতে হয় সে কৌশল তার ভালোই রপ্ত ছিলো। আম লোকদের হাতে রাখার জন্য তো ভোজবাজি ছাড়া বেশি কিছু দরকার হতো না। কিন্তু শিক্ষিত ও সচেতন শ্রেণীকে হাত করার জন্য কাউকে অর্থের লোভ দেখাতো, কাউকে প্রভাব-প্রতিপত্তির আর কাউকে পদের মোহনীয় হাতছানি...

মানুষের সামনে সে আসতো রুমালে মুখ ঢেকে। উদ্দেশ্য, নিজেকে একটা আলাদা গাম্ভীর্য ও রহস্যময়তায় আবৃত রাখা।

* * *

সে সময় ইয়ামানের ক্ষমতা ছিলো আবনাদের হাতে। আর এদের দলপতি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ফায়রুয আদ্‌দায়লামি।

আবনা হচ্ছে একটি নাম যা ব্যবহার করা হতো এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাদের বাবা পারস্যের আর মা আরবের। এদের পূর্বপুরুষ স্বদেশ ত্যাগ করে ইয়ামানে চলে এসেছিলো।

ইসলামের অভ্যুদয়কালে এদের নেতা বাযান ছিলো পারস্য সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ামানের রাজা। এরপর যখন সে জানতে পারলো যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য নবী এবং তাঁর দাওয়াত অতি মহৎ ও দামী, তখন সে কিসরার অধীনতা পরিত্যাগ করে সদলবলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলো। ফলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রাজত্ব বহাল রাখলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে এই পদে সমাসীন ছিলো, আসওয়াদ আনাসির নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী প্রকাশের কিছুকাল আগে সে মৃত্যুবরণ করে।

* * *

আসওয়াদ আনাসির ডাকে প্রথম সাড়া দেয় তার স্বজাতি বনু মাযহিজ। সে তাদেরকে নিয়ে প্রথমে ইয়ামানের রাজধানী সান'আ আক্রমণ করে এবং সেখানকার গর্ভণর শাহ্র ইবনে বাযানকে হত্যা করে ও আযাদ নাম্নী তার এক পত্নীকে বিয়ে করে। তারপর সান'আ থেকে অন্যান্য অঞ্চলের উপর হামলা চালায়। তার আক্রমণের শিকার হয়ে ঐসব অঞ্চল অসম্ভব দ্রুততার সাথে পদানত হয়। এক পর্যায়ে হাযারামওত থেকে তায়েফ পর্যন্ত সমুদয় অঞ্চল এবং বাহরাইন ও আহসা থেকে নিয়ে আদান পর্যন্ত বিশাল এলাকা তার করতলগত হয়।

* * *

মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ও তাদেরকে তার প্রতি আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে যে জিনিসটি তাকে সাহায্য করেছিলো তা হচ্ছে তার সীমাহীন বুদ্ধি ও ধূর্ততা। সে তার অনুসারীদের কাছে দাবী করেছিলো যে, তার একজন ফেরেশতা আছে যে তার উপর ওহী নাযিল করে এবং তাকে গায়েবের সংবাদ দেয়...

সে তার এই দাবীকে জোরদার করার জন্য সমস্ত জায়গায় গুপ্তচর ছড়িয়ে রেখেছিলো। যারা মানুষের খবরাখবর ও গোপন তথ্য জেনে এসে তাকে জানাতো। তাদের সমস্যা- সংকট ও তাদের একান্ত ইচ্ছা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথাও সে এদের মাধ্যমে উদ্ধার করতো। পরে যখন লোকজন

তার কাছে আসতো তখন যার যা প্রয়োজন সাক্ষাৎ হওয়ামাত্র তাকে সেটা বলে ফেলতো এবং যার যা সমস্যা সেটা দিয়ে তার সঙ্গে কথা আরম্ভ করতো। সে তার অনুসারীদের এমন সব অদ্ভূত আর আশ্চর্য কারবার দেখাতো, যা তাদের মাথা গুলিয়ে দিতো, তারা একেবারে হতবাক হয়ে যেতো...

এভাবে তার তৎপরতা ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠলো এবং শুকনো তুষের মাঝে জ্বলন্ত আগুনের মতোই তার দাওয়াত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

* * *

আসওয়াদ আনাসি মুরতাদ হয়ে গেছে এবং ইয়ামান তার দ্বারা আক্রান্ত-এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছলে তিনি কালবিলম্ব না করে প্রায় দশজন সাহাবীর একটি জামাত প্রেরণ করলেন ইয়ামানের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে কিছু পত্র লিখে দিলেন তাদের বরাবরে, যাদের সম্বন্ধে তখনো কল্যাণের আশা ছিলো, ইয়ামানে যারা ছিলো মুসলমানদের অগ্রজ। এই পত্রে তিনি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে এই সর্বগ্রাসী ফিতনার বিরুদ্ধে লড়ে যেতে। তিনি তাদেরকে আদেশ করলেন, যে করেই হোক আসওয়াদ আনাসির কবল থেকে ইয়ামানবাসীকে মুক্ত করতে হবে...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বার্তা যার কাছেই পৌঁছলো সেই সাড়া দিলো তাঁর ডাকে এবং জানপ্রাণ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তার আদেশ বাস্তবায়নে আর তার আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দানকারী ব্যক্তি ছিলেন আমাদের গল্পের নায়ক ফায়রুয আদ্‌দায়লামি ও তার সহকারী 'আবনাগণ। এবার আমরা তার মুখেই শুনি তার সেই বিরল বিস্ময়কর অভিযানের কাহিনী... ফায়রুয বলেন, আমি ও আমার সঙ্গে যে সব আবনা ছিলো আমরা এক মুহূর্তের জন্যেও আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে সন্দিহান হইনি এবং আমাদের কারো মনেই আল্লাহর দুশমনের প্রতি এতটুকু বিশ্বাস জন্মায়নি। আমরা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম। অব্যর্থ আক্রমণে তাকে বিপর্যস্ত করে তার থেকে চিরতরে নিস্তার পাবার উপায় সন্ধান করছিলাম। এরপর যখন আমাদের কাছে ও অগ্রগামী মু'মিনদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐ পত্র এলো তখন আমরা

একে অন্যের দ্বারা শক্তিশালী হলাম এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ তৎপরতায় সক্রিয় হয়ে উঠলাম।

* * *

একের পর এক সাফল্যের কারণে আসওয়াদ আনাসির মাঝে অতিমাত্রায় অহংকার ও আত্মতুষ্টি এসে গিয়েছিলো। ফলে সে দারুণ স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়লো এবং তার সেনাপতি কায়স বিন আবদে ইয়াগুছের সাথেও উদ্ধত আচরণ শুরু করলো। তার এই যাচ্ছেতাই ব্যবহারে কায়েস একই সাথে ক্ষুব্ধ ও নিজের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়লো।

এই সুযোগে আমি ও আমার চাচাত ভাই দাযাওয়াই তার কাছে গিয়ে তাকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্রটি দিলাম। আর বললাম, ঐ লোক তোমাকে গিলে খাবার আগেই তাকে নিজের গ্রাসে পরিণত করো... আমাদের এ দাওয়াত তার মনে ধরলো এবং সে আমাদেরকে তার যাবতীয় তথ্য জানিয়ে দিলো। তার ধারণা হলো, আমরা বুঝি আকাশ থেকে নেমে এসেছি তাকে বাঁচাবার জন্য! এবার আমরা তিনজন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম– নরাধম আসওয়াদকে মোকাবেলায় আমরা ভিতরে ভিতরে কাজ করবো, আর আমাদের অন্যসঙ্গীরা তাকে বাইরে থেকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকবে।

আমরা স্থির করলাম, আমার চাচাতো বোন 'আযাদকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে নেবো। যাকে আসওয়াদ আনাসি বিয়ে করেছে তার স্বামী শাহ্‌র বিন বাযানকে হত্যা করার পর।

* * *

আমি আসওয়াদ আনাসির প্রাসাদে গেলাম এবং আমার চাচাতো বোন আযাদের সাথে দেখা করে তাকে বললাম বোন তুমি তো জানো, এই লোক তোমার ও আমাদের কী ক্ষতি করেছে, কেমন সর্বনাশা পরিস্থিতি সে সৃষ্টি করেছে।

সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছে, তোমার গোত্রের নারীদের লাঞ্ছিতা করেছে, নির্বিচারে বহু লোক মেরেছ, তাদের ক্ষমতা আর কর্তৃত্বও সে ছিনিয়ে নিয়েছে; এই দেখো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি, যা তিনি বিশেষভাবে আমাদের প্রতি ও সাধারণভাবে সমগ্র ইয়ামানবাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন। এতে তিনি আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন এই ফিতনার অবসান ঘটানোর...

এখন বলো, তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে পারবে?

আযাদ বললো, আমি তোমাদের কী সাহায্য করতে পারি?

–তাকে দেশছাড়া করতে হবে...

–না, বরং তাকে আমরা মেরে ফেলবো ...

আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমার ইচ্ছাও তাই। কিন্তু আমি ভয় করছি তোমাকে নিয়ে। তোমাকে না তার মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেই।

সে বললো, কসম ঐ সত্তার যিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন সত্যসহ; সুসংবাদদাতা ও সর্তককারী রূপে আমি এক নিমিষের তরেও আমার দ্বীন সম্পর্কে সন্দিহান হইনি। আর আমার কাছে এই শয়তানের চেয়ে অধিক ঘৃণিত কেউ এই পৃথিবীর বুকে নেই। খোদার কসম, তাকে দেখার পর থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত তাকে কেবল দুশ্চরিত্র, আর পাপাচারী বলেই জানি। ন্যায়-অন্যায়ের সে তোয়াক্কা করে না। আর কোন গর্হিত কাজই তার বাদ যায় না।

তার কথা শেষ হলে আমি বললাম, কিন্তু আমরা তাকে হত্যা করবো কীভাবে? তখন সে বললো, শোন, সে অত্যন্ত সজাগ সর্তক লোক। প্রাসাদে এমন কোন জায়গা নেই, যেখানে প্রহরীরা তাকে ঘিরে না আছে। শুধু একেবারে শেষের এই পরিত্যক্ত কামরাটি ছাড়া। কারণ এর পিছন দিকটা জঙ্গল। তো যখন সন্ধ্যা হবে তখন অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তোমরা এর দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকবে। অস্ত্র, লণ্ঠন (বাতি) আর যা যা প্রয়োজন সব ওখানেই পাবে। আমিও থাকবো তোমাদের অপেক্ষায়। এরপর সকলে মিলে একযোগে হামলা করে ঐ হতচ্ছাড়াকে শেষ করে দেবে...

আমি বললাম, কিন্তু এরকম প্রাসাদে কোন কামরার দেয়াল কাটা সহজ ব্যাপার না...

কারণ কখনো আমাদের পাশ দিয়ে কেউ যেতে পারে। তখন সে চিৎকার করে লোক জড়ো করে ফেলবে, প্রহরীরা টের পেয়ে যাবে... আর তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ। সে বললো, তুমি ভুল বলোনি, তবে আমি তোমাদেরকে আরেকটি উপায় বলতে পারি।

আমি বললাম, সেটা কী?

সে বললো, আগামীকাল তুমি শ্রমিক বেশে একজন লোক পাঠাবে, যে

তোমাদের কাছে বিশ্বস্ত। আমি তাকে ভিতর থেকে দেয়াল খোদাই করতে বলবো। যখন আর সামান্য বাকী থাকবে তখন সে রেখে দেবে। এরপর রাতে তোমরা এসে বাহির থেকে সহজেই বাকীটুকু শেষ করতে পারবে।

আমি বললাম, দারুণ!

এবার আমি ফিরে এসে আমার অপর সঙ্গীদ্বয়কে আমাদের পরিকল্পনার বিস্তারিত জানালাম। ওরাও একে কল্যাণকর বললো, ফলে তক্ষুণি আমরা চলে গেলাম যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে।

এরপর আমরা আমাদের সহযোগী বিশেষ মুমিনদেরকে এই গোপন তথ্য জানিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলাম। আমরা তাদের সঙ্গে মিলিত হবার সময় নির্ধারণ করলাম পরদিন ফজর।

যখন রাত্রি নামলো এবং নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে এলো তখন আমি ও আমার সঙ্গীরা গিয়ে সেই কক্ষের পিছনে অবস্থান নিলাম এবং খোদাইকৃত অংশে সর্বশেষ আঘাত হেনে সবটুকু জায়গা ভেঙ্গে ফেললাম। এবার কামরার ভিতরে ঢুকে প্রথমে বাতি জ্বাললাম,তারপর অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আল্লাহর দুশমনের খাস মহলের দিকে অগ্রসর হলাম। দরজার কাছে আসতেই দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে আমার চাচাতো বোন। তার ইশারা পেয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। আর কী! দেখি ব্যাটা ঘুমাচ্ছে নাক ডাকিয়ে। দেরি না করে ওর কাঁধ বরাবর দিলাম এক কোপ বসিয়ে। আর সে ষাঁড়ের মতো বিকট চিৎকার করে উঠলো এবং জবাই করা উটের মতো হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

এদিকে তার চিৎকার শুনে প্রহরীরা সব ছুটে এলো কী হয়েছে, কী হলো?!...

আমার বুদ্ধিমতি বোন এককথায় ওদের বিদায় করে দিলোঃ 'কিছু না, আল্লাহর নবীর উপর ওহী আসছে ... তোমরা নিশ্চিন্তে ফিরে যাও...' এবং তারা ফিরে গেলো।

* * *

ভোর হওয়া পর্যন্ত আমরা প্রাসাদের মধ্যেই থাকলাম। ভোরের আলো

ফুটতেই আমি একটি প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলে উঠলাম, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার– দুশমন খতম!

আমি রীতিমতো আযান দেয়া শুরু করলামঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্নাল আসওয়াদ আল আনাসি কায্যাব। অর্থাৎ– এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আসওয়াদ আনাসি মিথ্যুক...

পুরো ব্যাপারটাই হয়েছিলো গোপনে। এ ঘটনার পর চারদিক থেকে মুসলমানরা এসে প্রাসাদের কাছে জড়ো হলো। ওদিকে প্রহরীর দল আমার আযান শুনে শঙ্কিত হয়ে ছুটতে শুরু করলো এবং দুই দল পরস্পর মুখোমুখী হয়ে গেলো। এ পর্যায়ে আমি প্রাসাদের প্রাচীরের উপর থেকে জনতার উদ্দেশে আসওয়াদের কাটা মাথা নিক্ষেপ করলাম। এই না দেখে তার সেপাই সামন্তরা সব হীনবল হয়ে পড়লো এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিমিষে ধূলিসাৎ হলো। আর মুমিনরা এ দৃশ্য দেখামাত্র মুর্হুমুহু তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস, কাঁপিয়ে তুললো। প্রচণ্ড আক্রমণে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর শবদেহের উপর এবং সূর্যোদয়ের আগেই কাহিনীর যবনিকাপাত হলো।

* * *

বেলা ওঠার পর আমি শত্রুনিপাতের সুসংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চিঠি লিখলাম। কিন্তু পত্রবাহকেরা মদীনায় পৌঁছার পর জানতে পারলো, নবীজী গত রাতে ইহধাম ত্যাগ করেছেন। তবে অল্পকিছুক্ষণ পরেই তারা শুনতে পেলো যে, ওহীর মাধ্যমে নবীজী আসওয়াদ আনাসির কতলের খবর পেয়েছেন– ঠিক যে রাতে সে নিহত হয়েছে সেই রাতেই...

এবং মহানবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্সালাম তখন তাঁর সাহাবীদের উদ্দেশে বলেছেন ঃ "কাল রাতে আসওয়াদ আনাসি কতল হয়েছে। তাকে হত্যা করেছে এক বরকতী পরিবারের এক বরকতময় লোক। কেউ প্রশ্ন করলো। সে ব্যক্তি কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, "ফায়রুয..., সফল হোক ফায়রুয..."।

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স আল-আনসারী রাযি.

مَا أُجِيْزَتْ وَصِيَّةُ امْرِئٍ أَوْصَى بِهَا
بَعْدَ مَوْتِهِ سِوَى وَصِيَّةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ

মৃত্যুর পরে কৃত কারো অসীয়ত
বাস্তবায়িত হয়নি, ছাবিত ইবনে
কায়সের অসীয়ত ছাড়া।

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স আল-আনসারী রাযি.

খাযরাজ[১] গোত্রের সুপরিচিত এক নেতা ও ইয়াছরিবের শীর্ষস্থানীয়দের একজন। পরিচ্ছন্ন মনের অধীকারী। ধীমান, সপ্রতিভ। দরাজ কণ্ঠের ব্যক্তিত্ব। যখন কথা বলেন সবাইকে ছাড়িয়ে যান। আর যখন বক্তৃতা করেন শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলেন।

ইয়াছরিবে যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তিনি তাদের অন্যতম। তার ইসলাম গ্রহণ এভাবে হয়েছিলো যে, মক্কার তরুণ ইসলাম প্রচারক মুস‘আব বিন উমায়র রাযি. যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তিনি কান পেতে শুনতেন– তার বেদনাভরা কণ্ঠের সুললিত উচ্চারণ। কুরআনের সুর ঝংকার তার কর্ণকুহরে পৌঁছতেই তিনি বিমোহিত হয়ে যেতেন। কুরআনের ভাষা ও তার সৌন্দর্য তার হৃদয়কে দারুণ স্পর্শ করতো এবং তার অন্তর্নিহিত শিক্ষা ও বিধানাবলী তার চিন্তাকে প্রচণ্ড রকম নাড়া দিতো। ফলে আল্লাহ তার মনকে প্রসন্ন করে দিলেন ঈমানের জন্য এবং তার মর্যাদা বুলন্দ করলেন ও তার আলোচনাকে সমুন্নত করলেন নবীয়ে ইসলামের পতাকাতলে তাকে ঠাঁই দিয়ে।

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আগমন করেন তখন ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. তার কওমের অশ্বারোহী দলের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে তাকে প্রীতিপূর্ণ অভ্যর্থনা করেন এবং নবীজী ও তাঁর সঙ্গী সিদ্দীককে সাদর সম্ভাষণ জানান আর তার সম্মুখে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন। যার সূচনা করেন আল্লাহর হামদ ও ছানা এবং নবীর উপর সালাত ও সালাম পাঠ করে...

আর শেষ করেন এই বলে– "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে কথা দিচ্ছি, আপনাকে আমরা রক্ষা করবো যা কিছু থেকে আমরা

---

[১] খাযরাজ : একটি গোত্র, যারা মূলত ইয়েমেনী, কিন্তু পরে মদীনায় এসে স্থায়ী বসবাস শুরু করে। এটি ও আওস মিলে আনসারীদের বড় অংশ গঠিত।

নিজেদের জান ও নিজ স্ত্রী সন্তানদের রক্ষা করি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা কী পাবো?"

জবাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "জান্নাত"

এই জান্নাত শব্দটি কানে পৌঁছতেই উপস্থিত জনতার মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তারা কেবল বললো, আমরা সন্তুষ্ট ইয়া রাসূলাল্লাহ... আমরা সন্তুষ্ট...

সেই দিন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাবিত ইবনে কায়সকে তার বক্তারূপে গ্রহণ করেন যেমন হাসসান ইবনে ছাবিত ছিলেন তার কবি। ফলে বিষয় এই দাঁড়ালো, আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদল যখন তাঁর কাছে আসতো তাদের বিশুদ্ধভাষী বক্তা ও কবিদের নিয়ে নিজেদের গৌরব গাইতে কিংবা বির্তকের উদ্দেশ্যে তখন নবীজী ছাবিত ইবনে কায়সকে ডাকতেন বক্তাদের মোকাবেলার জন্য আর হাসসান ইবনে ছাবেতকে কবিদের গৌরব গাথার জবাব দেয়ার জন্য...

* * *

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. ছিলেন গভীর ঈমানের অধিকারী মু'মিন। সত্যিকার খোদাভীরু মুত্তাকি, পরহেযগার। আল্লাহর প্রতি তার ভয় ছিলো সীমাহীন। যাকিছু আল্লাহকে নাখোশ করে তার সবই তিনি এড়িয়ে চলতেন সযত্নে, অতিসন্তর্পণে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভীষণ ভীত ও চিন্তিত দেখতে পেলেন। ভয়ে তার বুকের ঊর্ধ্বাংশ কাঁপছিলো। তখন নবীজী বললেন, কী হয়েছে আবু মুহাম্মাদ"?

উত্তরে তিনি বললেন, আমি বোধহয় ধ্বংস হয়ে গেছি ইয়া রাসূলাল্লাহ!

রাসূল বললেন, কিন্তু কেন?

তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের নিষেধ করেছেন, আমরা যে কাজ করিনি তার প্রশংসা শুনতে যেন ভালো না বাসি। অথচ আমি তো দেখছি, প্রশংসা শুনতে ভালোবাসি... এবং তিনি আমাদের বারণ করেছেন অহংকার থেকে, অথচ আমার মধ্যে অহমিকা আছে। তখন রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ভয় দূর করে তাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করার চেষ্টা করলেন। এক পর্যায়ে বললেন, হে ছাবিত! তুমি কি চাও না প্রশংসিত জীবন যাপন করবে ...

শহীদী মৃত্যু লাভ করবে...

আর জান্নাতে দাখিল হবে?...

এই সুসংবাদে ছাবিতের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, অবশ্যই ইয়া রাসূলাল্লাহ, অবশ্যই...

তখন নবীজী বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তা পাবে।

* * *

যখন এ আয়াত–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَاتَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَاتَشْعُرُوْنَ

'হে ঐসকল লোক যারা ঈমান এনেছো তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবীর আওয়াজের উপরে উঁচু করো না এবং তার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলো না, যেমন একে অপরের সাথে বলে থাকো। হতে পারে তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে, অথচ তোমরা জানতেও পারবে না।' (সূরা হুযুরাত, আয়াত-২)

নাযিল হলো,

তখন ছাবিত ইবনে কায়স রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে আসা বন্ধ করে দিলেন– মজলিস থেকে দূরে দূরে থাকলেন। রাসূলের প্রতি তার প্রচণ্ড মহব্বত ও তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও এবং তিনি একভাবে বাসায় অবস্থান করতে লাগলেন। কেবল ফরয নামায ছাড়া সেখান থেকে বেরই হতেন না...

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কে আমাকে তার সংবাদ এনে দেবে? জনৈক আনসারী বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আনসারী ব্যক্তিটি ছাবিতের কাছে গেলেন। গিয়ে দেখেন, তিনি তার ঘরে মাথা নিচু করে বসে আছেন, আর তিনি খুবই চিন্তিত। আগন্তুক শুধালেন, আবু মুহাম্মদ! কী খবর আপনার?

উত্তরে বললেন, খারাপ

-কেন?

- তুমি তো জানো, আমার গলার আওয়াজ একটু চড়া। আর আমার আওয়াজ অনেক সময়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের চেয়ে উঁচু হয়ে যায়। আর কুরআনের কী বিধান নাযিল হয়েছে তাতো জানোই। তো আমার ধারণা, নিশ্চয়ই আমার আমল বরবাদ হয়ে গেছে এবং আমার ঠিকানা জাহান্নাম...

এরপর লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে যেমন শুনেছে দেখেছে সব বললো,

নবীজী তখন বললেন, যাও তাকে গিয়ে বলো, তুমি জাহান্নামী নও বরং তুমি জান্নাতী।

এটি ছিলো ছাবিতের জন্য বিরাট এক সুসংবাদ, সারা জীবন তিনি এর কল্যাণ কামনা করে গেছেন।

* * *

হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. বদর ব্যতীত সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে উপস্থিত থেকেছেন এবং রণাঙ্গনের ভিড়ে নিজেকে হাজির করেছেন– শুধু এ আশায় যে, নবীজী তাকে যে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন তা লাভ করবেন। কিন্তু প্রতিবারই তিনি ব্যর্থ হচ্ছিলেন, অথচ সেটা তার থেকে মাত্র এক কি দুই ধনুক পরিমাণ দূরে।

এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর যামানায় মুসায়লামা কাযযাব ও মুসলমানদের মাঝে 'রিদ্দত' (বিরোধী) যুদ্ধ সংঘটিত হলো।

সে সময় হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. ছিলেন আনসারী সৈনিকদের আমীর। আর আবু হুযায়ফার ক্রীতদাস সালেম মুহাজির

সৈনিকদের আমীর ও খালেদ বিন ওয়ালিদ পুরো বাহিনীর প্রধান বা সর্বাধিনায়ক। আনসার, মুহাজির ও মুসলমানদের অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলের যত যোদ্ধা সকলের আমীর।

তবে অধিকাংশ যুদ্ধে মুসলমানদের তুলনায় মুসায়লামা ও তার দলের লোকজন ছিলো বেশি শক্তিশালী এবং বিজয়ের পাল্লাও ছিলো তাদের দিকে ভারী। তখন পর্যন্ত অধিকাংশ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর উপর বিজয় ও আধিপত্য বজায় রেখেছিলো মুসায়লামা ও তার দলের লোক এবং তা এতই চরম আকার নিয়েছিলো যে, তারা খালিদ ইবনে অলীদের তাঁবুতে ঢুকে পড়ে ও তার স্ত্রী উম্মে তামীমকে হত্যা করতে উদ্যত হয়... তারা তাঁবুর রশি কেটে ফেলে এবং তাঁবু ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দেয়।

সেদিন হযরত ছাবিত ইবনে কায়স রাযি. মুসলমানদের ভীরুতা ও হীনম্মন্যতার এমন বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখলেন যা তার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুললো এবং তাদের পরস্পরের উদ্দেশ্যে নিন্দা ও ব্যঙ্গাত্মক এমনসব কথাবার্তা শুনতে পেলেন যা তার বক্ষকে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ভরে দিলো। শহুরে সৈন্যরা গ্রাম্য সেনাদের ভীরুতার দোষারোপ করছে। অন্যদিকে গ্রাম্য সেনারা শহুরেদের সম্পর্কে বিরুপ মন্তব্য করছে, এদের লড়াইয়ে দক্ষতা নেই; বরং জানেই না যুদ্ধ কী...

এমনি সংকটকালে ছাবিত গায়ে কর্পূর মেখে কাফন জড়ালেন এবং জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হে মুসলিমগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আমরা এভাবে যুদ্ধ করিনি। বড়ই লজ্জার কথা যে, তোমরা শত্রুদেরকে তোমাদের উপর দুঃসাহস দেখাতে অভ্যস্ত করে তুলেছো, বড়ই ঘৃণার বিষয় যে, নিজেদেরকে পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে হেয় করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো।

তারপর তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! এরা (মুসায়লামা ও তার লোকেরা) যে শিরক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে তা থেকে আমি তোমার কাছে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি এবং এরা (মুসলমানেরা) যে কার্যকলাপ করছে তা থেকেও নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। এরপর তিনি ক্ষুধার্ত সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহৎপ্রাণ বারা ইবনে মালেক

আনসারী, যায়দ ইবনে খাত্তাব– ইনি আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাবের ভাই– ও আবু হুযায়ফার ক্রীতাদাস সালেমের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে... এছাড়াও অন্যান্য অগ্রজপ্রতীম মুমিনদেরকে সঙ্গে নিয়ে এমন বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে গেলেন যা মুসলমানদের অন্তরকে প্রেরণায়, আত্মমর্যাদায় ভরিয়ে তুললো আর মুশরিকদের মনকে প্রবলভাবে ভড়কে দিলো। তারা ভীত হয়ে পড়লো...

তিনি সকল দিকেই বীরত্বের সঙ্গে ছুটছিলেন এবং সর্বপ্রকার অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, এক পর্যায়ে ক্রমাগত আঘাত তাকে দুর্বল করে ফেলে। তিনি রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়েন। দৃষ্টি তার উদ্ভাসিত, চিত্ত তার প্রসন্ন... আজ যে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হয়েছে! প্রিয়তম রাসূল তাকে যে শাহাদাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আজ তা লাভে ধন্য হলেন! আর তার কোরবানির বদৌলতে মুসলমানরা লাভ করলো অপ্রত্যাশিত বিজয়...

* * *

হযরত ছাবিতের গায়ে ছিলো একটি দামী বর্ম। তার মৃত দেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জনৈক মুসলিম সেনা সেটা টেনে খুলে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। তার শাহাদাত বরণের পরের রাতে এক মুসলমান স্বপ্নে দেখলেন, কেউ তাকে বলছে, আমি ছাবিত ইবনে কায়স। আমাকে চিনতে পেরেছো? সে বললো, হ্যাঁ...

তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি অসীয়ত করছি। খবরদার, তুমি একে নিছক স্বপ্ন ভেবে হেলা করো না। শোন! আমি যখন গতকাল নিহত হই, তখন এক মুসলিম ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তার বিবরণ এই... সে দেখতে এ রকম...। তো সে আমার বর্মটি নিয়ে তাঁর তাঁবুতে সেনাচৌকির একেবারে শেষ প্রান্তের ঐ দিকটায় গিয়েছে এবং তার এক পাতিলের তলায় সেটা রেখে দিয়েছে। আর পাতিলের উপর চাপিয়েছে একটি হাওদা। অতএব তুমি খালেদ বিন ওলীদকে গিয়ে বলো, তার কাছে যেন কাউকে পাঠিয়ে আমার বর্মটি উদ্ধার করে। আর তা এখনো ঐখানেই রয়েছে।

আমি তোমাকে আরেকটি অসীয়ত করছি। দেখো, একে নিছক স্বপ্ন ভেবে হেলা করো না যেন। খালেদকে তুমি বলো মদীনায় খলীফাতুর

রাসূলের কাছে গেলে সে যেন বলে ছাবিতের এই পরিমাণ ঋণ রয়েছে, আর তার গোলামদের মধ্যে অমুক দু'জন আযাদ। অতএব সে যেন আমার ঋণ শোধ করে দেয় এবং আমার গোলাম আযাদ করে... এরপর লোকটি ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সে খালেদ বিন ওলীদের কাছে এসে যা দেখেছে শুনেছে সব বললো। তখন খালেদ এক ব্যক্তিকে পাঠালেন ঐ বর্ম উদ্ধার করে আনতে এবং আশ্চর্য! ঠিক ঐখানে এবং সেইভাবেই পেলো! যেভাবে স্বপ্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর যখন খালেদ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন হযরত আবু বকর রাযি.কে ছাবিতের বৃত্তান্ত ও তার অসীয়তের কাহিনী শোনালেন। তখন সিদ্দীক তার অসীয়ত পুরা করে দিলেন।

এর আগে বা পরে এমন কারো কথা জানা যায়নি; মৃত্যুর পরে যার করা অসীয়ত বাস্তবায়িত হয়েছে, শুধু ছাবিত ব্যতীত।

ছাবিতের প্রতি আল্লাহ রাজী খুশি হোন তাকেও খুশি করুন। আর তার স্থান নির্ধারিত হোক ইল্লিয়্যীনের অতি উচ্চ মাকামে। আমীন।

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত্‌তাইমী রাযি.

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلٰى رَجُلٍ يَمْشِيْ عَلٰى الْأَرْضِ

وَقَدْ قَضٰى نَحْبَهُ. فَلْيَنْظُرْ إِلٰى طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ

– محمد رسول الله

আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যাবার পরও পৃথিবীতে বিচরণ করছে
এমন কাউকে দেখে যদি কেউ আনন্দ পেতে চায়
তাহলে সে যেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহকে দেখে।

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আত্‌তাইমী রাযি.

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আততাইমী রাযি. ব্যবসার উদ্দেশ্যে কুরায়শের এক বাণিজ্য-কাফেলার সঙ্গে যাচ্ছিলেন সিরিয়ার দিকে– তৎকালীন শাম দেশে। কাফেলা যখন 'বসরা' নগরীতে পৌঁছলো তখন কুরায়শ বণিকদের প্রবীণ ও বয়স্ক লোকেরা নেমে পড়লো বসরার জমজমাট বাজারে বেচাকেনা করতে।

তালহা যদিও ছিলেন অল্প বয়সী তরুণ, অন্যদের মতো ব্যবসায় জ্ঞান তার নেই, তবে তার ছিলো এমনই তীক্ষ্ণ মেধা আর প্রখর বুদ্ধিশক্তি যা দিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারেন এবং তাদেরকে টপকে বড় চুক্তিগুলো লুফে নিতে পারেন।

নানা অঞ্চলের আগন্তুকের ভিড়ে ঠাসা ঐ বাজারে তালহা যখন ইতস্তত ঘুরছিলেন তখন এমন একটি ব্যাপার ঘটলো যা তার সমগ্র জীবনের গতিধারা পাল্টে দিলো শুধু তাই নয়, বরং তা ছিলো ইতিহাসের রোখ আমূল বদলে যাবারও সুসংবাদ। এবারে আমরা তালহা ইবনে উবাইদুল্লাকেই কথা বলতে দেই। তিনিই আমাদের শোনাবেন তার সেই মর্মস্পর্শী কাহিনী।

তালহা বলেন, আমরা বসরার বাজারেই ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম, এক পাদ্রী জনতার উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছে, হে ব্যবসায়ীগণ! এই মেলায় আগতদের জিজ্ঞেস করো, তাদের মাঝে কি হারামের বাসিন্দা কেউ আছে? আমি ছিলাম তার একেবারে সন্নিকটে। তাই তৎক্ষণাত তার সামনে এসে বলে উঠলাম, হ্যাঁ আমি আছি হারামের বাসিন্দা। আমাকে দেখে সে বললো, তোমাদের মাঝে কি আহমাদ আত্মপ্রকাশ করেছেন? আমি বললাম, কে আহমাদ? সে বললো আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আব্দুল্লাহর ছেলে... এ মাসেই তার আত্মপ্রকাশের কথা। আর তিনি সর্বশেষ নবী। তিনি তোমাদের হারাম ভূমি থেকে আর্বিভূত হবেন এবং কালো পাথরময় ভূখণ্ডে হিজরত করবেন। যেখানে আছে খেজুর বাগান আর লবণাক্ত জলাভূমি...

সুতরাং দেখো হে যুবক! তোমার আগে কেউ তার কাছে পৌঁছে না যায়?... তালহা বলেন, তার এই কথা আমার অন্তরে গেঁথে গেলো। আমি তক্ষুণি আমার উটের কাছে গিয়ে তাতে হাওদা বাঁধলাম এবং কাফেলাকে রেখেই মক্কার উদ্দেশ্যে দ্রুতবেগে ছুটলাম।

মক্কায় এসে আমি আমার স্বজনদের জিজ্ঞেস করলাম, আমরা সফরে যাবার পর মক্কায় কিছু ঘটেছে কি?

তারা বললো, হ্যাঁ, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ বলতে শুরু করেছে সে নবী। এবং ইবনে আবী কুহাফা (আবু বকর) তার অনুসারী হয়েছে... তালহা বলেন, আমি আবু বকরকে আগে থেকেই চিনতাম। কারণ তিনি ছিলেন সহজ, সুন্দর ও বিনম্র স্বভাবের মানুষ, তিনি সবার সঙ্গে মিশতেন আর সকলের কাছেই ছিলেন প্রিয়। তিনি ছিলেন একজন সৎ ও আদর্শ ব্যবসায়ী। আমরা তাকে ভালোবাসতাম ও তার বৈঠকে বসতে পছন্দ করতাম। কারণ তিনি কুরায়শের খবরাখবর ভালো জানতেন। কুরায়শের বংশ তালিকাও ছিলো তার মুখস্থ।

তো আমি তার কাছে গিয়ে পরিস্থিতি জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলাম। এটা কি সত্য যে, শুনছি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ নবুওয়াতের ঘোষণা দিয়েছেন এবং আপনি তার অনুসারী হয়েছেন?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি আমাকে তার বৃত্তান্ত শোনালেন এবং তার সঙ্গে যোগ দিতে উৎসাহিত করলেন। তখন আমি তাকে ঐ পাদ্রী যা বলেছিলো সে সব বর্ণনা করলাম। এতে আবু বকর ভীষণ অবাক হলেন। তিনি বললেন, চলো আমার সঙ্গে। মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে তুমি তোমার এই ঘটনা বর্ণনা করবে। এবং তিনি যা বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনবে তারপর আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করবে। তালহা বলেন, আমি তার সঙ্গে গেলাম মুহাম্মাদের কাছে। তিনি আমার সামনে ইসলাম পেশ করলেন। কুরআন থেকে কিছু তিলাওয়াত করে শোনালেন এবং আমাকে দুনিয়া ও আখেরাতের খোশখবরি দিলেন। ফলে আল্লাহ ইসলামের প্রতি আমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিলেন আর আমি তার কাছে বর্ণনা করলাম বসরার সেই পাদ্রীর ঘটনা। এতে তিনি এতই খুশি হলেন যে, সেটা তার চেহারাতেও প্রকাশ পেলো।...

এরপর আমি তার সম্মুখে উচ্চারণ করলাম এই সাক্ষ্যবাণী লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ...

আর আমি হয়ে পড়লাম সেই তিনজনের চতুর্থজন যারা মুসলমান হয়েছিলো আবু বকরের হাতে।

* * *

কুরায়শী যুবকের ইসলাম গ্রহণে তার পরিবার ও স্বজনদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তার মুসলমান হওয়াতে সবচে' বেশি বিচলিত ছিলো তার মা। কারণ তিনি আশা করতেন তার ছেলে নিজ গোষ্ঠীর সর্দার হবে, যেহেতু নেতৃত্ব দেয়ার মতো মহৎ চরিত্র ও মহত্তর বৈশিষ্ট্য তার মাঝে দীপ্যমান ছিলো।

* * *

এরই মধ্যে তার গোত্রের লোকেরা ছুটে এলো তাকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নিতে, কিন্তু তারা দেখলো, সুদৃঢ় পাহাড়ের মতোই সে অনড়। এভাবে যখন তারা নিরাশ হলো এবং বুঝলো যে, ভালো কথায় কাজ হবে না তখন তারা অত্যাচার ও উৎপীড়নের পথ বেছে নিলো।

মাসউদ ইবনে খারাশ বর্ণনা করেছেন তার দেখা একটি ঘটনা। তিনি বলেন,

আমি ছাফা মারওয়ার মাঝ দিয়ে যাচ্ছিলাম হঠাৎ দেখতে পেলাম, বহু সংখ্যক মানুষ এক যুবকের পিছন পিছন ছুটছে, যার দুই হাত বাঁধা হয়েছে গলায় কাছে... ওরা তাকে ধাওয়া করছে আর এলোপাথারি ভাবে মারছে– মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে... আঘাতের পর আঘাত... আর পিছন থেকে এক মহিলা বিকট জোরে চেচাচ্ছে আর তাকে বকছে...

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপার কী, কী হয়েছে?

তারা আমাকে জানালো, এ হচ্ছে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ। স্বধর্ম ত্যাগ করেছে এবং বনূ হাশেমের ছেলেটির অনুসারী হয়েছে।

আমি বললাম, আর এই মহিলাটি কে, যে তার পিছনে রয়েছে?

তারা বললো, সে হচ্ছে স'বা বিনতে হায্‌রামি। এই যুবকের মা...

* * *

এরপর নওফল ইবনে খুওয়ায়লিদ– কুরায়শ সিংহ ছিলো যার উপাধি। সে তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহর কাছে গিয়ে তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলো। তার সঙ্গে আবু বকরকেও বাঁধলো। এবং দু'জনকে এক সাথে করে ছেড়ে দিলো মক্কার দুষ্ট-নির্বোধ লোকদের হাতে, যেন তারা অমানুষিক নির্যাতনে তাদের নাজেহাল করে...

সেই থেকে তালহা ও আবু বকর দু'জনকে বলা হয় করীনাইন জোড়া বা দুই যুগল।

* * *

এরপর আরো অনেক দিন কেটে গেলো। একের পর এক ঘটে চললো ঘটনা। দিন যতো গেলো তালহাও হয়ে উঠলেন ততটাই পরিণত, পরিপক্ক। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে তার ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার বৃদ্ধি পেতে লাগলো এবং ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি তার সদাচার আরো ব্যাপক আরো বিস্তৃত হলো। এক পর্যায়ে মুসলমানগণ তাকে উপাধি দিলেন 'আশাশাহীদুল হাই' বা জীবন্ত শহীদ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন আরো কতগুলো নামে 'তালহাতুল খায়র', 'তালহাতুল জুদ' 'তালহাতুল ফায়য়ায'...

এই প্রত্যেকটি নাম ও উপাধিরই রয়েছে একটি করে কাহিনী কোনটির আকর্ষণই অপরটি থেকে কম নয়।

* * *

আশশাহীদুল হাই উপাধী তিনি লাভ করেন উহুদ যুদ্ধের পটভূমিতে। যখন মুসলিম যোদ্ধাগণ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এবং মাত্র এগারজন আনসারী ছাহাবী ও মুহাজিরদের মধ্যে শুধু হযরত তালহা ছাড়া কেউ ছিলেন না তার পাশে।

নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম ও তার সঙ্গীরা তখন চেষ্টা করছিলেন পাহাড়ের উপরে উঠতে। এ সময় তাদের কাছে এসে পড়ে মুশরিকদের একটি দল; লক্ষ্য তাদের মুহাম্মদ।

তখন নবীজী বললেন, "কে আমাদের থেকে এদের প্রতিহিত করবে, বিনিময়ে সে হবে জান্নাতে আমার সঙ্গী?"

তালহা বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ।

উত্তরে নবীজী বললেন, 'না। তুমি থামো।'

তখন জনৈক আনছারী বললেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ

তিনি বললেন 'হ্যাঁ, তুমি'

তখন আনছারী লড়াইয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সঙ্গীরা আরেকটু উঁচুতে উঠলেন, কিন্তু মুশরিকরা আবারো পিছু নিলো। তখন নবীজী বললেন, 'কেউ কি নেই এদের মোকাবেলা করবে?'

তালহা বললেন, আমি ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবীজী বললেন, 'না, তুমি থাকো' তখন জনৈক আনছারী বললেন। আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ।

তিনি বললেন, হ্যাঁ তুমি... এরপর আনছারীটি লড়াইয়ে ঝাঁপ দিলেন এবং একপর্যায়ে শহীদ হয়ে গেলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো খানিকটা উপরে ওঠার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মুশরিকরা আবার পিছু নিলো। ফলে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন, প্রত্যেকবারই তালাহা বলেন, আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিন্তু নবীজী তাকে বারণ করেন আর কোন আনছারী ব্যক্তিকে অনুমতি দেন। এভাবে একে একে সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। তালহা ছাড়া কেউই বেঁচে নেই। শুধু তিনিই আছেন নবীজীর সাথে। সেই মুহূর্তে সেই বিভীষিকার ভিতর আবারো হানা দিলো মুশরিকরা। এবার তিনি তালহার উদ্দেশে বললেন,

হ্যাঁ এখন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে গেছে। কপাল ফেটে গেছে। ঠোঁটে জখম, চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। শক্তি প্রায় নিঃশেষ...

ওদিকে তালহা প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে মুশরিকদের বাধ্য করছেন পিছু হটে যেতে। তারা সরে পড়া মাত্র তিনি রাসূলের কাছে ছুটে আসেন এবং তাঁকে নিয়ে উঠে যান আরো খানিকটা উপরে। এরপর রাসূলকে পাহাড়ের

কোলে আলতোভাবে নামিয়ে রেখে আবারো ঝাঁপিয়ে পড়েন মুশরিকদের ওপর... এভাবে এক পর্যায়ে তিনি তাদেরকে রাসূলের সম্মুখ থেকে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন... হযরত আবু বকর রাযি. বলেন, ঐ মুহূর্তে আমি ও আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ ছিলাম রাসূলুল্লাহ থেকে দূরে। পরে যখন তাকে দেখতে পেয়ে শুশ্রূষার জন্য এগিয়ে গেলাম তিনি বললেন, আগে তোমাদের সাথীর কাছে যাও, উদ্দেশ্য তালহা। তালহার কাছে গিয়ে দেখলাম তার সমস্ত শরীর রক্তে রঞ্জিত। তীর তলোয়ার ও বর্শার আঘাত মিলিয়ে সারা দেহে তার সত্তরটিরও বেশি ক্ষত...আর একী! কবজি পর্যন্ত একটি হাত সম্পূর্ণ কাটা... চৈতন্য হারিয়ে তিনি পড়ে আছেন গর্তের ভিতর...

এরপর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন; "আয়ু ফুরিয়ে যাবার পরও পৃথিবীতে চলাফেরা করছে– এমন কাউকে দেখে যে আনন্দ পেতে চায় সে যেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ কে দেখে নেয়।"

আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. উহুদের আলোচনা উঠলে বলতেন : সে ছিলো এমন একদিন যার পুরোটাই তালহার...

* * *

এ হচ্ছে তাকে জীবন্ত শহীদ আখ্যা দেয়ার কাহিনী। আর তিনি যে খেতাব পেয়েছিলেন 'তালহা আল খায়র' ও 'তালহা আল জুদ' তথা কল্যাণব্রতী ও দানবীর– তারও আছে একশ' একটি কাহিনী...

তন্মধ্যে একটি হলো ঃ হযরত তালহা রাযি. ছিলেন এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার ছিলো বিপুল ঐশ্বর্য আর বিশাল কারবার। একদিন হাযরামওত অঞ্চল থেকে কিছু নগদ অর্থ এলো তার কাছে, যার পরিমাণ সাত লক্ষ দেরহাম। ফলে সেই রাতটি তিনি কাটালেন ভীষণ ভয়, দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার ভিতর।

এ অবস্থা দেখে তার স্ত্রী আবু বকর সিদ্দীকের কন্যা ঃ উম্মে কুলসুম কাছে গিয়ে শুধালেন, কী হয়েছে আপনার, আবু মুহাম্মাদ!! আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন? আমাদের কোন কিছুতে কষ্ট পেয়েছেন হয়ত!!

জবাবে তিনি বললেন, না। একজন মুসলিমের স্ত্রী হিসেবে সত্যিই চমৎকার তুমি...কিন্তু রাত হয়েছে অবধি আমি ভাবছি, সে লোক তার

রবের কাছে কী আশা করতে পারে যে বিছানায় শুয়ে ঘুমায় অথচ তার ঘরে রয়েছে এই পরিমাণ সম্পদ?

স্ত্রী বললেন, এতে আর চিন্তার কী আছে?...আপনার নিজ গোত্র ও বন্ধুদের মধ্যে যারা অভাবী তাদের প্রতি মনোযোগী হচ্ছেন না কেন?

সকাল হলেই ওগুলো তাদের মাঝে বণ্টন করে দিন!

একথা শুনে তালহা আনন্দে বলে উঠলেন– আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হোন, নিশ্চয়ই তুমি সাহসী মেয়ে। যেমন তোমার বাবা সাহসী...

সকালে উঠে তালহা দেরহামগুলো বড় বড় পাত্রে আর থলেতে ভরলেন। তারপর সেগুলো গরীব মুহাজির ও আনছারদের মাঝে ভাগ করে দিলেন।

* * *

কথিত আছে জনৈক ব্যক্তি তালহার কাছে এলো সাহায্য চাইতে এবং সে উল্লেখ করলো, একসূত্রে সে তার আত্মীয়। তালহা তখন বললেন–

এ এমন এক সম্বন্ধ যার কথা আগে কারো কাছে শুনিনি।

এ মুহূর্তে আমার একটি জমি আছে, যা আমাকে হযরত উছমান ইবনে আফফান রাযি. খরিদ করে দিয়েছেন। তিন লাখের বিনিময়ে। ইচ্ছা করলে সেটা নিতে পারো। আবার চাইলে ঐ দামে আমি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য তোমাকে দিতে পারি...

লোকটি বললো– বরং ওর মূল্যই আমাকে দিন।

তিনি তা-ই দিলেন।...

* * *

সার্থক তালহার জন্য রাসূলের দেয়া উপাধি। ধন্য তুমি ওহে দানবীর!

ওহে কল্যাণব্রতী...!!

তালহার প্রতি আল্লাহ রাজি-খুশি হোন এবং তার কবরকে আলোকমালায় ভরে দিন। নূরে নূরান্বিত করে দিন।

হযরত আবু হুরায়রা আদ্‌দাউসী রাযি.

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. উম্মতে মুসলিমার জন্য ষোলশ'রও বেশি হাদীছ সংরক্ষণ করেছেন।

-ঐতিহাসিকগণ

হযরত আবু হুরায়রা আদ্‌দাউসী রাযি.

রাসূলের সাহাবীদের মাঝে দেদীপ্যমান এই তারকাটিকে নিশ্চয়ই তুমি চেনো।

মুসলিম উম্মাহর মাঝে এমন কেউ কি আছে, যে চেনে না হযরত আবু হুরায়রাকে? জাহেলী যুগে মানুষ তাকে ডাকতো 'আবদে শামস' বা সূর্যদাস বলে। এরপর যখন আল্লাহ তাকে ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করলেন। তিনি নবী আলাইহিস্‌ সালাতু ওয়াস সালামের সাক্ষাত লাভে ধন্য হলেন তখন নবীজী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী?

তিনি বললেন, আবদে শামস। নবীজী বললেন, 'বরং আব্দুর রহমান, (রহমানের বান্দা)

তিনি তৎক্ষণাৎ বললেন, হ্যাঁ আব্দুর রহমান, আমার মা-বাপ আপনার জন্য কোরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ!

আর তাকে 'আবু হুরায়রা' বলার কারণ এই যে, শৈশবে তার ছিলো একটি ছোট্ট বিড়াল, যা নিয়ে তিনি খেলতেন। সঙ্গের ছেলেরা তাকে ডাকতে শুরু করে আবু হুরায়রা বা বিড়ালের বাপ বলে।

আর সেটাই মশহুর হয়ে পড়ে এবং এতটা প্রসিদ্ধি পায় যে, তার আসল নামই ঢাকা পড়ে গেছে। পরে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তার সম্পর্ক কায়েম হয় তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে প্রায়ই ডাকতে শুরু করেন আবু হির্‌রিন বলে। উদ্দেশ্য, তার প্রতি আপনত্ব ও ভালোবাসা প্রকাশ। ফলে 'আবু হুরায়রা' এর পরিবর্তে 'আবু হির্‌রিন' নামটিই তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে। আর তিনি বলতেনও, এই নামে আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ আমায় ডেকেছেন... আবু হুরায়রা ইসলাম গ্রহণ করেন তোফায়েল ইবনে আমর দাউসী রাযি.-এর হাতে, তবে ষষ্ঠ হিজরী পর্যন্ত তার গোত্র দাউসের মাঝেই অবস্থান করেন। ষষ্ঠ হিজরীতে তার গোত্রের একদল লোকের সঙ্গে মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হন।

*   *   *

এই দাউসী তরুণ রাসূলুল্লাহর সেবায় ও তার সান্নিধ্যে নিজেকে উজাড় করে দেন। মসজিদকে আবাস বানিয়ে পড়ে থাকেন রাসূলের সোহবতে। মসজিদই তার ঘর, নবীই তার শিক্ষক ও রাহবার।

আর তিনি এটা পেরে ছিলেন কারণ নবীর জীবদ্দশায় তার কোন স্ত্রী-সন্তান ছিল না; কেবল ছিলো এক বৃদ্ধা মাতা যে ছিলো শিরকে অনড় ছিলো। তিনি অনবরত তাকে দাওয়াত দিতেন ইসলাম কবুলের জন্য, সহজাত অনুরাগ বশত এবং তার প্রতি সদাচারের আশায়, কিন্তু সে তাতে সাড়া না দিয়ে আরো বিরক্ত হতো। আর তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনে ফিরে আসতেন।

একদিনের ঘটনা, তিনি তার মাকে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন। তখন সে নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বললো যাতে তিনি প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন।

ফলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে রাসূলের দরবারে গিয়ে হাজির হলেন। নবী আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম জিজ্ঞেস করলেন- "কী হয়েছে, কাঁদছো কেন আবু হুরায়রা।"

উত্তরে তিনি বললেন, আমি সবসময় আমার মাকে ইসলামের দাওয়াত দিতাম কিন্তু তিনি গ্রহণ করতেন না। আজ হয়েছে কী, আমি তাকে দাওয়াত দিতে গেলাম আর তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে এমন সব কথা শুনিয়ে দিলেন, যা আমি মোটেও বরদাশ্ত করতে পারি না।

দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আবু হুরায়রার মায়ের মনকে ইসলামের প্রতি ঝুঁকিয়ে দেন।

তখন নবীজী তার জন্য দোয়া করলেন।

আবু হুরায়রা বলেন-

এরপর আমি বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। গিয়ে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। আমি বাইরে থেকে পানির শব্দ শুনতে পেলাম। ভিতরে ঢুকতে যাবো তখনই মা বলে উঠলেন, আবু হুরায়রা... একটু দাঁড়াও। এরই মধ্যে তার গোসল শেষ হলো এবং তিনি কাপড় পরে নিয়ে বললেন, আসো। আমি ভিতরে গেলাম আর তিনি বলতে শুরু করলেন-

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

তখন আমি আবার রাসূলুল্লাহর কাছে গেলাম। আমি তখন আনন্দে কাঁদছি যেমন একটু আগে দুঃখ পেয়ে কেঁদেছি। রাসূলের মুখোমুখি হতেই আমি বলে উঠলাম, সুসংবাদ নিন ইয়া রাসূলাল্লাহ!...

আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার আম্মাকে ইসলামের দৌলত দান করেছেন। তিনি হেদায়াত পেয়েছেন ...

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন ভালোবেসেছিলেন যে তার রক্তে মাংসে মিশে গিয়েছিলো সে ভালোবাসা

তাই রাসূলের দিকে তিনি চোখ মেলে চাইতে পারতেন না। তিনি বলতেন রাসুলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মতো এত সুন্দর, এত উজ্জ্বল আর কিছুই আমি দেখিনি। যেন বা সূর্য চমকাতো তার চেহারায়...

নবীর এই সান্নিধ্য লাভ ও আল্লাহর দীন অনুসরণের সৌভাগ্য পেয়েছেন বলে তিনি খুব কৃতার্থ ছিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন আর বলতেন, প্রশংসা সকল কেবল আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে দিয়েছেন ইসলামের সন্ধান।

প্রশংসা কেবল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লার যিনি আবু হুরায়রাকে শিখিয়েছেন কুরআন। প্রশংসা শুধুই আল্লাহর যিনি আবু হুরায়রাকে নসীব করেছেন– মুহাম্মাদের ছোহবত....

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. যেমন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্‌র ভালোবাসায় আকুল তেমনি ছিলেন প্রচণ্ড বিদ্যানুরাগী। ইলমের জন্য উৎসর্গিত প্রাণ... ইলমই ছিলো তার সাধনা, তার অভ্যাস, তার পরম চাওয়া ও চূড়ান্ত লক্ষ্য। যায়েদ ইবনে ছাবেত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একবার আমি, আবু হুরায়রা ও আমাদের এক সঙ্গী মসজিদে বসে দোয়া ও যিকির আযকার করছিলাম।

এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত হলেন আমাদের মাঝে। তিনি এগিয়ে এলেন আমাদেরকে লক্ষ্য করে এবং বসলেন আমাদের সঙ্গে। আমরা চুপ হয়ে গেলাম।...

তখন নবীজী বললেন– 'তোমরা যা করছিলে করতে থাকো'।

আমি ও আমার সঙ্গীটি– আবু হুরায়রার আগে– আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। নবীজী তাতে আমীন বললেন... এরপর আবু হুরায়রা দোয়া করলো। সে বললো, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই যা চেয়েছে আমার সঙ্গীদ্বয়... আরো চাই এমন ইলম যা বিস্মৃত হয় না...

নবীজী বললেন! "আমীন"

তখন আমরাও বললাম, এমন ইলম চাই যা বিস্মৃত হয় না। নবীজী বললেন, "দাউসী বালকটি তোমাদের আগে চেয়ে ফেলেছে"।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. নিজে যেমন ইলম চর্চাকে ভালোবাসতেন তেমনি চাইতেন অন্যরাও ইলম অর্জন করুক। একবারকার ঘটনা, সেদিন তিনি মদীনার বাজারের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মানুষের দুনিয়াবী ব্যস্ত তা এবং বেচাকেনা ও লেনদেনের মাঝে নিমজ্জমান অবস্থা তাকে শঙ্কিত করে তুললো তিনি থেমে পড়লেন এবং তাদের লক্ষ্য করে বললেন–

মদীনাবাসী! কী ব্যাপার তোমরা এমন কমজোর কেন?

তারা বললো, আমাদের কী কমজোরি দেখলেন আবু হুরায়রা?

তিনি বললেন, রাসূলের মিরাছ বন্টন হচ্ছে আর তোমরা সব এখানে!!...

যাওনা, নিজেদের ভাগটা নিয়ে এসো।

তারা সমস্বরে বললো–

সেটা কোথায় আবু হুরায়রা?!

বললেন, মসজিদে।

সবাই হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে পড়লো। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকলেন; যতক্ষণ না তারা ফিরে এলো।

ফিরে এসে তারা আবু হুরায়রাকে দেখামাত্র অনুযোগের সুরে বললো, আবু হুরায়রা! আমরা তো মসজিদের ওখানে গেলাম, ভিতরে পর্যন্ত ঢুকলাম। কিন্তু কই, কিছু তো বণ্টন হতে দেখলাম না।...

তিনি অবাক হওয়ার মতো করে বললেন, তোমরা কি কাউকেই দেখোনি মসজিদে?!

তারা বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই...

আমরা দেখেছি কিছু লোক নামায পড়ছে, কিছু লোক কুরআন তিলাওয়াত করছে আর একদল বসে হালাল-হারাম নিয়ে আলোচনা করছে...

তিনি তিরস্কার করে বললেন, ধিক তোমাদের! ওসবই তো মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিরাছ...

* * *

ইলমের প্রতি এই একাগ্রতা এবং রাসূলের মজলিসে নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতির কারণে হযরত আবু হুরায়রাকে অনাহার ও অনটনের এমন কষ্ট সইতে হয়েছে, যা আর কারো ক্ষেত্রে হয়নি। নিজের সম্পর্কে এক বর্ণনায় তিনি বলেন, আমার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেতো। কখনো এতো বেশি ক্ষুর্ধাত হয়ে পড়তাম যে, আমি রাসূলুল্লাহর ছাহাবীদের কোন একজনকে কুরআনের কোন একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম অথচ সেটি তার চেয়ে আমারই বেশি জানা। উদ্দেশ্য, তিনি যেন আমাকে সঙ্গে করে তার ঘরে নিয়ে যান এবং কিছু খেতে দেন।

একদিন এরকম আমার খুব ক্ষুধা পেলো। ক্ষুধার তাড়নায় পেটে পাথর বাঁধলাম। তারপর ছাহাবীরা যে রাস্তা দিয়ে আসা যাওয়া করেন সেখানে বসে পড়লাম। তখন প্রথমে হযরত আবু বকর রাযি. গেলেন আমার পাশ দিয়ে। আমি তাকে কুরআনের একটি আয়াত জিজ্ঞেস করলাম– এ আশায় যে তিনি হয়ত আমাকে ডেকে নেবেন... কিন্তু তিনি ডাকলেন না। এরপর আমাকে অতিক্রম করলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.। তাকেও একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু তিনিও ডাকলেন না আমাকে। শেষ ব্যক্তি যিনি এই পথ দিয়ে গেলেন তিনি হচ্ছেন, রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বুঝতে পারলেন আমার ক্ষুধার্ত অবস্থা। দরদভরা কণ্ঠে ডাকলেন, 'আবু হুরায়রা'?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম লাব্বাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ...

এবং তাঁর পিছে পিছে চললাম। তার সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম। ঘরে এসে তিনি একটি পেয়ালা দেখতে পেলেন, যাতে রয়েছে সামান্য দুধ। তিনি তার পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোত্থেকে এসেছে তোমাদের কাছে?

তারা বললেন, অমুক পাঠিয়েছে আপনার জন্য।

নবীজী তখন বললেন, আবু হুরায়রা! যাও আসহাবুস্ সুফ্‌ফাকে ডেকে নিয়ে এসো।

হযরত আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল যে আমাকে তাদের ডেকে আনতে বললেন এতে আমি খুবই হতাশ হলাম। মনে মনে বললাম, এইটুকু দুধে গোটা সুফ্‌ফাবাসীর কী হবে?

আমার মন চাচ্ছিলো, পেয়ালা থেকে অন্তত এক চুমুক খেয়ে নিয়ে তারপর তাদের কাছে যাই, যাতে কিছুটা হলেও দুর্বলতা কাটে... যাইহোক। আমি সুফ্‌ফার লোকদের কাছে এলাম এবং তাদের দাওয়াত দিলাম। তারা তৎক্ষণাত চলে এলো। সবাই এসে রাসূলের কাছে জড়ো হলে তিনি বললেন–'নাও আবু হুরায়রা সবাইকে দাও'। আমি এক এক জন করে দিতে লাগলাম। যাকে দেই সে, খেয়ে তৃপ্ত হয়ে পাশের জনকে... এভাবে সকলের পান করা শেষ হলো; আমি তখন পেয়ালাটা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে দিলাম। তিনি মৃদু হেসে আমার দিকে মাথা তুলে তাকালেন আর বললেন 'শুধু আমি আর তুমি বাকি'।

আমি বললাম, আপনি সত্য বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন, 'তাহলে খাও' আমি খেলাম।

তিনি আবারো বললেন, 'খাও' আমি খেলাম। এভাবে তিনি বলতেই থাকলেন এবং আমি খেতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমি আরয করলাম,

যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম করে বলছি, আমি আর খেতে পারছি না...

তখন তিনি পাত্রটি আমার হাত থেকে নিলেন এবং অবশিষ্ট দুধ পান করলেন...

* * *

কিন্তু হযরত আবু হুরায়রাকে এই অনাহার যাতনা বেশি দিন সইতে হয়নি... মুসলমানদের হাতে চতুর্দিক থেকে আসতে শুরু করলো গণীমতের অঢেল সম্পদ... ঐশ্বর্যের জোয়ারে ভেসে গেলো গোটা শহর... হযরত আবু হুরায়রার এখন ঘর হয়েছে, ঘরের আসবাব, স্ত্রী-সন্তান সবকিছুই। আর নগদ অর্থও .... তবে এতকিছুর পরও তিনি আগের মতোই আছেন। তার মানসিকতায় এতটুকু পরিবর্তন নেই। পিছনের দিনগুলোকে তিনি মোটেও ভোলেননি। প্রায়ই তিনি বলতেন,

আমার শৈশব কেটেছে পিতৃহীন। হিজরত করেছি তখন মিসকীন। আর আমি ছিলাম পেটভাতায় বুসরা বিনতে গাযওয়ানের শ্রমিক। কাফেলা অবতরণ করলে তাদের খাদেমদারি করতাম, আর তারা যাত্রা শুরু করলে তাদের উটগুলো হাঁকিয়ে নিতাম।...

আল্লাহর ইচ্ছায় একদিন সেই বুসরাই হলো আমার সহধর্মিণী... সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দ্বীনকে করেছেন সবকিছুর বুনিয়াদ আর আবু হুরায়রাকে বানিয়েছেন ইমাম। (হযরত মু'আবিয়ার তরফ থেকে মদীনায় তার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত)।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের পক্ষ হতে একাধিকবার মদীনায় গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন, কিন্তু এই পদমর্যাদা তার স্বভাব সরলতা, তার ঔদার্য ও রসবোধ কিছুই বদলায়নি। একবার তিনি মদীনার একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন– তিনি তখন মদীনার গর্ভনর– তার পিঠে ছিলো বাড়ীতে নেয়ার জন্য এক বোঝা লাকড়ী। পথে পড়লো ছা'লাবা ইবনে মালেক। তাকে দেখতে পেয়ে তিনি বললেন আমীরকে জায়গা করে দাও। উনি বললেন, আল্লাহ আপনাকে রহম করুন এই এতখানি জায়গাও কি যথেষ্ট নয়!

উত্তরে তিনি বললেন, জায়গা দাও আমীরের যাওয়ার জন্য এবং পিঠে যে বোঝাটি রয়েছে তার জন্য!

* * *

জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মনের উদারতার সঙ্গে সঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. অর্জন করেছিলেন তাকওয়া ও খোদাভীতি। দিনের বেলা রোজা রাখতেন আর রাতের প্রথম প্রহর জেগে কাটাতেন। তারপর স্ত্রীকে ডেকে দিতেন, সে দ্বিতীয় প্রহর জাগরণ করতো, তারপর তার মেয়েকে তুলে দিতেন। সে বাকী রাতটুকু জাগতো...

ফলে রাতের একটি মুহূর্তও তার ঘরে ইবাদত বিহীন কাটতো না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর ছিলো একটি হাবশী বাদী। একবার সে তাকে কষ্ট দিলো। তার পরিবারকেও পেরেশান করলো। তখন তিনি তাকে মারার জন্যে লাঠি তুললেন, কিন্তু পরক্ষণেই থেমে গেলেন। শুধু বললেন, যদি কেয়ামতের দিন বদলা নেয়ার ভয় না থাকতো, তবে আমি তোমাকে আঘাত করতাম যেমন তুমি আমাদের ব্যথা দিয়েছো, কিন্তু না... আমি বরং তোমাকে বিক্রি করে দেবো এমন একজনের কাছে যে আমাকে তোমার ন্যায্যমূল্য পরিশোধ করবে আর আমিই তার বেশি মোহতাজ... যাও, আল্লাহর ওয়াস্তে তুমি আযাদ...

* * *

তার কন্যা তাকে বলতো আব্বাজান! মেয়েরা আমাকে লজ্জা দেয়। ওরা বলে, তোমার বাবা তোমাকে সোনার গয়না পরায় না কেন? তিনি উত্তর দিতেন, মা, ওদের বলো, আমার বাবা জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে ভয় করে (অর্থাৎ জাহান্নাম)।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. তার মেয়েকে অলংকার পরতে দেননি তার কারণ এ নয় যে, তিনি সম্পদলোভী কিংবা কৃপণ; বরং তিনি ছিলেন অনেক বেশি দানশীল, আল্লাহর রাস্তায় খরচে উদার অকৃপণ...

একবারকার ঘটনা, মারওয়ান ইবনুল হাকাম তার কাছে পাঠালো একশ' দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)। পরদিন সে এক বাহক মারফত খবর দিলো যে, আমার খাদেম ভুলে দিনারগুলো আপনাকে দিয়ে এসেছে। আমি আপনাকে

দিতে চাইনি। আমি আসলে চেয়েছিলাম আরেকজনকে দেবো। একথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। তিনি জানালেন, ওগুলো আমি কালই আল্লাহর রাস্তায় খরচ ফেলেছি; আমার হাতে এখন তার এক দীনারও বেঁচে নেই। বায়তুল মাল থেকে আমার বরাদ্দ এলে ওখান থেকে নিয়ে নেবেন।

মারওয়ান আসলে এটা করেছিলো তাকে পরীক্ষা করবার জন্য। এ অনুসন্ধানে প্রমাণিত হলো, তার ধারণা সঠিক।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ছিলেন মায়ের প্রতি সদাচারী– যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন। ঘর থেকে বেরোনোর সময় মাকে গিয়ে বলতেন, আস্‌সালামু আলাইকুম আম্মা! আপনার প্রতি আল্লাহর করুণা ও কল্যাণ বর্ষিত হোক। মা বলতেন, ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম বেটা, তোমার প্রতিও বর্ষিত হোক তাঁর করুণা ও কল্যাণ। তারপর হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন যেমন আপনি আমাকে ছোটকালে মানুষ করেছেন।

জবাবে মা বলেন, আল্লাহ তোমাকেও দয়া করুন– বার্ধক্যে যেমন তুমি আমার যত্ন করছো। একইভাবে যখন ঘরে ফিরতেন তখনও আগে মায়ের সঙ্গে দেখা করে ঐ বাক্যগুলো বলতেন।

* * *

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. মানুষকে মা-বাবার প্রতি সদাচারী হওয়ার ও আত্মীয়তা রক্ষায় খুব তাগিদ দিতেন। এক্ষেত্রে তার আগ্রহও ছিলো সীমাহীন।

একদিন তিনি দুই ব্যক্তিকে দেখলেন পাশাপাশি হাঁটছে। একজন আরেকজন থেকে বয়সে বড়। তখন এদের মধ্যে যে ছোট তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ইনি তোমার কী হয়?

সে বললো, আমার আব্বা, তিনি তখন বললেন, কখনো তাকে নাম ধরে ডাকবে না...

তার সামনে দিয়ে হাঁটবে না...

এবং তার আগে বসবে না...

মৃত্যুর আগের অসুস্থতাকালে হযরত আবু হুরায়রা রাযি. একবার কাঁদছিলেন...

কেউ জিজ্ঞেস করলো, আবু হুরায়রা, কাঁদছেন কেন?

জবাবে বললেন, শোন, আমি তোমাদের এই দুনিয়ার মায়ায় কাঁদছি না...

বরং আমি কাঁদছি সফরের দূরত্ব ও পাথেয়র স্বল্পতা দেখে...

আমি এমন এক পথের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি, যা আমাকে পৌঁছে দেবে জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে...

আর জানি না... এ দুয়ের কোনটাতে আমার জায়গা হবে!! সে সময় মারওয়ান ইবনুল হাকাম এলো তাকে দেখতে। সে এসে বললো, আবু হুরায়রা, আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বললেন, হে আল্লাহ! আমার কাছে তোমার সাক্ষাতই প্রিয়। সুতরাং তোমার কাছেও প্রীতিকর হোক আমার উপস্থিতি আর একটু শীঘ্র করো...

মারওয়ান যেতে না যেতেই তিনি ইহজীবন ত্যাগ করলেন...

* * *

আল্লাহ হযরত আবু হুরায়রা রাযি. কে রহম করুন– সীমাহীন রহমত। কারণ তিনি উম্মতে মুসলিমার জন্য সংরক্ষণ করে গেছেন এক হাজার ছয়'শ নয়টিরও বেশি হাদীছ।

আর তাকে ইসলাম ও মুসলমানদের তরফ থেকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

আহ্ওয়ায় বিজয়ী
হ্যরত সালামা ইবনে কায়স আলআশজায়ী রাযি.

আহওয়ায বিজয়ী
হযরত সালামা ইবনে কায়স আলআশজায়ী রাযি.

ফারুক সেই রাতটি কাটালেন নিদ্রাহীন, মদীনার বিভিন্ন মহল্লায় টহলরত অবস্থায়। যাতে মানুষ দু'চোখ বুজে নিরাপদে নিশ্চিন্তে ঘুমায়...ফারুক হাঁটছেন ঘর-বাড়ী আর বাজারের ভিতর দিয়ে। হাঁটছেন আর চিন্তা করছেন কাকে তিনি বাছাই করবেন; তেমন সাহসী তেমন প্রতিভাবান কে আছে রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে... যার হাতে পতাকা অর্পণ করা যায়, "আহওয়ায" জয়ের উদ্দেশ্যে যে বাহিনী যাচ্ছে– তাকে যে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম... তারপর হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন পেয়েছি...

হ্যাঁ তাকে আমি পেয়ে গেছি ইন্‌শাআল্লাহ... ভোরের আলো ফুটতেই তিনি সালামা ইবনে কায়স আল-আশজায়ীকে ডাকলেন এবং তাকে বললেন, আমি তোমাকে "আহওয়ায" গামী সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করেছি। সুতরাং আল্লাহর নামে যাত্রা করো এবং আল্লাহর পথে লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা অস্বীকার করে আল্লাহকে। আর যখন তোমরা মুশরিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হবে তখন তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম কবুল করে তো এরপর হয় তারা তাদের দেশেই থেকে যাবে, তোমাদের সঙ্গে যোগ দেবে না অন্য কোন যুদ্ধে...

এ অবস্থায় তাদের উপর শুধু যাকাত আবশ্যক হবে, আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদে তারা ভাগ পাবে না...

কিংবা তারা তোমাদের সাথে লড়াইয়ে যোগ দেবে... এ অবস্থায় জানের ঝুঁকি এবং গণীমতের মাল উভয়ের ক্ষেত্রেই তারা তোমাদের অংশীদার হবে। কিন্তু যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তোমরা তাদেরকে জিযিয়া প্রদানের প্রস্তাব দাও এবং তাদেরকে তাদের হালতে ছেড়ে দাও। আর তাদেরকে তাদের শত্রুদের কবল থেকে হেফাযত করো এবং তাদের সাধ্যবর্হিভূত কিছু তাদের উপর চাপিয়ো না...

যদি এতেও অমত করে তাহলে লড়াই করো। কারণ এ অবস্থায় আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের উপর জয়যুক্ত করবেন।

আর যদি তারা কোন দুর্গে আশ্রয় নেয় তারপর তোমাদের কাছে আবেদন করে যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালায় নেমে আসবে তাহলে তোমরা তাদের এ আবেদনে সাড়া দেবে না। কারণ তোমাদের জানা নেই, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা কী।

আর যদি তারা বলে যে, তারা নেমে আসবে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা পাবার প্রতিশ্রুতিতে তাহলে তোমরা তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি দিয়ো না; বরং তোমরা দাও তোমাদের নিজেদের তরফ থেকে নিরাপত্তার আশ্বাস। আর যখন তোমরা যুদ্ধে জয়লাভ করবে তখন খেয়াল রেখো, অপচয় করবে না, প্রতারণার আশ্রয় নেবে না। অঙ্গ বিকৃতি করবে না এবং কোন শিশু হত্যা করবে না...

সালামা বললেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য আমীরুল মুমিনীন ...

তখন হযরত উমর রাযি. তাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বিদায় জানালেন, তার দুই হাত শক্ত করে চেপে ধরলেন এবং বিনীত প্রার্থনায় তাকে আর্শীবাদ করলেন।

তিনি আসলে বোঝাতে চাইছিলেন, কী বিশাল (গুরু) দায়িত্ব তিনি তুলে দিয়েছেন তার ও তার সহযোদ্ধাদের কাঁধে।

কারণ "আহওয়ায" একটি দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল। তার দুর্গগুলিও তেমনি দুর্ভেদ্য, আর তা অবস্থিত বসরা ও পারস্যের সীমান্তবর্তী এলাকায়, যেখানে রয়েছে দুর্ধর্ষ কুর্দি জাতির বাস।

আর এই অঞ্চলটি জয় করা কিংবা তার নিয়ন্ত্রণ নেয়া ছাড়া মুসলমানদের কোন উপায় ছিলো না। বসরার উপর পারসিকদের আক্রমণ ঠেকাতেই এটা ছিলো দরকারি। তাছাড়া ওরা এই বসরাকে সৈন্য ঘাঁটি ও সমরাঙ্গন হিসেবেও ব্যবহার করে আসছিলো। ফলে ইরাকের নিরাপত্তা ছিলো হুমকির মুখে...

* * *

সালামা ইবনে কায়সের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে চলছিলো। কিন্তু আহওয়ায ভূ-খণ্ডে পা রাখতেই তারা এক বিপজ্জনক লড়াইয়ের সম্মুখীন হলেন তার বৈরী প্রকৃতির সাথে।

কারণ উচুঁ ভুমিতে তাদের সামনে উঁচু-নীচু কঠিন পাহাড়ি পথ, আর সমতলে এসে জমে থাকা পচা নোংরা কাদা জল...

এবং প্রতিমুহূর্ত তাদের মোকাবেলা করতে হচ্ছিলো বিষধর সাপ ও বিষাক্ত বিচ্ছুর উৎপাত।

কিন্তু সালামা ইবনে কায়সের বিশ্বাস উদ্দীপ্ত প্রাণ মুক্ত বিহঙ্গের মতো ঝটপটিয়ে উড়ে চলেছিলো গোটা বাহিনীর উপর...

ঐ দিনগুলোতে তিনি তাদের শোনাতেন এমন আশ্বাসবাণী, যা তাদের মনকে রাখতো প্রফুল্ল। আর তাদের রাতগুলোকে মুখরিত করে রাখতেন কুরআনের সুমধুর উচ্চারণে... ফলে দুঃখ-দূর্দশা ভুলে গিয়ে তারা হয়ে উঠতেন আরো উজ্জীবিত আরো প্রাণবন্ত...

* * *

হযরত সালামা ইবনে কায়স রাযি. খলিফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশ মতো সবকিছু করলেন। আহওয়াযবাসীদের সাথে সাক্ষাৎ হতেই তিনি তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষিত হওয়ার দাওয়াত দিলেন কিন্তু তারা অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে নিলো...

তখন তিনি তাদেরকে জিযয়া দেয়ার কথা বললেন। তারা একেও প্রত্যাখ্যান করলো এবং ঔদ্ধত্য দেখালো...

ফলে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া তাদের কোন উপায় থাকলো না এবং তারা তা করলেন; আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফযীলত ও তাঁর পক্ষ থেকে ছওয়াব প্রাপ্তির আশায়...

* * *

যুদ্ধ আরম্ভ হলো...

উত্তপ্ত রণাঙ্গন...

মুহুর্মুহু গর্জনে প্রকম্পিত প্রান্তর। দু'পক্ষই লড়ে যাচ্ছে প্রচণ্ড সাহসিকতায়... এবং এমনই বীরত্বের সাথে, ইতিহাসে যার নজির খুঁজে

পাওয়া ভার, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই রণাঙ্গন প্রত্যক্ষ করলো মুমিন মুজাহিদদের অনুকূলে এক অসাধারণ বিজয় আর আল্লাহর শত্রু মুশরিক বাহিনীর চরম লজ্জাজনক হার।

যুদ্ধের শোর স্তিমিত হলে হযরত সালামা ইবনে কায়স রাযি. প্রথমেই তার সৈনিকদের মাঝে গণীমত তাকসিমে মনোযোগ দিলেন। তখন যুদ্ধে পাওয়া ঐ সম্পদের মধ্যে একটি মূল্যবান আংটি তার নজরে পড়লো এবং তার ইচ্ছা হলো, এটি আমীরুল মুমিনীনকে উপহার দেবেন। আর তাই সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললেন, এই আংটি তোমাদের সকলের মাঝে ভাগ করে দিলে তেমন কিছুই কাজে আসবে না... তো তোমরা কি এতে রাজী আছো যে, এটাকে আমি আমীরুল মু'মিনীনের জন্য পাঠিয়ে দিই?

তারা বললো, হ্যাঁ, পাঠিয়ে দিন। আমরা খুশি। তখন তিনি সেটি একটি ছোট্ট বাক্সে ভরলেন এবং স্বগোত্রীয় আশজায়ী এক ব্যক্তিকে ডেকে এনে বললেন, তুমি ও তোমার গোলাম এক্ষুণি মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাও, মদীনায় পৌঁছে তোমরা আমীরুল মু'মিনীনকে বিজয়ের সুসংবাদ দেবে আর এই আংটি তাকে উপহার দেবে।

আশজায়ী ব্যক্তিটি হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের সঙ্গে দেখা করলে খুব শিক্ষণীয় একটি ব্যাপার ঘটে।

"আশজায়ী" বলেন ঃ আমি ও আমার গোলাম বসরায় এলাম। সেখানে আমরা সালামা ইবনে কায়সের দেয়া অর্থে দু'টো বাহন ক্রয় করলাম, সঙ্গে কিছু খাবার ও দরকারি জিনিসও নিয়ে নিলাম। তারপর মদীনা অভিমুখে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

মদীনায় পৌঁছানোর পর আমীরুল মু'মিনীনকে খোঁজ করলাম। আমি যখন তাকে পেলাম তখন তিনি মুসলমানদের খাওয়ানোয় ব্যস্ত। একটি লাঠির উপর ভর করে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ঠিক যেমনটি করে রাখাল...। তিনি খাবারের পাত্রগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটছেন আর তার খাদেম ইয়ারফাকে বলছেন, ইয়ারফা! এদেরকে একটু গোশত দাও! ইয়ারফা। এদেরকে আরো রুটি দাও... ইয়ারফা, এদেরকে আরেকটু ঝোল দাও...

আমি যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম; বললেন, বসে পড়ো। তখন কাছাকাছি যারা রয়েছে তাদের সঙ্গে বসে গেলাম এবং আমার জন্যও খাবার আনা হলো, আমি খেয়ে নিলাম।

সবার খাওয়া যখন শেষ হলো, তখন তিনি বললেন, ওহে ইয়ারফা! তোমার বাসনগুলো ওঠাও। তারপর তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমিও তার পিছে পিছে গেলাম।

তিনি যখন তার গৃহে প্রবেশ করলেন আমি ভিতরে যাবার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখি, তিনি বসেছেন একটি পশমি চটের উপর। হেলান দিয়েছেন খেজুর গাছের আঁশ দিয়ে তৈরি দু'টি চামড়ার বালিশে... তার একটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি তাতে বসলাম। আমি স্থির হয়ে বসার পর দেখতে পেলাম তার পিছনে ঝুলছে একটি পর্দা এবং তিনি পর্দার দিকে ফিরে আওয়াজ দিলেন : হে কুলসুমের মা, আমাদের নাস্তা...

মনে মনে বললাম,

না জানি কী খাবার রেখেছেন আমীরুল মু'মিনীন তার নিজের জন্য!! কিন্তু তার খাবার হিসেবে যা এলো তা হচ্ছে একটি রুটি, সঙ্গে তেল আর সামান্য লবণ, যা গুঁড়া করা হয়নি ...

আমার দিকে ফিরে তিনি বললেন, খাও, আমি তার হুকুম পালনার্থে অল্প একটু খেলাম। তিনিও খেলেন এবং এত তৃপ্তির সাথে যে, আমি এর চেয়ে ভালো খেতে আর কাউকেই দেখিনি।

তারপর বললেন, আমাদের পান করাও... তখন তারা একটি পেয়ালায় করে নিয়ে এলো যবের ছাতুর শরবত। তিনি বললেন, আগে ওকে দাও তারপর আমাকে... আমি পেয়ালাটা নিয়ে সামান্য একটু পান করলাম। কারণ এর আগে দস্তরখানে যে ছাতু খেয়েছি সেটা ছিলো আরো উন্নত এবং সুস্বাদু। আমার পর তিনি পান করলেন পেয়ালা থেকে এবং তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত খেলেন। তারপর বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের আহার যুগিয়েছেন এবং পানাহারে পরিতৃপ্ত করেছেন। এই পর্যায়ে আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আমি আপনার কাছে একটি বার্তা নিয়ে এসেছি হে আমীরুল মু'মিনীন!

তিনি বললেন, কোত্থেকে?

আমি বললাম, সালামা ইবনে কায়সের পক্ষ থেকে। একথা শুনে তিনি বললেন, মারহাবা সালামা ইবনে কায়সকে, মারহাবা তার বার্তাবাহককে... মুসলিম বাহিনীর খবর কী, বলো...

আমি বললাম, যেমনটি আপনি কামনা করেন... নিরাপত্তা এবং আল্লাহর দুশমনদের উপরে বিজয়। মোটকথা আমি তাকে বিজয়ের সুসংবাদ দিলাম এবং সৈনিকদের অবস্থা বিস্তারিত জানালাম। সব শুনে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ... সবই তাঁর দয়া, তাঁর দান। বান্দাকে তিনি দেন এবং অনেক বেশি পরিমাণে দেন...

তারপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বসরা হয়ে এসেছো?

আমি বললাম, হ্যাঁ আমীরুল মুমিনীন।

তিনি বললেন, মুসলমানরা ওখানে কেমন আছে?

বললাম, আল্লাহর রহমতে ভালো।

আবার জিজ্ঞেস করলেন, জিনিসপত্রের দাম কেমন? বললাম, ওদের ওখানে জিনিসের দাম সবচাইতে সস্তা ।

এরপর বললেন, গোশত কেমন? কারণ গোশতই আরবদের সবজি আর সবজি ছাড়া আরবের স্বাস্থ্য রক্ষা হয় না। আমি বললাম, গোশত প্রচুর, অভাব নেই।

এতক্ষণে তার দৃষ্টি পড়লো আমার সঙ্গের বাক্সটির ওপর। বললেন, তোমার হাতে ওটা কী?

আমি বর্ণনা দিতে আরম্ভ করলাম আল্লাহ যখন আমাদেরকে শত্রুবাহিনীর উপর বিজয়ী করলেন তখন আমরা গণীমতের সামগ্রী যা পেয়েছি একত্র করলাম। সালামা দেখলেন তার মধ্যে একটি দামী আংটি রয়েছে। তখন সৈনিকদের লক্ষ্য করে বললেন, এটা যদি তোমাদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়; পরিমাণে তা খুব বেশি হবে না... তো আমি যদি এটা আমিরুল মু'মিনীনের জন্য পাঠিয়ে দেই তোমরা তাতে রাজী আছো? তারা উত্তর করলো, হ্যাঁ।

এরপর আমি সেই বাক্সটি তার হাতে দিলাম...বাক্সটা খোলার পর যখন তিনি আংটির গায়ে বসানো লাল, হলুদ, সবুজ চুনিগুলোর দিকে

নজর করলেন; অমনি বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন এবং হাতটা কোমরের কাছে নিয়ে আংটি সমেত বাক্স মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। ফলে তার ভিতরে যা ছিলো সব...এদিক ওদিক ছিঁটকে পড়লো। এ অবস্থা দেখে ঘরের মহিলারা ভাবলো, আমি বুঝি তার গুপ্ত হত্যার মতলব করছি... তারা পর্দার কাছে দৌড়ে এলো... এ পর্যায়ে তিনি আমার মুখো মুখি হয়ে বললেন, ওগুলো একত্রিত করো... আর তার খাদেম ইয়ারফাকে বললেন, ওকে শক্ত করে পেটাও...

আমি চুনিগুলো কুড়াতে লাগলাম আর ইয়ারফা আমাকে পেটাতে থাকলো। কুড়ানো শেষ হলে বললেন, যাও, তোমরা কেউ প্রশংসার যোগ্য নও, না তুমি আর না যে তোমাকে পাঠিয়েছে।

আমি আরয করলাম, আমাকে একটি বাহনের অনুমতি দিন, যা আমাকে ও আমার সহচরটিকে আহওয়ায পর্যন্ত নিয়ে যাবে। কারণ আমার বাহনটি আপনার খাদেম নিয়ে গেছে।

তিনি ইয়ারফাকে আদেশ দিয়ে বললেন, একে এবং এর খাদেমকে সদকার উট থেকে দু'টো বাহন দাও।

এরপর আমাকে বললেন, তোমার প্রয়োজন শেষ হওয়ার পর যদি এমন কাউকে পাও ও দু'টো যার তোমার চেয়েও বেশি দরকার তাহলে তাকে দিয়ে দিও।

আমি বললাম, তাই করবো আমীরুল মু'মিনীন... হ্যাঁ, তাই করবো ইন্‌শাআল্লাহ। শেষবারের মতো আমার দিকে ফিরে বললেন, জেনে রেখো আল্লাহর কসম। সৈনিকরা বিচ্ছিন্ন হবার আগে আগে যদি এই অলঙ্কার তাদের মাঝে বণ্টন করতে না পারো তাহলে তোমার ও তোমার প্রেরকের সঙ্গে কোমর ভাঙ্গা (খুবই নির্দয় ও বেদনাদায়ক) আচরণ করবো।

আমি তীরবেগে ছুটলাম এবং সালামার কাছে পৌঁছে তাকে বললাম, তুমি যে কাজের জন্য আমাকে নির্বাচন করেছো আল্লাহ তাতে কোন বরকত রাখেননি... এই অলঙ্কার সৈনিকদের মাঝে ভাগ করে দাও আমার ও তোমার উপর দুর্যোগ নেমে আসার আগে। আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বললাম... সে তৎক্ষণাত ঐ মজলিসে সকলের মাঝে সেটি বণ্টন করে দিলো।

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.

أَعْلَمُ أُمَّتِيْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ

مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

– محمد رسول الله

'হালাল-হারাম এর বিষয়ে
আমার উম্মতের
সবচে' জ্ঞানী ব্যক্তি
মু'আয ইবনে জাবাল।
–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি.

হক ও হেদায়েতের আলোয় গোটা জাযিরাতুল আরব যখন উদ্ভাসিত, ইয়াছরিবের মু'আয ইবনে জাবাল তখন সদ্যোজাত তরুণ...

প্রখর মেধা, তুখোর বুদ্ধি আর ভাষার মাধুর্য ও উঁচু মন-মানসিকতায় তার বয়েসী আর সব ছেলেদের থেকে ভিন্ন। তার ওপর সে দেখতে সুন্দর, উজ্জ্বল ফর্সা ত্বক, কাজল কালো দু'চোখ, কোকড়ানো চুল, শুভ্র দাঁতের পাটি... ভারি একহারা চেহারা। যে দেখে সেই চেয়ে থাকে এবং একবার দেখলে সহজে ভোলা যায় না। তরুণ মু'আয মুসলমান হন মক্কার মুবাল্লিগ হযরত মুস'আব ইবনে উমায়র রাযি.-এর হাতে। আর 'আকাবার রাতে তার প্রসারিত তপ্ত হাত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পবিত্র হাত ছুঁয়ে বাইয়াত গ্রহণ করে... হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর বাইয়াতে ধন্য হতে বাহাত্তর জনের যে দলটি সেদিন মক্কায় এসেছিলো– মু'আযও ছিলেন তাদের মধ্যে। যাদের আগমন ছিলো এক অনবদ্য ইতিহাসের সূচনা, যাদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে মানবেতিহাসে লেখা হয় এক জীবন্ত জাতির অভিযাত্রা...

* * *

মদীনায় ফিরে হযরত মু'আয ও তার অল্পকজন বন্ধু মিলে একটি দল গঠন করলেন। যাদের লক্ষ্য, মূর্তি ভাঙ্গা এবং ইয়াছরিবে মুশরিকদের ঘরে যত মূর্তি আছে সেগুলোকে গোপনে বা প্রকাশ্যে সরিয়ে ফেলা...। এই নবীন সংঘের প্রচেষ্টার ফল হলো খুবই ইতিবাচক। যার মধ্যে সবচে' উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ইয়াছরিবের এক গণ্যমান্য ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণ। সে হলো হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাযি.।

* * *

হযরত আমর ইবনুল জামূহ রাযি. ছিলেন বনূ সালামার অন্যতম সর্দার ও তার শরীফ লোকদের অন্তর্গত। সে নিজের জন্য দামী কাঠ দিয়ে একটি মূর্তি তৈরি করেছিলো, যেমনটি তখনকার শরীফ লোকেরা করতো। বনূ

সালামার এই ভদ্রলোক অতিমাত্রায় প্রতিমাভক্ত ছিলো। নিজের গড়া এই মূর্তিটিকে সে খুব তা'জীম করতো। তাকে রেশমী কাপড় পরাতো আর প্রতিদিন সকালে সুগন্ধি মেখে দিতো।

তরুণ ছেলেগুলো তাকে পথে আনতে একটা মজার কাণ্ড ঘটালো। রাত একটু গভীর হলে তারা একত্রিত হলো তার মূর্তি রাখার স্থানে এবং মূর্তিটিকে সেখান থেকে সরিয়ে বনূ সালামার মহল্লার পিছনে নিয়ে ফেলে দিলো একটি আবর্জনা ফেলার গর্তে...। জনাব সকালে উঠে মূর্তি না পেয়ে সব জায়গায় তালাশ করলো। শেষ তাকে পেলো ময়লার গর্তে নিমজ্জমান অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে... তখন সে বললো, তোমরা ধ্বংস হও। কে করলো আমাদের প্রভুর এই দুর্গতি। তারপর সে তাকে তুলে এনে পাকসাফ করলো, খোশবু মাখলো এবং আগের জায়গায় নিয়ে রাখলো। আর তাকে সম্বোধন করে বললো, হে "মানাত" কসম খোদার! যদি আমি জানতাম কে করেছে তোমার সাথে এ আচরণ। তবে অবশ্যই তাকে অপদস্থ করতাম...

এরপর যখন সন্ধ্যা হলো এবং সে ঘুমিয়ে পড়লো– তরুণেরা চুপি চুপি তার মূর্তির কাছে গেলো এবং আগের রাতে যা করেছে তার সাথে আজও তাই করলো...

যথারীতি সেও তাকে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পেলো ওরকম একটি গর্তে... তারপর তুলে এনে ভালো করে ধুয়ে আতর খোশবু মেখে দিলো তার গায়ে। আর এইবার আরো কঠিনভাবে সর্তক করে দিলো, যারা তার অবমাননা করেছে তাদেরকে। কিন্তু তারপরও যখন এই ধৃষ্টতা বন্ধ না হয়ে বারবার ঘটে চললো একই ঘটনা, তখন সে তাকে তুলে আনলো যেখানে ফেলা হয়েছিলো সেখান থেকে এবং গোসল করালো... তারপর একটি তরবারি এনে তার গলায় লটকে দিয়ে বললো, আল্লাহর কসম! আমি জানি না, কে তোমার সাথে এই আচরণ করছে, যা তুমি দেখছো...

তো হে 'মানাত'! তোমার মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে তাহলে তুমি নিজেকে রক্ষা করো...

আর এই তলোয়ার তোমার সাথে রইলো... এরপর রাতে সে যখন ঘুমিয়ে পড়লো, তরুণেরা মূর্তির উপর হামলা করে তার গলায় ঝুলানো

তলোয়ারটি ছিনিয়ে নিলো... আর তাকে একটি মৃত কুকুরের গলার সঙ্গে বেঁধে ঐ গর্তগুলোর একটার মধ্যে নিক্ষেপ করলো। সকালে উঠে বৃদ্ধ তার মূর্তিটি খুব করে খুঁজলো। অবশেষে তাকে পেলো ময়লা আবর্জনার মধ্যে মরা কুকুরের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় উল্টো করে ফেলা রয়েছে... এ বিশ্রী দৃশ্য দেখে সে আবৃত্তি করলো– কসম খোদার, যদি তুমি উপাস্য হতে, তবে একটি কুত্তা আর তুমি থাকতে না কূপের মাঝে এক বন্ধনে। তারপর বনূ সালামার এই শায়খ ইসলাম কবুল করলেন এবং হলেন সত্যিকার মুসলমান।

* * *

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন তখন তরুণ মু'আয ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে থাকলেন। তার কাছ থেকে কুরআন শিখলেন এবং ইসলামী বিধিবিধানের জ্ঞান অর্জন করলেন। এভাবে তিনি হয়ে উঠলেন– ছাহাবীদের মধ্যে কুরআনের সবচেয়ে বড় কারী এবং শরীয়তের বিষয়ে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী...

ইয়াযিদ ইবনে কুতায়ব বর্ণনা করেন, আমি 'হিমসের' মসজিদে প্রবেশ করলাম। আর দেখি যে, এক তরুণ, মাথায় কোকড়ানো চুল, তার চারপাশে জড়ো হয়েছে অনেক মানুষ.. যখন সে কথা বলছে যেন তার মুখ থেকে ঝরে পড়ছে মুক্তো আর অজস্র আলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম: এ কে?! তারা বললো, মু'আয ইবনে জাবাল।

* * *

আবু মুসলিম আলখওলানী বর্ণনা করেন, আমি দামেস্কের মসজিদে এলাম। দেখি, এক মজমা, যেখানে রয়েছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবীণ ছাহাবীদের এক জামাত, তাদের মধ্যে রয়েছে এক যুবক-সুরমা কালো চোখ, শুভ্র উজ্জ্বল দাঁত। যখনই কোনো বিষয়ে তাদের মতানৈক্য হচ্ছে তারা ঐ যুবকের শরাণাপন্ন হচ্ছে; আমি আমার পাশে বসা এক লোককে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে?! সে বললো, মুআ'য ইবনে জাবাল।

আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কারণ মু'আয মাদ্‌রাসায়ে মুহাম্মাদীতে নাম লিখিয়েছেন খুব অল্প বয়সে এবং বেড়ে উঠেছেন রাসূলের পুণ্যময় সাহচর্যে। তাই ইলমের সুমিষ্ট পানীয় তিনি পান করেছেন নবুওয়তের অনিঃশেষ ঝর্ণা থেকে এবং জ্ঞানকে আহরণ করেছেন তার আদি উৎস থেকে... ফলে তিনি হয়েছেন আদর্শ শিক্ষকের আদর্শ ছাত্র।

আর সনদ হিসেবে মু'আযের এ-ই যথেষ্ট যে, তার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। "হালাল-হারামের বিষয়ে আমার উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হলো মু'আয ইবনে জাবাল..."

আর উম্মতে মুহাম্মদীর উপর তার যে অনুগ্রহ রয়েছে তা বোঝার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তিনি ছিলেন সেই ছয়জনের একজন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যামানায় কুরআন (লিপিবদ্ধ) জমা করেছেন।

এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ছাহাবীগণ যখন কোন বিষয়ে আলোচনা করতেন আর তাদের মধ্যে মু'আয উপস্থিত থাকতেন; তখন সকলে তার দিকে তাকাতো সমীহপূর্ণ দৃষ্টিতে, তার ইলমের সম্মানে ও তার ব্যক্তিত্বের কারণে।

* * *

স্বভাবতঃই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী দুই খলীফা এই বিরল জ্ঞানশক্তিটিকে নিয়োজিত করেছিলেন ইসলাম ও মুসলমানদের সেবায়।

মক্কা বিজয়ের পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, সমগ্র কুরায়শ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে। তিনি অনুভব করলেন, নওমুসলিমদের প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক, যে তাদের ইসলাম শিক্ষা দেবে এবং শরীয়তের জ্ঞান দান করবে। সুতরাং মক্কায় তার প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন আত্তাব ইবনে উসায়দকে। আর মু'আযকে রেখে দিলেন নিজের সঙ্গে। যেন তিনি মানুষকে শেখাতে পারেন কুরআন এবং তাদেরকে পারদর্শী করে তুলেন আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে।

* * *

ইয়ামান রাজাদের (প্রেরিত) দূতদল যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিজেদের ও সে অঞ্চলের অন্য সবার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো এবং রাসূলের কাছে আবেদন করলো– তাদের সঙ্গে এমন কাউকে পাঠানোর, যে তাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেবে; তখন এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাঁর দাঈ ও রাহনুমা ছাহাবীদের কয়েকজনকে তলব করলেন। আর তাদের আমীর নিযুক্ত করলেন মু'আয ইবনে জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে।

আলোর পথের দিশারী এই প্রতিনিধিদের বিদায় দিতে নবীজী স্বয়ং বের হলেন... এবং পায়ে হেঁটে চললেন মু'আযের বাহনের পাশাপাশি... মু'আয তখন আরোহী... রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক্ষণ এভাবে হাঁটলেন। যেন তিনি চাইছিলেন, মু'আয তার পাশে থাকুক আরো কিছুটা সময়.. বিদায়ের আগ মুহূর্তে নবীজী তাকে কিছু অসীয়ত করলেন (সেই ঐতিহাসিক অসীয়ত, ইসলামী আইনের যা অমূল্য সম্পদ...) শুরু করলেন এভাবে– 'মু'আয, এ বছরের পর হয়ত আমার সাথে তোমার দেখা হবে না... হয়তবা তুমি অতিক্রম করবে আমার মসজিদের পাশ দিয়ে আমার কবরের ওপর দিয়ে.... একথা শুনে মু'আয কেঁদে ফেললেন তাঁর প্রিয় ও প্রাণের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিচ্ছেদ যাতনায়...তার সাথে অন্যরাও কাঁদলো।

* * *

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হলো। মু'আযের দু'চোখ আর পেলো না প্রিয় নবীর সাক্ষাৎ ঐ মুহূর্তটির পর...

কারণ হযরত মু'আয রাযি. ইয়ামান থেকে ফেরার আগেই তিনি ইহজীবন ত্যাগ করেন...। হযরত মু'আয রাযি. নিশ্চয়ই খুব কেঁদেছেন যখন ফিরে এসে দেখেন, ইয়াছরিব শূন্য পড়ে আছে, তার প্রিয়তম রাসূলের সংস্পর্শ সেখানে নেই!

* * *

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর খিলাফতকাল। খলীফা মু'আযকে প্রেরণ করলেন বনূ কিলাবের কাছে তাদের মাঝে তাদের অনুদান বণ্টন ও সাদাকা বিতরণের জন্যে। হযরত মু'আয রাযি. নিষ্ঠার সাথে তার কর্তব্য পালন করলেন এবং স্ত্রীর কাছে ফিরে এলেন কেবল নিজের সেই চাদরটি সঙ্গে করে, যেটা বেরোনোর সময় তার কাঁধে ছিলো। স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করলো, গর্ভনরেরা তাদের পরিবারের জন্য যে সব উপঢৌকন নিয়ে আসছে, যেগুলো তোমার হাত হয়েই এলো তাতে তোমার ভাগ কই?!

তিনি উত্তর দিলেন, আমার সঙ্গে একজন সতর্ক পর্যবেক্ষক ছিলো, যে সবকিছু হিসাব রাখছিলো। পর্যবেক্ষক দ্বারা তার উদ্দেশ্য, আল্লাহ তা'আলা। একথা শুনে সে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এবং হযরত আবু বকরের কাছে পর্যন্ত তুমি বিশ্বস্ত ছিলে, আর এখন হযরত উমর এসে তোমার সঙ্গে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছেন, যে তোমার সবকিছু হিসাব রাখে?!

একথাটা সে উমরের স্ত্রী-কন্যাদের কাছে পৌঁছে দিলো এবং উমরের নামে তাদের কাছে নালিশ জানালো... উমরের কাছে এ খবর পৌঁছার পর তিনি মু'আযকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আমি নাকি তোমার সঙ্গে তোমার নজরদারির জন্য লোক পাঠিয়েছি? হযরত মু'আয রাযি. বললেন, না, হে আমীরুল মু'মিনীন। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে তাকে বোঝাবার জন্য আর কিছু খুঁজে পাইনি ঐ কথা বলা ছাড়া...

একথা শুনে হযরত উমর (রা.) হেসে ফেললেন। আর একটা জিনিস তার হাতে দিয়ে বললেন, যাও 'স্ত্রীকে খুশি করো'...

* * *

হযরত উমর ফারুক রাযি.-এর যামানায় শামের গর্ভনর ইয়াযিদ ইবনে আবি সুফয়ান তার কাছে পত্র লিখলো ঃ

হে আমীরুল মুমিনীন! শামের অধিবাসীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। শহরগুলো মানুষে ভর্তি... তাদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এমন ব্যক্তির, যে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেবে এবং দ্বীন সম্পর্কে অবহিত

করবে। অতএব হে আমীরুল মু'মিনীন! তাদের তা'লীমের জন্য কিছু লোক দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন...। তখন হযরত উমর রাযি. ঐ পাঁচজনকে স্মরণ করলেন, যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে কুরআন সংকলন করেছেন।

এরা হলেন, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাদা ইবনে সামেত, আবু আইয়ূব আল আনসারী, উবাই ইবনে কা'ব ও আবুদ্ দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহুম।

হযরত উমর রাযি. তাদেরকে বললেন, শাম থেকে তোমাদের ভাইয়েরা আমার কাছে আবেদন করেছে, তাদেরকে এমন কিছু মানুষ দিয়ে সাহায্য করতে যারা তাদেরকে কুরআন শেখাবে এবং দ্বীন বোঝাবে। সুতরাং তোমরা আমাকে সহযোগিতা করো– আল্লাহ তোমাদের দয়া করুন– তোমাদের মধ্য থেকে যে কোন তিনজনকে দিয়ে। যদি তোমরা চাও তো লটারি করো আর না হয় আমিই নির্বাচন করবো তোমাদের থেকে তিনজন।

তারা বললেন, লটারি কেন করতে হবে?...

আবু আইয়ূব, তিনি তো বয়োবৃদ্ধ। আর উবাই অসুস্থ মানুষ। থাকলাম আমরা তিনজন। হযরত উমর রাযি. বললেন, আচ্ছা, তাহলে তোমরা "হিমস" থেকে আরম্ভ করবে। যখন দেখবে তাদের অবস্থা সন্তোষজনক তখন তোমাদের একজনকে সেখানে রেখে বাকি দু'জনের একজন যাবে "দামেস্ক' আরেকজন "ফিলিস্তীন"।

ফারুকের নির্দেশ মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিন সাহাবী হিমসে তাদের দায়িত্ব পালন করলেন। তারপর তারা সেখানে রেখে গেলেন উবাদা ইবনে সামেতকে, আর আবুদ দারদা গেলেন দামেস্কে, মু'আয ইবনে জাবাল ফিলিস্তীন...।

* * *

আর এখানেই হযরত মু'আয রাযি. মহামারিতে আক্রান্ত হলেন। যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হলো; তিনি কিবলামুখী হলেন, আর এ লাইন কয়টি আওড়াতে লাগলেন–

مَرْحَبًا بِالْمَوْتِ مَرْحَبًا ...

زَائِرٌ جَاءَ بَعْدَ غِيَاب ...

وَحَبِيْبٌ وَفَدَ عَلَى شَوْقٍ ...

অভিনন্দন মৃত্যুকে অভিনন্দন... মেহমান সে যে এসেছে অনেক দিন পর... এসেছে প্রিয় অধীর অপেক্ষার পর...

তারপর আকাশের দিকে চেয়ে বললেন,

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أُحِبَّ الدُّنْيَا وَطُوْلَ الْبَقَاءِ فِيْهَا لِغَرْسِ الْأَشْجَارِ، وَجَرْيِ الْأَنْهَارِ

وَلٰكِنْ لِظَمَأِ الْهَوَاجِرِ، ومكابدة السَّاعَتِ، وَمَزَاحَمَةِ الْعُلَمَاءِ بِالرُّكَب عِنْدَ حَلَقِ الذِّكْرِ ...

اَللّٰهُمَّ فَتَقَبَّلْ نَفْسِيْ بِخَيْرِ مَا تَقَبَّلُ بِهٖ نَفْسًا مُؤْمِنَةً

হে আল্লাহ তুমি তো জানতে, আমি দুনিয়াকে ভালোবাসিনি। আমি চাইনি এখানে দীর্ঘ সময় থাকতে– শুধু বৃক্ষরোপন কিংবা খালখননের উদ্দেশ্যে... বরং মধ্যাহ্নের তৃষ্ণা, অবিরাম মুজাহাদা আর যিকিরের হালকায় ওলামাদের ভিড়ে হাঁটু গেড়ে বসা– শুধু এসবের জন্যে... তুমি তো জানতে একথা। তাহলে হে আল্লাহ! আমাকে তুমি গ্রহণ করো। যতটা সুন্দরভাবে তোমার কাছে গৃহীত হয় কোন মু'মিনের আত্মা...

তার কথা শেষ হলো এবং থেমে গেলো হৃৎস্পন্দন।

তিনি প্রাণ ত্যাগ করলেন স্বজন-পরিজন থেকে বহু দূর এক দেশে... আল্লাহর রাস্তায় হিজরতরত অবস্থায়, আল্লাহ পথের দাঈ হিসেবে...।

ইয়াসির পরিবার

ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার

صَبْرًا اٰلَ "يَاسِر" فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةَ

– صدق رسول الله

ধৈর্য ধরো ইয়াসির পরিবার নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাত।

–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

ইয়াসির পরিবার
ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মার

এক শিশির ধোয়া সকালে...

এক সুরভিত সুন্দর প্রভাতে ইয়ামান থেকে আগত এক কাফেলা এসে পৌঁছলো মক্কা উপত্যকার কাছে। ইয়াসির ইবনে আমের আলকিনানী উপর থেকে তাকালো পবিত্র মক্কার দিকে। আর তখনই তাকে অভিভূত করলো কা'বার যাদুকরী প্রভা... সে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকলো আর আনন্দে উচ্ছলিত হলো তার প্রাণ...

কারণ জীবনে এই প্রথম তার দু'চোখ লাভ করলো পবিত্র কা'বার দর্শন।

*　　*　　*

ইয়াসির-এর মক্কায় আগমন ব্যবসার উদ্দেশ্যে ছিলো না, অন্য বাণিজ্য কাফেলাগুলো যেমন আসতো। বরং সে ও তার দুই ভাই- হারেছ ও মালেক এসেছিলো তাদের এক হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজতে, কয়েক বছর ধরে যার কোন সন্ধান পাচ্ছিলো না।

*　　*　　*

তিন তরুণ সমস্ত জায়গায় তাদের ভাইকে খোঁজ করলো এবং যেখানে যাকে পেলো তার কথা জিজ্ঞেস করলো...

অবশেষে যখন তাকে পাবার আর কোন আশা রইলো না, তখন তাদের রোখ ভিন্ন হয়ে গেলো...

হারেছ ও মালেক ফিরে এলো ইয়ামানে তাদের আবাসভূমিতে, শৈশবের চিরচেনা মাঠ ও ফল-ফসলের মাঝে।

আর ইয়াসির, মক্কা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো নিজের দিকে এবং তাকে অনুপ্রাণিত করলো এখানে বসত করে স্থায়ী হয়ে যেতে।

*　　*　　*

ইয়াসির ইবনে আমের আল কিনানী যখন মক্কাকে তার আবাস বানায় তখন জানতো না, কী সম্মান তার জন্য লেখা হয়ে গেছে... সে বুঝতেও পারেনি যে, ইতিহাসের মধ্যে সে প্রবেশ করেছে তার প্রশস্ততম দরোজা দিয়ে... এবং অচিরেই তার ঔরসে আসছে এমন এক তরুণ, গোটা পৃথিবীর জন্য যে হবে দৃষ্টিনন্দন এক অনন্য শোভা।

তবে মক্কায় ইয়াসিরের কোন জ্ঞাতিগোষ্ঠী বা আত্মীয় ছিলো না, যে তাকে আশ্রয় দেবে এবং এমন কোন পরিবারও নয়, যারা বিপদে তার পাশে দাঁড়াবে...

অতএব তার মতো ভিনদেশীর একমাত্র উপায়, এখানকার কোন গোত্রপ্রধানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়া, যাতে নিরাপদে নিশ্চিন্ত জীবন-যাপন করতে পারে– সেই সমাজে যেখানে দুর্বলের কোন স্থান নেই। সুতরাং আবু হুযায়ফা ইবনে মুগীরা আল মাখযুমীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েই সে এ সমাজে নিজের জায়গা করে নিলো।

* * *

ইয়াসিরের মার্জিত ব্যবহার ও অভিজাত গুণাবলী অল্প দিনেই তাকে আবু হুযায়ফার কাছে প্রিয় করে তুললো। ফলে সে সুমাইয়া বিনতে খিবাত নাম্নী তার এক দাসীকে ইয়াসিরের সঙ্গে বিবাহ দিলো। এই বিবাহের ফসল হিসেবে জন্ম নিলো এমন এক পুত্র সন্তান, যাকে পেয়ে দু'জনেই ভীষণ খুশি হলো...

তারা তার নাম রাখলো আম্মার। তাদের এই আনন্দ আরো বেড়ে গেলো যখন আবু হুযায়ফা ছেলেটিকে দাসত্বমুক্ত করে স্বাধীন ঘোষণা করলো।

* * *

বনূ মাখযুমের আশ্রয়ে এই পরিবার সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলো। এভাবে অনেক দিন কেটে গেলো। অনেকগুলো বছর পার হলো। ইয়াসির-সুমাইয়ারও বয়স বেড়ে চললো, আর দেখতে দেখতে আম্মার হয়ে উঠলো টগবগে জোয়ান...

তারপর পৃথিবী তার রবের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হলো এবং মক্কা উপত্যকা থেকে উৎসারিত হলো এমন এক আলো, যা গোটা জগতকে আচ্ছন্ন করলো পূণ্য ও পবিত্রতায়... আর ন্যায় ও সততায় তাকে করলো পরিপূর্ণ। কারণ নবীয়ে উম্মী প্রকাশ্যে প্রচার করতে শুরু করেছেন তার প্রভুর প্রত্যাদেশ... তিনি তার কওমকে ভয় ও আশার কথা শোনাচ্ছেন।

তাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন এমন এক জীবনের, যাতে রয়েছে দুনিয়া আখেরাতের সৌভাগ্য ও সম্মান...

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির লোকমুখে শুনতে পেলো এই নতুন দাওয়াতের খবর, তখন সে উন্মুক্ত করলো তার কর্ণ, মস্তিষ্ক ও হৃদয়... কিন্তু যখন সে দেখলো, এ সম্পর্কে তার কাছে যা পৌঁছছে তা খুবই সামান্য এবং এত বিক্ষিপ্ত যে, তার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম নয়... তখন সে মনে মনে বললো, ধিক তোমাকে হে আম্মার কেন তুমি নিজের তৃষ্ণা বৃদ্ধি করছো অথচ পানীয়-এর উৎস তোমার নাগালে?! এসো ছাহেবে রিসালাতের কাছে... এসো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর কাছে; কারণ তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের কাছেই রয়েছে নিশ্চিত খবর...

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির তৎক্ষণাত রওয়ানা হলো দারুল আরকামের উদ্দেশে... সেখানে গিয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাক্ষাৎ লাভ করলো এবং তাঁর এমন কিছু কথা শুনলো যা তার হৃদয়কে প্রচণ্ড নাড়া দিলো... এবং তাঁর আদর্শকে এমনভাবে উপলব্ধি করলো, যা তার অন্তরকে ভরে দিলো প্রজ্ঞা ও আলোকমালায়... সুতরাং সেই মুহূর্তে সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো :

أَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

* * *

আম্মার ইবনে ইয়াসির তার মা সুমাইয়ার কাছে গিয়ে তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলো। তখন সে এত দ্রুত তাতে সাড়া দিলো, যেন এ বিষয়ে

তার কোন পূর্বপ্রতিশ্রুতি ছিলো... তারপর সে তার বাবা ইয়াসির-এর কাছে গেলো, এবং তাকেও একই ভাষায় দাওয়াত দিলো... যথারীতি তিনিও ইসলাম কবুল করলেন। ফলে এই বরকতময় পরিবারের ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আলোর শোভাযাত্রায় শামিল হলো আরো তিনটি নক্ষত্র, যাদের আলো আজো পর্যন্ত আচ্ছন্ন করছে কোটি মুমিনের হৃদয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায়– করতেই থাকবে যতোদিন না আল্লাহ্ এই পৃথিবী ও তার সবকিছুকে শেষ করে দেন ।

* * *

তিন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের খবর উল্কার বেগে বনূ মাখযুমের কানে পৌঁছলো এরা মুসলমান হয়ে গেছে এ কথা শুনতেই তারা তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলো। আক্রোশে যেন ফেটে পড়লো...

তারা কসম খেয়ে বসলো, হয় ওদেরকে ইসলাম থেকে ফেরাবে না হয় ওদেরকে পিষে ফেলবে... ইসলাম থেকে তো তাদের টলাতে পারলো না তাই শুরু হলো অত্যাচার। নির্যাতনের সেই চিত্র বড় করুণ। তারা এই তরুণ ও তার মা-বাবাকে নিয়ে যেতো মক্কার মরুপ্রান্তরে। তাদের গায়ে চাপিয়ে দিতো লোহার ভারী বর্ম এবং সূর্যের তাপে ঝলসে দিতো শরীর... ওরা পালাক্রমে এদেরকে মারতো, মারতে মারতে কাহিল করে ফেলতো, কিন্তু পানি চাইলে পানি দিতো না।...

এক পর্যায়ে যখন কণ্ঠনালী শুকিয়ে যেতো, শিরাগুলো জমে যেতো আর চামড়া ফেটে প্রবলবেগে বইতো রক্তস্রোত তখন সেদিনকার মতো তাদেরকে ছেড়ে দিতো, যেন পরের দিন আবার তারা প্রস্তুত হয় সাজা ভোগের জন্য।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদেরকে ঐভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে...

কিন্তু রাসূল তাদেরকে কোন রকম সাহায্য করতে পারছেন না দেখে খুবই মর্মাহত হলেন। তাই তাদের সামনে গিয়ে বললেন, ধৈর্য ধরো ইয়াসির পরিবার! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিশ্রুতি জান্নাত।

প্রিয় রাসূলের এই সান্ত্বনা শুনে নিপীড়িত প্রাণগুলো শান্ত হলো।

বিস্ফারিত চোখগুলো শীতল হলো এবং তৃপ্তির এক হাসি ছড়িয়ে পড়লো বেদনাক্লিষ্ট চেহারাগুলোয়...

* * *

দুই বৃদ্ধের যন্ত্রণা ভোগ বেশি দীর্ঘ হলো না...

সুমাইয়া– তাঁর কাহিনী এভাবে শেষ হলো যে, একদিন নির্যাতনকালে আবু জাহেল যাচ্ছিলো তার পাশ দিয়ে। তখন সে তাকে কিছু পীড়াদায়ক কথা বললো। ইতরভাষায় গালি-গালাজ করলো, কিন্তু তিনি ফিরেও তাকালেন না... এতে সে দারুণ খেপে গেলো, মুহূর্তে বর্শা টেনে বের করে তার তলপেটে নিক্ষেপ করলো এবং বর্শার সেই আঘাত বেরিয়ে গেলো তার পিঠ ভেদ করে...

ফলে তিনিই হলেন ইসলামে প্রথম শহীদ... আর এ-ই যথেষ্ট তার মহিমান্বিতা ও গৌরবান্বিতা হওয়ার জন্যে... আর ইয়াসির, সে চরম নিগৃহীত হয়ে মারা যায়। মৃত্যুকালে তার যবানে জারি ছিলো–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

* * *

মা-বাবার শাহাদাতের পর আম্মারের দুর্ভোগ বেড়ে গেলো। জালিমেরা এবার তার উৎপীড়নে সকল সীমা ছাড়িয়ে গেলো।

একদিন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এলেন ক্ষুণ্ন, বিষণ্ন কুণ্ঠিত চিত্তে বিমর্ষ চেহারায় ভারাক্রান্ত মনে আর সংকোচ ও লজ্জায় অধোবদন হয়ে...

তিনি চেষ্টা করলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে চোখ মেলে তাকাতে, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না মাথা উঁচু করতে...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন– তোমার কী হয়েছে আম্মার? আম্মার উত্তর দিলেন, ভয়াবহ অকল্যাণ ইয়া রাসূলাল্লাহ। তিনি আবার সুধালেন– 'কী হয়েছে?' আম্মার তখন বললেন, গতকাল ওরা আমাকে শাস্তি দিলো এবং এতই নিমর্মভাবে যে, যদি সেই শাস্তি, সেই নিগ্রহ কোন পাহাড়ের উপর পড়তো পাহাড় দু'ভাগ হয়ে

যেতো... আল্লাহর দুশমনেরা আমাকে দ্বিপ্রহরের তপ্ত রোদে নিক্ষেপ করেই ক্ষান্ত হলো না; ওরা আমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুনে আমার শরীর দগ্ধ হতে থাকলো আর ওরা আমাকে বললো–

আপনার নিন্দা ও ওদের প্রতিমাদের প্রশংসা করতে। এক পর্যায়ে আমি করেছি... তারপর তিনি এক মর্মভেদী কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন...

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন... 'তোমার অন্তরের অবস্থা কেমন আম্মার?' 'তিনি বললেন অন্তর পুরোপুরি আশ্বস্ত ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজী বললেন 'তাহলে ভয়ের কিছু নেই। এরপর আবার যদি তারা তোমাকে ওরকম বাধ্য করে তবে তুমিও বলো, যে রকম বলেছো।'

এরপর আল্লাহ তাআলা আম্মারকে সম্মানিত করলেন তার শানে আয়াত নাযিল করে– ইরশাদ করলেন :

مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهِ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর কুফুরীতে লিপ্ত হয়– অবশ্য সে নয় যাকে বাধ্য করা হয়েছে, কিন্তু তার অন্তর ঈমানে স্থির রয়েছে; বরং সেই বক্তি যে কুফুরীর জন্য নিজ হৃদয় খুলে দিয়েছে। এরূপ লোকের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে গযব নাযিল হবে এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে মহাশাস্তি। (নাহল : ১০৬)

* * *

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার সাহাবীদেরকে মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন যারা নিজেদের দ্বীন রক্ষায় সেখানে হিজরত করেন আম্মার ছিলেন তাদের অগ্রভাগে। কুবায় পৌঁছতেই মুহাজিরেরা যেখানে অবতরণ করেন– তিনি তাদের আহ্বান করলেন, একটি মসজিদ নির্মাণের। যেখানে তারা সালাত আদায় করবেন। সকলে তার সেই প্রস্তাবে সাড়া দিলো...

ফলে আম্মার ইবনে ইয়াসির সেদিন যেই মসজিদটি কায়েম করলেন

তাই হলো ইসলামে স্থাপিত প্রথম মসজিদ। আর এটাই যথেষ্ট তার মর্যাদা ও অগ্রগণ্যতার জন্যে...

*　　　*　　　*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরতে করলেন তখন তাকে পেয়ে আম্মারের চক্ষু শীতল হলো। তিনি ততটাই আনন্দিত হলেন যতটা আনন্দ লাভ করে প্রেমিক তার প্রিয়কে পেয়ে। ফলে তিনি সারাক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন। এমনকি দিনে রাতে এক মুহূর্তের জন্যও তার থেকে আড়াল হতে না হয় সেই চেষ্টা করলেন...

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার ভালোবাসার সমাদর করতেন তেমনি ভালোবাসা দিয়ে...। যখনই দেখা হতো বলতেন, 'খুব ভালো, খুব চমৎকার মানুষ এসেছে।'

*　　　*　　　*

বদরের দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পতাকাতলে আম্মার বীরবিক্রমে লড়াই করেন... আর তিনিই ছিলেন একমাত্র মুসলিম, যিনি অংশগ্রহণ করেছেন এই যুদ্ধে আর তার মা-বাবা দু'জনেই শহীদ।

*　　　*　　　*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তার রবের সান্নিধ্যে চলে গেলেন এবং অধিকাংশ আরব ইসলাম থেকে হটে গেলো– সেই সংকট কালে ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি রাখেন এক গৌরবময় অবদান, যা ইতিহাসে আজো অম্লান...

সেদিন যুদ্ধের এক পর্যায়ে যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের মাঝে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে গেলো এবং মৃত্যু একের পর এক ভয়াবহভাবে ছিনিয়ে নিতে শুরু করলো হাফেযে কুরআনদের... আর কেঁপে উঠলো মুসলমানদের পায়ের তলার মাটি...

তখন আম্মার দাঁড়ালেন একটি উঁচু পাথরের উপর। তার কর্তিত দুই কান ঝুলছে মাথার সঙ্গে। সেই অবস্থাতেই তিনি দরাজ কণ্ঠে বললেন:

হে মুসলমানগণ! তোমরা কি পালাচ্ছো জান্নাত থেকে... এসো,

আমার দিকে এসো মুসলিম ভাইয়েরা... তারপর তিনি তাদের সামনেই বেরিয়ে পড়লেন... আর তার কান দু'টো দুলছে তার গালের উপর...

তার নেতৃত্বে এবার মুসলমানগণ শক্ত আঘাত হানলো মুসায়লামা বাহিনীর উপর, আর তাতেই নিহত হলো মিথ্যাবাদী মুসায়লামা এবং মানুষ আবার দলে দলে ফিরতে শুরু করলো আল্লাহর দ্বীনে, যেমন তারা বেরিয়ে গিয়েছিলো দল ধরে।

* * *

খিলাফতের দায়িত্বভার যখন হযরত উমরে ফারুক রাযি.-এর কাছে এলো; তিনি আম্মারকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করলেন এবং তার সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দিলেন, আর কুফাবাসীর উদ্দেশ্যে লিখলেন–

আম্মা বা'দ,

আমি আম্মারকে তোমাদেরকে কাছে পাঠালাম আমীর হিসেবে আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে শিক্ষক ও তার সহযোগী হিসেবে...

এরা দু'জনেই তোমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্নেহধন্য সাহাবী...

অতএব তোমরা তাদের কথা শুনো, তাদেরকে মান্য করো। এর কিছু দিন পর হযরত উমর রাযি. বিশেষ কী ভেবে আম্মারকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিলেন। আম্মার যখন দেখা করতে এলো; বললেন, আম্মার তুমি কি কষ্ট পেয়েছো? তিনি উত্তর দিলেন, অপসারণ আমাকে যতটা কষ্ট দিয়েছে তার চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক ছিলো দায়িত্ব গ্রহণ...

* * *

আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন আম্মার ইবনে ইয়াসির-এর প্রতি...

কারণ মাথার তালু থেকে নিয়ে পায়ের তলা পর্যন্ত (আপাদ মস্তক) তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ মু'মিন...

আল্লাহ রাজী-খুশি হোন তার বাবা ইয়াসির ও তার মাতা সুমাইয়ার প্রতি...কারণ তাদের গোটা পরিবারই ছিলো ঈমানী পরিবার ...

হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.

“তোমাদের কেউ সুহায়লকে দেখলে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করো না যেন। কারণ আমার যিন্দেগীর কসম, সুহায়লের মাঝে রয়েছে বিবেক ও ভদ্রতা। সুহায়লের মতো মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে না।”

–মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ

হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.

হযরত সুহায়ল ইবনে আমর রাযি.। কুরায়শের আলোচিত নেতা। আরবের সুভাষী বক্তা এবং 'আহুলুল হাল ওয়াল আকদে'র অন্যতম সদস্য, যাদেরকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয় না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন প্রকাশ্যে হকের দাওয়াত দিতে শুরু করেন হযরত সুহায়ল রাযি. তখন পরিণত বয়েসী, প্রৌঢ়। তার পরিপক্ক বুদ্ধি ও গভীর দৃষ্টির দাবী ছিলো, সত্য ও মানবতার নবীর আহ্বানে সে-ই প্রথম সাড়া দেবে। কিন্তু সুহায়ল যে শুধু ইসলাম থেকে বিরত রইলো তাই নয়; বরং মানুষকেও বাধা দিতে শুরু করলো আল্লাহর পথে আসতে– সকল রকমে, আর অগ্রণী মুসলিমদের উপর আরম্ভ করলো নিষ্ঠুর নির্যাতন। যেন তারা দ্বীন ত্যাগে বাধ্য হয় এবং ফিরে আসে শিরকী ধর্মে... কিন্তু হঠাৎ সে এমন এক সংবাদ শুনলো, যা বজ্রপাতের মতো এসে পড়লো তার ওপর। সে জানতে পারলো, তার ছেলে আব্দুল্লাহ ও মেয়ে উম্মে কুলসুম মুহাম্মাদের অনুসারী হয়ে গেছে। এবং তার ও কুরায়শের নিপীড়ন থেকে রক্ষা পেতে ঈমান নিয়ে হাবশায় পলায়ন করেছে।

* * *

তারপর আল্লাহর ইচ্ছায়, হাবশায় হিজরতকারীদের কাছে পৌছলো এক মিথ্যা সংবাদ। এ মর্মে যে, কুরায়শ গোত্রের সকলে ইসলাম কবুল করেছে এবং মুসলমানরা নিজ পরিজনদের নিয়ে নিরাপদে দিন কাটাচ্ছে। এ খবর পেয়ে মুহাজিরদের একদল মক্কায় ফিরে এলো। যাদের মধ্যে সুহায়লের পুত্র আব্দুল্লাহও ছিলো।

আব্দুল্লাহর পা মক্কার মাটিতে পড়তেই তার বাবা তাকে ধরে ফেললো এবং তাকে শিকল– বন্দী করে তার ঘরের এক অন্ধকার কুঠুরিতে ফেলে রাখলো... নিত্যনতুন কায়দায় নির্যাতন করতে শুরু করলো তাকে। ক্রমাগত সেই নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে যুবক মুহাম্মাদের দ্বীন

প্রত্যাখ্যান করে বাপ-দাদার ধর্মে ফিরে আসার ঘোষণা দিলো। এতে সুহায়লের স্বস্তি ফিরলো। দুশ্চিন্তা কাটলো এবং সে মুহাম্মাদের উপর জয়ী হয়েছে বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করলো।

* * *

এর অল্প কিছুদিন পরেই মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিরুদ্ধে বদরে যুদ্ধের সংকল্প করলো। তখন তাদের সঙ্গে সুহায়লও নিজ পুত্র আব্দুল্লাহ সহ রওয়ানা হলো। সে খুবই ব্যগ্র ছিলো, তার জওয়ান ছেলেকে তরবারী ধারণ করতে দেখবে মুহাম্মাদের বিপক্ষে, যে কিনা এই কিছুদিন আগেও তার অনুসারী ছিলো।

* * *

কিন্তু তাকদীর সুহায়লের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলো এমন এক ব্যাপার, যা ছিলো তার একেবারেই হিসাবের বাইরে... কারণ বদর প্রান্তরে দু'দল মুখোমুখি হতেই এই মু'মিন মুসলিম যুবক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো মুসলমানদের কাতারে এবং নিজেকে দাঁড় করালো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পতাকাতলে, আর তরবারী উঁচিয়ে ধরলো নিজের বাবা ও তার সঙ্গে আগত আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে...

* * *

'বদর যুদ্ধ' যখন শেষ হলো সেই মহাবিজয়ের মধ্য দিয়ে, যা আল্লাহ তাঁর নবীকে দান করলেন। আর যুদ্ধবন্দী মুশরিকদের একে একে পেশ করা হলো তাঁর ও তাঁর পুণ্যাত্মা সাহাবীদের সামনে, তখন দেখা গেলো, সুহয়াল ইবনে আমরও রয়েছে তাদের মধ্যে।

সুহায়ল যখন নবী (সা.)-এর সামনে নতশিরে দাঁড়ালো– মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে, তখন হযরত উমর রাযি. তার দিকে এক তীব্র দৃষ্টি হেনে বললেন, আমাকে ছেড়ে দিন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি ওর সামনের দাঁত দু'টি উপড়ে ফেলি, যেন আজকের পরে আর কখনো সে মক্কার কোন মজমায় দাঁড়িয়ে ইসলাম ও তার নবীকে আক্রমণ করে। বক্তৃতা করতে না পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

"ওমর! ছেড়ে দাও ওদেরকে, কারণ হয়তবা তুমি ওদের থেকে এমন কিছু দেখবে, যা ইনশাআল্লাহ তোমাকে আনন্দিত করবে।"

* * *

তারপর কালের চাকা ঘুরতে লাগলো এবং এসে গেলো 'সুলহে হুদায়বিয়া'। কুরায়শরা তাদের পক্ষ থেকে সুহায়ল ইবনে আমরকে পাঠালো চুক্তি সম্পাদনের জন্য। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বরণ করলেন এবং তার সাথে সাহাবীদের এক জামাত, যাদের মধ্যে রয়েছে সুহায়লের পুত্র আব্দুল্লাহও।

মহানবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী ইবনে আবী তালেবকে ডাকলেন চুক্তি লিপিবদ্ধ করার জন্য। তিনি লিখতে শুরু করলেন রাসূলের তরফ থেকে। রাসূল বললেন, "লেখো– বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সুহায়ল এতে বাধা দিয়ে বললো, আমরা এর সাথে পরিচিত নই। বরং লিখুন, বিসমিকা আল্লাহুম্মা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে বললেন, লেখো বিসমিকা আল্লাহুম্মা।

তারপর বললেন, "লেখো এই চুক্তিসমূহ অনুমোদন করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ"। সুহায়ল তখন বললো, যদি আমরা বিশ্বাস করতাম যে, আপনি আল্লাহর রাসূল তাহলে আপনার সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতাম না। এখানে বরং আপনার নাম ও আপনার বাবার নাম লিখুন। একথা শুনে নবীজী বললেন, "আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল যদিও তোমরা অস্বীকার করো... লেখো মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ" তারপর চুক্তি সম্পন্ন হলো, আর সুহায়ল ইবনে আমর ফিরে গেলো এক অপরিসীম আত্মতৃপ্তি নিয়ে। কারণ তার ধারনায় সে তার কওমের এক বিশাল জয় নিশ্চিত করেছে মুহাম্মাদের ওপর।

* * *

কালের চাকা ঘুরতে ঘুরতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, কুরায়শরা বরণ করলো বিনা যুদ্ধে এক নিদারুণ পরাজয়...

এই যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করছেন মক্কায়... আর ঐ তো ঘোষণা করছে ঘোষক– হে

মক্কাবাসী! যে অমুকের বাড়ীতে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের বাড়ীতে আশ্রয় নেবে সেও নিরাপদ... এই ঘোষণা শুনতেই সুহায়লের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো। সে দারুণ ঘাবড়ে গেলো এবং কোন দিশা না পেয়ে দরোজায় খিল এঁটে ঘরে লুকিয়ে রইলো।

জীবনের ঐ শ্বাসরুদ্ধকর মুর্হূতে সুহায়লের কী অবস্থা হয়েছিলো এবং তিনি কী করলেন– সে কথা আমরা তার মুখেই শুনি। তিনি বলেন,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন আমি তখন ঘরে ঢুকে দ্বার রুদ্ধ করে দিলাম এবং একজনকে পাঠালাম আমার ছেলে আব্দুল্লাহর খোঁজে। আমি নিজে তার সাথে দেখা করতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। কারণ সে মুসলমান হওয়ায় আমি তাকে খুব মারধর করেছি। তো সে যখন আমার কাছে এলো, বললাম, মুহাম্মাদের কাছে আমার জন্য নিরাপত্তা প্রার্থনা করো। কারণ আমি প্রাণনাশের আশঙ্কা করছি... আব্দুল্লাহ তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে গিয়ে আবেদন করলো, আমার আব্বা... আপনি কি তাকে নিরাপত্তা দেবেন ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত...?

নবীজী বললেন, হ্যাঁ... সে আল্লাহর আশ্রয়ে নিরাপদ। সে বেরিয়ে আসুক। এরপর তার সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, তোমাদের মধ্যে যার সাথে সুহায়লের দেখা হয় সে যেন তার সাক্ষাতকে অসুন্দর না করে। কারণ আমার জিন্দেগির কসম, নিঃসন্দেহে সুহায়ল ভদ্র ও বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। সুহায়লের মতো মানুষ ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ হতে পারে না। কিন্তু তাকদীরে যেমন লেখা ছিলো তাই ঘটেছে।

* * *

এরপর সুহায়ল ইসলাম গ্রহণ করলেন। এমন ইসলাম, যা পৌঁছে গেলো তার অন্তরের অন্তস্থলে এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি ভালোবাসলেন। এমন ভালোবাসা যা তাঁকে অধিষ্ঠিত করলো তার হৃদয়ের চূড়ায়।

সিদ্দীকে আকবার রাযি. বলেন আমি বিদায় হজ্জের দিন দেখেছি, সুহায়ল ইবনে আমর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর

সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি রাসূলকে কুরবানির পশু এগিয়ে দিচ্ছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুবারক হাতে সেগুলো জবাই করছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুণ্ডালেন। তখন সুহায়লকে দেখলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএর চুলসমূহ থেকে কিছু চুল নিয়ে সে তার চোখে লাগাচ্ছে... তৎক্ষণাৎ আমার মনে পড়লো হুদায়বিয়ার দিনের কথা। কেমন করে সেদিন সে অস্বীকার করেছিলো "মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" লিখতে... আমি তাই আল্লাহর প্রশংসা করলাম। তিনিই হেদায়েত দিয়েছেন তাকে।

* * *

ইসলাম কবুলের পর থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন ও আখেরাতের পুঁজি সঞ্চয়ই হলো সুহায়লের ধ্যানজ্ঞান।

তাই মক্কা বিজয়ের পর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে তার মতো নামাযী, রোযাদার ও দানশীল এবং তার মতো কোমল হৃদয় ও আল্লাহর ভয়ে এত বেশ ক্রন্দনকারী আর কেউ ছিলো না।

তার ওপর তিনি প্রতিদিন যেতে শুরু করলেন মু'আয ইবনে জাবালের কাছে। যেন তিনি সামান্য সামান্য করে তাকে কুরআন শিখিয়ে দেন। তার এই মতি দেখে যিরার ইবনে খাত্তাব তাকে বললো, আরে আবু যায়েদ! তুমি দেখছি এই খাযরাজির কাছে যাচ্ছো কুরআন পড়ার জন্য। তোমার স্বগোত্র কুরায়শের কারো কাছে যেতে পারতে না?

সুহায়ল উত্তরে বললেন, ওহে যিরার, তুমি যা বললে এ হচ্ছে জাহিলিয়াতের লক্ষণগুলোর একটি। আর এ-ই আমাদের সর্বনাশ করেছে যার ফলে সব মহৎ কাজে আমরা পিছনে পড়েছি। অন্যরা চলে গেছে আমাদের আগে...। শোন, ইসলাম আমাদের থেকে জাহিলিয়াতের এইসব মানাভিমান তিরোহিত করেছে, আর এমন এক জাতিকে ঊর্ধ্বে তুলেছে যাদের কোন আলোচনাই ছিলো না... হায়, যদি আমরা তাদের সঙ্গ অবলম্বন করতাম তাহলে আমরাও এগিয়ে যেতাম যেমন তারা এগিয়ে গেছে... সুহায়ল সবসময়ই অনুভব করতেন তার ও তার মতো যারা আছে তাদের ওপর অগ্রণী মুসলিমদের প্রাধান্য এবং বুঝতে পারতেন তার ও তাদের মাঝে কী ব্যবধান...

একদিন তিনি ও হারেস ইবনে হিশাম এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব হাজির হলেন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.-এর দরোজায়। তাদের সঙ্গে আম্মার ইবনে ইয়াসির, ছুহায়ব আর রুমি এবং আরো কিছু ব্যক্তি, যারা দাস বংশের কিন্তু ইসলামে রয়েছে তাদের অগ্রগণ্যতা– এমনরাও উপস্থিত হলো। সবাই অপেক্ষা করছে। এমন সময় হযরত উমরের ঘোষক বেরিয়ে এসে বললো–

আম্মার প্রবেশ করবে, ছুহায়ব প্রবেশ করবে... তখন কুরায়শের সাক্ষাতপ্রার্থীরা রাগতভাবে মুখচাওয়া চাওয়ি করলো। তারপর তাদের একজন বললো, আজকের মতো আর কখনো দেখিনি। উমর এদেরকে অনুমতি দিচ্ছে, অথচ আমরা তার দরোজায়; সে ভ্রুক্ষেপই করলো না?!!

সুহায়ল তখন বললেন, রাগ করতে চাও তো নিজেদের উপর করো।

দাওয়াত ওদেরকেও দেয়া হয়েছে, আমাদেরকেও; তারা তখনই গ্রহণ করেছে আর আমরা দেরি করেছি... ভেবে দেখো কী অবস্থা হবে আমাদের, যদি কেয়ামতের দিন তাদেরকে ডেকে নেয়া হয় জান্নাতে আর আমরা বাদ পড়ে যাই?!...

শোন! আল্লাহর কসম, যে মহত্ত্বে মর্যাদায় তারা তোমাদের ছাড়িয়ে গেছে, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর নয় তা নিশ্চয়ই অনেক গুণে বেশি; এই দরোজার তুলনায় যার জন্যে তোমরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। আরো বললেন, নিশ্চয়ই এরা তোমাদের অগ্রগামী হয়ে গেছে, যে যে ক্ষেত্রে অগ্রগামী হওয়ার ছিলো। এখন শুধু জিহাদ ও শাহাদাতই হতে পারে এর একমাত্র ক্ষতিপূরণ। আল্লাহর কসম...।

এই বলে তিনি উঠে গেলেন কাপড় ঝাড়া দিয়ে।

* * *

যুদ্ধ তখন চলছিলো শামের সীমান্তে মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে। সুহায়ল ইবনে আমর নিজের স্ত্রী, সন্তান ও নাতিনাতনীদের একত্র করলেন। তারপর সবাই মিলে রওয়ানা হলেন শাম অভিমুখে। উদ্দেশ্য, সেখানে আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরায় নিজেদের শামিল করবেন। তিনি তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন– আল্লাহর কসম! মুশরিকদের জন্য আমি

যত অবদান রেখেছি মুসলমানদের জন্যও অনরুপ অবদান রাখবো, আর মুশরিকদের আমি যত অর্থানুকূল্য দিয়েছি ঠিক সেইরূপ অর্থ সহায়তা আমি মুসলিমদের দেবো... আর আল্লাহর কসম! আমি আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরায় অবিচল থাকবো যাবৎ না শহীদী মৃত্যু নসীব হয় কিংবা মক্কার বাইরে মুসাফিরি হালতে মওত আসে।

* * *

সুহায়ল ইবনে আমর তার শপথকে সত্যে পরিণত করলেন। আর তাই ইয়ারমূকের যুদ্ধে মুসলমানদের সাথে অংশ নিয়ে সত্যনিষ্ঠ মু'মিনদের মতো প্রাণপণে লড়াই করে গেলেন...

তারপর একের পর এক যুদ্ধে যোগ দিতে লাগলেন। স্থানান্তরিত হলেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে...। অবশেষে শামে দেখা দিলো "আমওয়াস" মহামারি। আর এতেই সুহায়ল প্রাণ হারালেন। তার সাথে তার পরিবারের অন্য সদস্যাগণ...

আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন সুহায়ল ইবনে আমরের প্রতি এবং তাকে সঙ্গী করুন নবী ও শহীদদের, আর কতইনা উত্তম সঙ্গী তারা!

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী রাযি.

“মুসলমানদের জন্য তাঁদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পনের শত চল্লিশখানা হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন।”

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী রাযি.

কাফেলা এগিয়ে চলেছে... দ্রুত পদক্ষেপে... ইয়াছরিব থেকে মক্কার দিকে। ব্যাকুলতার সঙ্গীত তাদেরকে ধাবিত করছে, আর এক সুতীব্র তৃষ্ণা তাদের টানছে সমুখ পানে... কারণ রাসূলুল্লাহ্‌র সাথে তাদের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

কাফেলার প্রতিটি প্রাণ তাই উম্মুখ সেই মুহূর্তটির জন্যে, যখন সে নবী আলাইহিস্ সাল্লামের সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে... এবং তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্য ও মান্যতার শপথ নেবে, আর অঙ্গীকার করবে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতার...

কাফেলায় ছিলেন এক প্রবীণ। সকলের শ্রদ্ধেয় ও সবচাইতে প্রাজ্ঞ। তার একমাত্র শিশুপুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। আর ইয়াছরিবে রয়েছে তার আরো নয়টি মেয়ে। কিন্তু ছেলে শুধু একটিই...

বৃদ্ধ ভীষণভাবে চেয়েছিলেন, তার ছোট্ট বালকটি এই বাই'আতে উপস্থিত থাকুক... এবং আল্লাহর নেয়ামতরাজির মধ্য হতে এই মহান, এই দুর্লভ নেয়ামতটি তার হাতছাড়া না হোক। এই বৃদ্ধের নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আলখাযরাজী, আল আনসারী। আর তার বালক পুত্র, সে-ই আমাদের গল্পের নায়ক; জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আলআনসারী।

* * *

ঈমানের রৌশনী তখনই জাবেরের অন্তরে রেখাপাত করেছিলো– যখন তিনি কিশোর, সতেজপ্রাণ। তাই তার জীবনের প্রতিটি দিক হয়ে ওঠে সমান আলোকজ্জ্বল। ইসলাম তার কচি হৃদয়কে স্পর্শ করেছিলো ঠিক সেইভাবে, যেভাবে বৃষ্টিফোঁটা নতুন কুঁড়িতে পরশ বুলিয়ে দেয় আর সে বিকশিত হয় এবং সুগন্ধ ছড়ায়... রাসূল আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস সালামের সাথে তার বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছিলো যখন তার আঙ্গুলের নখগুলো সবুজ নরম দূর্বাদলের মতোই...

* * *

রাসূলে আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, এই মু'মিন বালক তখন হেদায়েত ও রহমতের নবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ফলে তিনি হয়ে ওঠেন এক উৎকৃষ্টজন তাদের মধ্যে, যাদের গড়েছে মাদরাসায়ে মুহাম্মাদী কিতাবুল্লাহর হিফয, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও হাদীসে রাসূল রেওয়ায়েতের জন্য...

পাঠকের শুধু এটুকু জানাই যথেষ্ট হবে যে, "মুসনাদে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ" বা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর হাদীস সংকলন তার দুই মলাটের মাঝে ধারণ করেছে পনের'শ চল্লিশখানা হাদীস... যে হাদীসগুলো এই সুযোগ্য শিষ্য সংরক্ষণ করেছেন এবং মুসলমানদের জন্য তাদের নবী পাক থেকে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম বুখারী ও মুসলিম তাদের 'সহীহায়নে' সেখান থেকে দুই'শরও বেশি হাদীস চয়ন করেছেন। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর এই সংগ্রহ মুসলমানদের চলার পথে আলো ছড়িয়েছে দীর্ঘকাল... কারণ তিনি পেয়েছিলেন আল্লাহর রহমতে প্রায় শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ হায়াত।

* * *

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বদরে এবং উহুদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। কারণ একে তো তিনি ছিলেন ছোট। তাছাড়া তার বাবা তাকে বলে গিয়েছিলেন বোনদের কাছে থাকতে। কারণ তিনি ছাড়া বাবার অনুপস্থিতিতে তাদের দেখাশোনার কেউ ছিলো না।

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন উহুদের যুদ্ধ হলো, তার আগের রাতে আব্বা আমাকে ডেকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে কাল রাসূলের সাহাবীদের মধ্যে যারা প্রথম শহীদ হবেন আমি তাদের সঙ্গে। আর আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে সবচে' প্রিয় যাকে আমি রেখে যাচ্ছি সে হলে তুমি। আমার কিছু ঋণ রয়েছে, তুমি সেগুলো পরিশোধ করো আর তোমার বোনদের খেয়াল রেখো...

ওদের কষ্ট দিয়ো না যেন'। যখন সকাল হলো, দেখলাম উহুদে নিহতদের মাঝে আমার আব্বাই প্রথম। তার দাফন কাফন শেষ করে

আমি মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এলাম। বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আব্বা কিছু ঋণ রেখে গেছেন... আর আমার কাছে এমন কিছুই নেই যা দিয়ে তার দেনা শোধ করতে পারি। কেবল কিছু খেজুর বৃক্ষ ও তার ফল ছাড়া। কিন্তু যদি ঐ ফল দিয়ে ঋণ শোধ করতে যাই তাহলে কয়েক বছরেও আদায় হবে না... আবার এছাড়া আমার বোনদেরও কোন সম্পত্তি নেই, যা দিয়ে তাদের খরচ চালাবো...

সব শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সঙ্গে করে আমাদের খেজুর শুকানোর জায়গায় গেলেন এবং আমাকে বললেন, "তোমার বাবার পাওনাদারদের ডাকো"। আমি তাদের ডেকে আনলাম।

তিনি অনবরত তাদের মেপে দিতে থাকলেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ আমার বাবার সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করে দিলেন ঐ বছরের খেজুর দিয়ে। তারপর আমি খেজুরের স্তুপের দিকে তাকালাম। দেখি, সেটা যেমন ছিলো তেমনই আছে... যেন তার থেকে একটি খেজুরও কমেনি ...

* * *

জাবেরের বাবার ওয়াফাতের পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে তার একটি যুদ্ধও বাদ যায়নি। আর প্রত্যেক যুদ্ধেই তার ঘটেছে এমন এমন ঘটনা, যা বর্ণনা করার মতো এবং মনে রাখার মতো। অতএব আমরা এখন তার মুখে শুনবো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে তার একটি ঘটনা।

হযরত জাবের রাযি. বলেন–

খন্দকের দিন আমরা পরিখা খনন করছিলাম, হঠাৎ একটি প্রকাণ্ড পাথর বেরিয়ে এলো। আমাদের পক্ষে যা ভাঙা সম্ভব হলো না। আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জানানোর উদ্দেশ্যে তার কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ! আমাদের সামনে একটি ভারি শক্ত পাথর পড়েছে। আমাদের কুড়াল তার কিছুই করতে পারছে না। আমরা কুড়াল চালিয়েছি, কিন্তু কোন ফল হচ্ছে না। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম তখন বললেন, রাখো, আমি আসছি।

তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তার পেটে তখন একটি পাথর বাঁধা– যেটা তিনি বেঁধেছেন ক্ষুধার তীব্রতা প্রশমিত করতে। কারণ তিনদিন হলো

আমরা কোন খাবারের স্বাদ গ্রহণ করিনি। নবীজী কুড়াল হাতে নিলেন এবং তিনি প্রস্তরে আঘাত করতেই সেটি ঝুরঝুরে বালি হয়ে গেলো।

সে সময় আমার খুব দুঃখ হলো রাসূলের ঐ ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখে। তাই আমি তার নিকটে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি কি আমাকে একটু বাড়ীতে যাওয়ার অনুমতি দেবেন?

তিনি বললেন, "যাও"।

ঘরে এসে স্ত্রীকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ ক্ষুধার্ত। এত বেশি যে, সে ক্ষুধা কারো পক্ষে সহ্য করা সম্ভব না। তো তোমার কাছে কিছু আছে নাকি?

সে বললো, আমার কাছে অল্প কিছু যব আর একটি ছোট ছাগল আছে।

আমি তাড়াতাড়ি সেটা জবাই করলাম এবং তার গোশত কেটে পাতিলে রাখলাম। আর যব পিষে স্ত্রীর কাছে দিলাম। সে আটা ছানতে লেগে গেলো। যখন দেখলাম, গোশত সিদ্ধ হয়ে এসেছে এবং আটাও বেশ নরম হয়েছে, খামির করার মতো, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম তাকে দাওয়াত দিতে। বললাম, সামান্য কিছু খাবার আপনার জন্য তৈরি করেছি ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ... তো আপনি ও আপনার সঙ্গে আরো এক দুইজন চলুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন খাবার কী পরিমাণ? আমি বর্ণনা দিলাম...

নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াসাল্লাম যখন খাবারের পরিমাণ আন্দাজ করলেন তখন সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন, "হে আহলে খন্দক! জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরি করেছে, সুতরাং সবাই এসো..."

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, "তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো, সে যেন চুলা থেকে পাতিল না নামায় এবং আমি আসার আগে আটা খামির না করে।"

অতএব আমি চললাম ঘরের উদ্দেশ্যে, আর লজ্জায় দুশ্চিন্তায় আমার তখন কী অবস্থা তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

মনে মনে বললাম, খন্দকের সমস্ত লোকে আসছে এক ছা' যবের দাওয়াত খেতে... আর খাসি মাত্র একটি...?!

ঘরে ঢুকে স্ত্রীকে বললাম,আরে এই, সর্বনাশ হয়ে গেছে... রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসছেন গোটা খন্দকের মুজাহিদ নিয়ে। স্ত্রী বললো, তিনি কি জিজ্ঞেস করেছেন খাবার কী পরিমাণ?

বললাম, হ্যাঁ তাকে বলা হয়েছে।

সে বললো, তাহলে আর চিন্তা করো না। কারণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তার একথা শুনে আমার দুশ্চিন্তা কেটে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন। তার সঙ্গে আনসার ও মুহাজিরগণও। তিনি তাদেরকে বললেন, "ভীড় না করে ভিতরে এসো"। তারপর তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, 'তোমার সঙ্গে রুটি বানাতে আরো কোন মহিলাকে নিয়ে নাও...

আর পাতিল চুলায় রেখেই তরকারি বাড়ো 'নামিয়ো না'। এরপর নবীজী একেক টুকরা রুটি গোশতসহ এগিয়ে দিতে লাগলেন সাহাবীদের দিকে আর তারা খেতে থাকলেন। এক পর্যায়ে সবার খাওয়া হয়ে গেলো এবং সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন। হযরত জাবের রাযি. বলেন,

আল্লাহর কসম, তারা খেয়ে চলে গেলেন আর আমাদের পাতিল তখনো ভর্তি, ঠিক যেমন ছিলো... এবং আটার খামিরা থেকে তখনো রুটি তৈরি হচ্ছে। শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার স্ত্রীকে বললেন, 'নিজেরা খাও... আর হাদিয়া দাও... ।'

ফলে সে নিজেও খেলো আর দিনভর ঐ রুটি-গোশত মানুষকে দিতে থাকলো।

* * *

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত ছিলেন মুসলমানদের জন্য আলোর দিশারী ও পথের দিশা। কারণ আল্লাহ তাকে দীর্ঘায়ু দান করেছিলেন, ফলে তিনি হায়াত পেয়েছিলেন একশ বছরের কাছাকাছি।

একবারকার ঘটনা। তিনি আল্লাহর পথে অভিযানে বেরিয়েছেন রোমান অঞ্চল অভিমুখে।

মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত মালেক ইবনে আব্দুল্লাহ আল খাছ'আমি রাযি.।

সৈন্যরা চলছিলো আর মালেক তাদের মধ্যে মধ্যে বিচরণ করছিলেন। উদ্দেশ্য, তাদের খোঁজ রাখা ও মনোবল বৃদ্ধি করা এবং বয়স্ক ও উপরন্তু সেনাদের বিশেষ যত্ন ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেয়া, যা তাদের প্রাপ্য। তো ওরকম খোঁজ খবর নিতে নিতে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন এমন সময় দেখেন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছেন জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ কিন্তু তিনি যাচ্ছেন পায়ে হেঁটে... অথচ তার সাথে একটি খচ্চর রয়েছে। তিনি লাগাম ধরে হাঁকিয়ে নিচ্ছেন।

মালেক তাকে বললেন, হে আবু আব্দুল্লাহ! ব্যাপারে কী, বাহনে চড়ছেন না যে?! আপনাকে তো আল্লাহ পরিবহনের মতো সওয়ারী দিয়েছেন।"

জাবের বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর রাস্তায় যার পা ধূলি ধুসরিত হয় আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেন।"

তখন মালেক তাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। সৈন্যবাহিনীর একেবারে সম্মুখভাগে পৌঁছলে পর আরেকবার তাকালেন জাবেরের দিকে। আর হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে আবু আব্দুল্লাহ! কী হলো, খচ্চরে চড়ছেন না কেন? অথচ সেটা আপনার আয়ত্তের ভিতর?!

জাবের বুঝতে পারলেন উনি কী বলতে চাচ্ছেন। তাই গলা চড়িয়ে জবাব দিলেন–

'কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর রাস্তায় যার পা ধূলিমলিন হয় আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন।" একথা শুনে সব মানুষ নেমে পড়লো তাদের বাহন থেকে...

কারণ তাদের প্রত্যেকেই প্রতিদানের প্রত্যাশী। ফলে এই বাহিনীর মতো এত বিপুল সংখ্যক পদাতিক আর কোন সেনাবাহিনীতে কখনো দেখা যায়নি।

* * *

মোবারকবাদ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারীকে ঃ

তিনি রাসূলে আ'যাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত হয়েছেন, যখন নিষ্পাপ শিশু...

আর তাঁর শীষ্যত্ব অবলম্বন করেছেন, যখন তার আঙ্গুলের নখগুলো কোমল। তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন আর সে হাদীস তার থেকে রেওয়ায়েত করেছে জনকে জন...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে থেকে জিহাদ করেছেন, তখন পরিপূর্ণ যুবক...

আর আল্লাহর রাস্তায় তখনো নিজের পায়ে ধুলো জড়িয়েছেন যখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ...

হযরত সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা রাযি.

যদি সালেম জীবিত থাকতো তাহলে আমার পরে
তাকেই দায়িত্ব অর্পণ করতাম।
-হযরত উমর ইবনে খাত্তাব রাযি.

হযরত সালেম মাওলা আবু হুযায়ফা রাযি.

ছুবায়তা বিনতে য়্যা'আর তার গোলাম সালেমকে আযাদ করে দিলেন। সালেম তখন নবীনপ্রাণ কিশোর। তিনি তাকে আযাদ করেন তার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে; তার কিছু সদগুণ দেখে এবং তার মাঝে মেধা ও প্রতিভার ছাপ দেখতে পেয়ে। তাছাড়া তার কথায় ও আচরণে ফুটে উঠতো পুণ্যবান ও কর্মশীল মানুষের লক্ষণ।

এসব কারণে তাকে আযাদ করার পর স্বামী আবু হুযায়ফা ইবনে উতবা– যিনি বনূ আবদে শামছের অন্যতম সর্দার এবং বয়সে তরুণ, তার কাছে একটু খারাপ লাগলো যে, অবুঝ সালেমকে একাকী ছেড়ে দেয়া হবে... তাকে দেখাশুনা করার মতো কেই নেই... ফলে তিনি সালেমের হাত ধরে তাকে হারামে নিয়ে গেলেন এবং কা'বার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কুরায়শ জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশে বললেন, হে কুরায়শগণ! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমার স্ত্রী ছুবায়তা আযাদ করে দেয়ার পর... আমি এই সালেমকে আমার পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করলাম– সে এখন থেকে আমার কাছে তেমন, যেমন বাবার কাছে তার ছেলে। কুরায়শ তাকে সাধুবাদ দিয়ে বললো, তুমি যা করেছো তা সত্যিই অতুলনীয় হে ইবনে উতবা।

সেদিন থেকে এই কিশোরকে সবাই ডাকতে শুরু করলো: সালেম ইবনে আবি হুযায়ফা নামে।

* * *

এর কিছুদিন পরেই মক্কা-উপত্যকা থেকে উৎসারিত হলো ঐশী আলো এবং আল্লাহ তাঁর নবীকে পাঠালেন হেদায়েত ও দ্বীনে হকসহ। এই পবিত্র আলোর পরশ প্রথম যাদের হৃদয়কে স্পর্শ করলো আবু হুযায়ফা ও তার পালক পুত্র সালেমও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

সত্যের আলোকরশ্মি তাদের অন্তরে প্রতিফলিত হলো। বাপ বেটা দু'জনেই রওয়ানা হলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

খেদমতে এবং তাদের ইসলাম প্রকাশ করলেন তাঁর সামনে। আর সমস্বরে পাঠ করলেন :

اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَخَاتَمَ رُسُلِهٖ

আবু হুযায়ফা ও তার পালক পুত্র সালেম আল্লাহর দ্বীনে দীক্ষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইসলাম বাতিল ঘোষণা করলো পালকপুত্র প্রথা... এবং মানুষকে আদেশ দিলো, ছেলেদেরকে তাদের প্রকৃত বাপের কাছে ফিরিয়ে দিতে। উদ্দেশ্য, তাদের বংশ সংরক্ষণ এবং জাহেলিয়াতের একটি খারাপ রসমের মূলোৎপাটন...

কুরআনে পালক সন্তানদের সম্পর্কে নাযিল হলো :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ...

"তোমরা (পোষ্যপুত্রদেরকে) তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাকো।"

(আহযাব: ৫)

মুসলমানগণ তাদের রবের এই নির্দেশে সাড়া দিলেন এবং তালাশ করতে শুরু করলেন তাদের পোষ্যপুত্রদের বংশ। বাবার পরিচয় খুঁজে বের করে তারা সন্তানকে ফিরিয়ে দিলেন তার কাছে...

কিন্তু আবু হুযায়ফা অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সালেমের বাবার কোন সন্ধান পেলেন না। তার কারণ, সালেমকে ছোটকালে বন্দী করে মক্কায় এনে ক্রীতদাসের বাজারে বেঁচে দেয়া হয়। তার বয়স তখন এত অল্প যে, এ বয়সে বাচ্চারা বলতে পারে না মা-বাবার নাম-পরিচয়...

তাই মানুষ তার নাম দিয়ে দেয় "সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা" বা আবু হুযায়ফার (আযাদকৃত) গোলাম সালেম। আর এই নামেই তিনি সকলের কাছে পরিচিত হন– যতদিন বেঁচে ছিলেন।

* * *

তবে আবু হুযায়ফা ও সালেমের মধ্যকার সম্পর্ক দাস-মনিবের সম্পর্ক ছিলো না...

বরং তা ছিলো ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক যেমন হয় সে রকম; যখন থেকে ইসলাম তাদের অন্তর দু'টিকে এক সূতোয় গেঁথে দিয়েছে আর

ঈমান তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত জায়গা করে নিয়েছে তাদের অন্তরাত্মায়...

আবুহুযায়ফা চাইলেন সালেমের সঙ্গে তার সম্পর্ক আরো গভীর, আরো দৃঢ়তর হোক এবং গোত্রপ্রীতিসহ সব রকম জাহেলি অভিমান ও মর্যাদাবোধ এমনকি তার চিহ্ন পর্যন্ত চিরতরে দূর হয়ে যাক– যে জাহেলিয়াতকে ইসলাম স্বহস্তে দাফন করেছে...

তাই, কুরায়শের আবশাম (আবদে শামছ) গোত্রীয় কুলমর্যাদার অধিকারিণী তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে সালেমের সঙ্গে বিবাহ দিলেন...

এতে করে সালেমের সাথে তার আরেকটি সম্বন্ধ বাড়লো। সালেম এখন তার দ্বীনি ভাই আবার নিকটতম আত্মীয়... সুতরাং তাদের সুখের সীমা রাইলো না।

* * *

কিন্তু খুব বেশি দিন তারা এই সুখ ধরে রাখতে পারলেন না। কারণ একের পর এক নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনা, প্রথম দিকের মুসলমানরা যার শিকার হচ্ছিলেন এবং তাদের জীবন হয়ে উঠছিলো বিভীষিকাময় সে কারণে মুসলমান বিরাট একটা অংশ মক্কা ত্যাগে বাধ্য হয়, আর এতেই বিচ্ছিন্ন হতে হয় সালেমকে আবু হুযায়ফা থেকে।

আবু হুযায়ফা দ্বীন ও ঈমান রক্ষার তাগিদে হিজরত করে হাবশায় চলে যান। যাতে তার বিশ্বাসের জন্য কুরায়শের কাছে নিগৃহীত হতে না হয়...

কিন্তু সালেম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মক্কায় থেকে যাওয়াকেই প্রাধান্য দেন। তিনি থেকে গেলেন কুরআনের টানে, নবীর উপর নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুনবেন, শিখে নেবেন তাজা তাজা আয়াত আর বিধান...অতএব সালেম শুরু করলেন ভীত সমাহিত তিলাওয়াত...

নাযিল হওয়া সূরাসমূহে নজর বুলিয়ে যান গভীরভাবে, বুঝতে চেষ্টা করেন তার অর্থ ও ভাব... এভাবে তিনি হয়ে উঠলেন নবী আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে হামেলীনে কুরআনের শীর্ষ ব্যক্তিদের অন্যতম; এমনকি সেই চারজনের একজন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং যাদের থেকে কুরআন শিখতে বলে গেছেন। ইরশাদ

করেছেন "তোমরা কুরআনের কেরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে চার ব্যক্তিকে– আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ... সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা... উবাই ইবনে কা'ব... ও মু'আয ইবনে জাবাল..."

* * *

সাহাবায়ে কেরামও মানতেন তাদের ওপরে সালেমের এই মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব... কিতাবুল্লাহর হিফয, তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অর্থ চিন্তা ও মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে তার বিশেষত্ব। তাই মুসলমানগণ যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন তখন সালেমকে তারা আমন্ত্রণ জানালেন নামাযে ইমামতির জন্য...

ফলে তিনিই তাদের নামায পড়াতে থাকেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের আগ পর্যন্ত। অথচ সে সময় তাদের মধ্যে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাবসহ শীর্ষ পর্যায়ের অনেক সাহাবী ছিলেন মদীনায়।

* * *

তারপর আল্লাহ চাইলেন হিজরতের পর সালেম ও তার ভাই আবু হুযায়ফা মিলিত হবে... এবং দু'জনে একসাথে বদরে যাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে।

যে মুহূর্তে মুসলমানগণ মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন; সালেম তার ভাই আবু হুযায়ফাকে বললেন, দেখো আবু হুযায়ফা, ঐ যে তোমার বাবা উতবা ইবনে রাবী'আ– একেবারে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আছে... ইসলাম ও মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য তৈরি হচ্ছে।

আবু হুযায়ফা বললেন: হাঁ,তাকে দেখতে পেয়েছি...

আর ঐ তো আল্লাহর দুই দুশমন আমার চাচা শায়বা ইবনে রবী'আ আর আমার ভ্রাতা ওলীদ ইবনে উতবা তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিতেন তাহলে ওদের একজন একজন করে মোকাবেলা করতাম এবং তারপর পৌঁছে দিতাম ধ্বংসের গুহায় কিংবা আমি আশ্রয় নিতাম আমার রবের সান্নিধ্যে প্রসন্ন চিত্তে...

* * *

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সালেম ও আবু হুযায়ফা দেখেন কতগুলো লাশ পড়ে আছে এক দিকে। কাছে যেতেই লক্ষ্য করলেন নিহতেরা হলো, আবু হুযায়ফার বাবা উতবা এবং চাচা শায়বা ও ভ্রাতা ওলীদ।

এরা সকলেই প্রাণ হারিয়েছে, কেউ বেঁচে নেই...

এ দৃশ্য দেখে আবু হুযায়ফা বললেন,

প্রশংসা সব সেই আল্লাহর, যিনি তার নবীর চক্ষু শীতল করেছেন এদের লীলা সাঙ্গ করে...

*　　*　　*

তারপর থেকে এই ধর্মীয় ভ্রাতৃদ্বয় রাসূলে আ'যাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা তলে জিহাদে শরীক হতে থাকলেন, তিনি জীবনে যত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তার প্রত্যেকটিতে এবং আদায় করে চললেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের তরফ থেকে তাদের ওপর যে হক রয়েছে সেগুলো। এক পর্যায়ে এসে গেলো ইয়ামামার যুদ্ধ। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর আমল। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের সেই কঠিন পরীক্ষার দিনে সিদ্দীকে আকবর দাঁড়ালেন মুসায়লামাতুল কায্যাবের মোকাবেলায় এবং সর্বস্তরের মুসলমানকে ডাক দিলেন এই ভয়াবহ ফেতনার দফা রফার জন্যে... যা দ্বারা ইসলাম ও মুসলমান আজ আক্রান্ত এবং হুমকির মুখে তাদের অস্তিত্ব...

এই আওয়াজ শুনতেই সালেম ও আবু হুযায়ফা তৈরি হয়ে গেলেন আল্লাহর দ্বীন রক্ষার জন্যে এবং বেরিয়ে পড়লেন আল্লাহর দুশমন মুসায়লামাকে হত্যার প্রতিজ্ঞা নিয়ে...

*　　*　　*

দুই দল মুখোমুখী হলো ইয়ামামার মাটিতে। সংঘটিত হলো দু'টি ভয়ানক যুদ্ধ। ইতিহাসে যার নজির খুবই কম কারণ একদিকে মুসলমানগণ ইকরামা ইবনে আবি জাহল ও খালেদ ইবনে ওলীদ রাযি.-এর নেতৃত্বে বিস্ময়কর বীরত্ব ও সাহসিকতার সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিলেন। অন্যদিকে মুরতাদরাও মুসায়লামার নেতৃত্বে এমন দাপট, এমন সাহস আর ত্যাগের স্বাক্ষর রাখলো যা কম আশ্চর্যের নয়... কিন্তু উভয় যুদ্ধেই ছিলো মুসায়লামা আল কায্যাব ও তার দলের পাল্লা ভারী এবং অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিলো

যে, মুসায়লামা বাহিনী ঢুকে পড়লো খালেদ ইবনে ওলীদের তাঁবুর ভিতর, এমনকি তারা তার বিবিকে প্রায় বন্দী করে ফেলেছিলো– যদি না হানাদারদের এক লোক তাকে নিরাপত্তা দিতো...

* * *

এই ঘটনার পর মুসলমানদের রক্ত গরম হয়ে উঠলো। তাদের শিরায় বহমান আত্মমর্যাদাবোধ তাদেরকে দারুণ ভাবে উৎসাহিত করলো এবং প্রকাশ ঘটলো মৃত্যুঞ্জয়ী বীরপুরুষ ও তাদের আশ্চর্য শৌর্যবীর্যের... যা একটু আগেও ছিলো অকল্পনীয়...তারা আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিলেন সেই প্রাণগুলো, যা মারা যাবে আজ কিংবা আগামীকাল– এমন প্রাণের বিনিময়ে যার কোন মৃত্যু নেই, যার আয়ূ অনন্তকাল... এ পর্যায়ে খালেদ বিন ওলীদ পুরো বাহিনী পুর্নবিন্যস্ত করতে প্রায়াস পেলেন। সুতরাং মুহাজিরদের পতাকা দিলেন সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা-এর হাতে, আর আনসারীদের পতাকা অর্পণ করলেন হযরত ছাবিত ইবনে কায়েসকে... এবং যায়দ ইবনে খাত্তাব দাঁড়ালেন তার তেজস্বী ভাষণে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের প্রতি উদ্বুদ্ধ ও আত্মোৎসর্গে অনুপ্রাণিত করতে। তিনি বললেন, হে লোক সকল! তোমরা দাঁতে দাঁত চেপে লড়াইয়ে টিকে থাকো শত্রুদের হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানো, আর এগিয়ে যাও বীরদর্পে, সাহসী পুরুষের মতো...ভায়েরা আমরা! খোদার কসম, এই কথার পরে আর একটি শব্দও আমি উচ্চারণ করবো না, যতক্ষণ না আল্লাহ মিথ্যুক মুসায়লামা ও তার দলকে পরাজিত করেন কিংবা আমি নিহত হই এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করি আমার সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে...

এই বলে তিনি ছুটলেন কাতারকে কাতার ভেদ করে এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

* * *

তার শাহাদাতের পর জনতার উদ্দেশ্যে দাঁড়ালেন আবু হুযায়ফা। সবাইকে ডাক দিয়ে বললেন, হে আহলে কুরআন! তোমরা কুরআনকে অলঙ্কৃত করো তোমাদের আমল ও প্রচেষ্টা দিয়ে... তোমরা সত্য করে দেখাও তোমাদের ঈমান... তোমাদের জীবনকে উৎসর্গ করে... তারপর তিনি জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদাত বরণ করলেন লড়াইয়ে অবিচল থেকে, মৃত্যুভয়ে পিছু না হটে....।

আর হযরত সালেম মাওলা আবি হুযায়ফা, ইনি গিয়ে দাঁড়ালেন মুহাজিরদের সামনে এবং চিৎকার করে বললেন, আমি বড়ই খারাপ বাহক কুরআনের– যদি আমার সামনে মুসলমানগণ আক্রান্ত হয়, পরাস্ত হয়...এই বলে তিনি ছুটলেন মুহাজিরদের পতাকা উঁচিয়ে এবং সর্বাত্মক লড়াইয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন রণাঙ্গনের বুকে... এক সময় তার একটি হাত কাটা গেলো। তিনি পতাকাটা এবার বাম হাতে নিলেন এবং প্রাণপণে চেষ্টা করলেন পতাকা আগলে রাখতে, কিন্তু তার বাম হস্তটিও কেটে নিলো দুশমনরা। তিনি তখন তার দুই বাহু দিয়ে সেটাকে জড়িয়ে ধরলেন... এবং পতাকা এভাবেই স্থির থাকলো তার বুকের ওপর একপর্যায়ে জখম তাকে কাবু করে ফেললো এবং মাটিতে পড়ে গেলো তার রক্তাক্ত শরীর...

* * *

যুদ্ধ যখন থামলো খালেদ বিন ওলীদ এলেন সালেম মাওলা আবি হুযায়ফার কাছে। তখনো অবশিষ্ট আছে কিছুটা প্রাণ... সালেম ক্ষীণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, মুসলমানগণ কী করলো খালেদ? খালেদ উত্তর দিলেন আল্লাহ তাঁদের বিজয় নিশ্চিত করেছেন... আর তাদের শত্রু মুসায়লামা কায্যাবকে খতম করেছেন... এবং তার বাহিনী ও অনুসারীদের নাস্তানাবুদ করেছেন... চরমভাবে পরাজিত করেছেন...

হযরত সালেম রাযি. আবার জিজ্ঞেস করলেন, আমার ভাই আবু হুযায়ফা কী করেছেন?

খালেদ বললেন, তিনি পিছনে না ফিরে সামনে অগ্রসর অবস্থায় তার রবের সান্নিধ্যে গমন করেছেন এবং তার শহীদী মৃত্যু নসীব হয়েছে... সালেম বললেন, আমাকে তার পাশে শুইয়ে দাও...

খালেদ বললেন, এই তো উনি, তোমার পায়ের কাছে চাদরে ঢাকা... এ কথা শুনে তিনি পরম প্রশান্তিতে চোখ বন্ধ করলেন। শুধু একটি বাক্য উচ্চারিত হলো আমরা এখানে (দুনিয়ায়) একসাথে (হে) আবু হুযায়ফা এবং ওখানেও একসাথে ইনশাআল্লাহ...

এরপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.

‘গোটা নবুওয়তের ইতিহাসে এমন আর একজন নেই,
যিনি কোন নবীর জামাতা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ
করেছেন দুই দুইবার– হযরত উসমান রাযি. ছাড়া’।

হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান রাযি.

দু'টি জ্যোতি লাভ করেছেন তাই যুননূরাঈন... হিজরত করেছেন দুইবার তাই ছাহেবে হিজরাতাঈন... নবীজীর দুই কন্যার যিনি স্বামী... তিনিই হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি., রাসূলের প্রিয় সাহাবী... আল্লাহ রাজী খুশি হন তাঁর প্রতি।

* * *

জাহেলী যুগে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. ছিলেন তার কওমের মাঝে এক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। ব্যাপক সুনামের অধিকারী বিত্তবান, বিপুল সুখ আর ঐশ্বর্যের মালিক...ভীষণ বিনয়ী আর লাজুক... তাই কওমের লোকজন তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। তিনি ছিলেন তাদের কাছে একরকম প্রবাদ পুরুষ। যার প্রমাণ মেলে এতে, কুরায়শের কোন রমণী যখন তার ছোট বাচ্চাকে নাচাতো, দোলা দিতো সে গাইতো :

أُحِبُّكَ وَالرَّحْمٰن

حُبَّ قُرَيْشٍ لِعُثْمَانَ

অর্থাৎ আমি ভালোবাসি তোমায়, রাহমানের কসম– যেমন উসমানকে ভালোবাসে কুরায়শ।

মক্কায় যখন ইসলামের আলো বিকীর্ণ হলো তখন সর্বাগ্রে যে কয়জন এই দীপাধার থেকে আলো নিতে এলো হযরত উসমান তাদের অন্যতম।

* * *

হযরত উসমানের ইসলাম গ্রহণের রয়েছে এক চমৎকার কাহিনী। যা বর্ণনা করে আসছে বর্ণনাকারীগণ। তা এই যে, জাহেলিয়াতের যুগে তথা ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে একদিন তার কাছে খবর পৌঁছালো, মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তার কন্যা রুকাইয়াকে তার চাচাতো ভাই উতবা ইবনে লাহাবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন...এতে তিনি খুবই অনুতপ্ত হলেন– উতবার আগে তাকে নিজ পরিণয়ে আবদ্ধ করতে না পেরে। তিনি হারালেন সমুন্নত চরিত্রের এক রমণী ও তার অভিজাত পরিবারকে... এই আক্ষেপে।

সেদিন তিনি ঘরে ফিরলেন ভারাক্রান্ত মনে। ঘরে এসে পেলেন তার খালা "সু'দা বিনতে কুরায়যাকে ইনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমতী ও বিচক্ষণা নারী, প্রবীণা। তিনিই উসমানকে সান্ত্বনা দিলেন, তাকে চিন্তামুক্ত করলেন... আর এ সুসংবাদ দিলেন যে, অচিরেই আত্মপ্রকাশ করবেন এমন এক নবী, যিনি মূর্তির পূজা-অর্চনা বাতিল ঘোষণা করে একমাত্র নিয়ন্তার ইবাদতের ডাক দিবেন...

তিনি হযরত উসমানকে ঐ নবীর দ্বীন গ্রহণে উৎসাহিত করলেন আর বললেন, তোমার যা আকাঙ্ক্ষা তা নিশ্চয়ই পাবে তার কাছে।

হযরত উসমান রাযি. বলেন, আমি বের হলাম। পথ চলছি। হাঁটছি আর চিন্তা করছি আমার খালার কথাগুলো... এমন সময় দেখা হলো হযরত আবু বকরের সাথে। আমি তাকে বললাম খালার কাছে যা যা শুনেছি। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর কসম তোমার খালা সত্য বলেছেন। তোমাকে যে সংবাদ দিয়েছেন তা সঠিক। তিনি তোমাকে কল্যাণের সুসংবাদ দিয়েছেন হে উসমান...আর তুমি তো একজন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক... সত্য তোমার কাছে অস্পষ্ট না, এবং সত্য-মিথ্যা তোমার কাছে একাকারও হতে পারে না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, আমাদের কওম যে মূর্তিসমূহের পূজা করছে ওগুলো আসলে কী? বলো, তা কি চেতনাহীন পাথর নয়, যে দেখতে শুনতে পায় না। যার কোন অনুভূতি নেই?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, আর তোমার খালা যা বলেছেন উসমান, সেটা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে... প্রতীক্ষিত সেই রাসূলকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন তাঁকে তিনি প্রেরণ করেছেন সমস্ত মানুষের কাছে সত্য-সঠিক ধর্ম দিয়ে। এ কথা শোনার পর আমি বললাম, কিন্তু তিনি কে? বললেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব।

আমি বললাম, সত্যবাদী আল-আমীন? হযরত আবু বকর রাযি. বললেন, তিনিই সেই... আমি তখন বললাম, আপনি কি আমাকে একবার তার কাছে নিয়ে যাবেন?

তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ... এবং আমরা গেলাম মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে। তিনি যখন আমাকে দেখলেন; বললেন, উসমান! আল্লাহর আহ্বায়কের আহব্বানে সাড়া দাও... নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসূল, যাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের কাছে বিশেষভাবে, আর সাধারণভাবে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টির কাছে..."

হযরত উসমান রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম আমি তাঁর দিকে তাকাতেই এবং তাঁর ঐ কথাটি শুনতেই আশ্বস্ত হয়ে গেলাম তাঁর প্রতি এবং বিশ্বাস করলাম তার দাওয়াত... আর তখনই সাক্ষ্য দিলাম, আল্লাহ ছাড়া নেই কোন ইলাহ্, এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

* * *

তখন পর্যন্ত রাসূল আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের গোত্র বনূ হাশেমের কেউ ঈমান আনেনি তাঁর প্রতি...তবে তাদের মধ্যে তার প্রকাশ্য কোন শত্রু ছিলো না, চাচা আবু লাহাব ছাড়া।

সারা কুরায়শের মধ্যে সে ও তার স্ত্রী উম্মে জামীলই ছিলো রাসূলের প্রতি বেশি বিদ্বেষী, বেশি নির্দয় এবং তাকে কষ্ট দিতে বেশি উৎসাহী... যে কারণে আল্লাহ তার ও তার স্ত্রী সম্পর্কে নাযিল করেনঃ নিম্নোক্ত সূরাটি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ○ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ○ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ○
وَّامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ○ فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ○

অর্থ আবু লাহাবের দু'হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজে ধ্বংস হয়েই গেছে। তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসেনি। অচিরেই সে লেলিহান আগুনে প্রবেশ করবে। এবং তার স্ত্রীও কাষ্ঠ বহনরত অবস্থায়। গলদেশে মুঞ্জ (তৃণ বিশেষ)-এর রশি লাগানো অবস্থায়।

এতে আবু লাহাবের আক্রোশ আরো বেড়ে গেলো, সে ও তার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি এবার আরো বেশি বৈরী, আরো সহিংস হয়ে উঠলো। সেই সাথে মুসলমানদের প্রতিও। অতএব তাদের পুত্র উতবাকে বললো তার স্ত্রী রুকাইয়া বিনতে মুহাম্মাদকে তালাক

দিয়ে দিতে। সে তৎক্ষণাত তালাক দিলো। গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য!
এদিকে হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর কাছে তালাকের খবর পৌঁছতেই তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে পড়লেন... এবং কাল বিলম্ব না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও খুশী মনে এই বিয়ে অনুমোদন করলেন।

উম্মুল মুমিনীন খাদিজা বিনতে খুয়ায়লিদ রুকাইয়াকে সাজিয়ে বরের কাছে পাঠালেন।

হযরত উসমান রাযি. ছিলেন কুরায়শের মধ্যে সবচে' সুদর্শন চেহারার। লাবণ্য ও কমনীয়তায় এই জুটি ছিলো একে অন্যের সমান। সে জন্য তাকে সাজাবার সময় আবৃত্তি করা হয়:

أَحْسَنُ زَوْجٍ رَآهُ إِنْسَانٌ "رُقَيَّةُ" وَزَوْجُهَا "عُثْمَانُ"

সুন্দরতম স্বামী-স্ত্রী, যাদের দেখেছে ইনসান, তারা হলো– রুকাইয়া ও তার স্বামী উসমান।

*   *   *

পূর্বপরিচিতি ও বিপুল খ্যাতি সত্ত্বেও হযরত উসমান রাযি. নিষ্কৃতি পাননি কুরায়শের নিপীড়ন থেকে– যখন তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন।

তার চাচা 'হাকাম'-এর কাছে বড়ই অসহ্যকর ঠেকলো বনূ আবদে শামছের এক তরুণের এভাবে কুরায়শের বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মাদের দলে যোগদান... সে কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না এই স্পর্ধা, এই দুঃসাহস...তাই সে ও তার অনুচরেরা মিলে তাকে হেনস্তা করতে উঠে পড়ে লাগলো। ওরা তাকে ধরে আনলো এবং হাত-পা কষে বেঁধে প্রশ্নের খড়গ দুলিয়ে বললো, তুমি তোমার বাপ-দাদার ধর্মকে অবজ্ঞা করে এক নতুন ধর্ম গ্রহণ করছো?!

খোদার কসম! আমি তোমাকে রেহাই দেবো না যতক্ষণ না তুমি পথে ফিরে আসছো...

হযরত উসমান রাযি. তখন বললেন, আল্লাহর কসম, জীবন থাকতে

আমি কখনো আমার দ্বীন ত্যাগ করবো না এবং আমার নবীকেও ছেড়ে যাবো না...

ফলে তার চাচা হাকাম তাকে শাস্তি দিয়েই চললো...

আর অপরদিকে হযরত উসমান রাযি.। দ্বীনের প্রতি তিনি হলেন আরো অনড় এবং নিজ ঈমান ও আকীদার প্রতি আরো মজবুত, আরো আস্থাবান...

শেষে তার চাচা নিরাশ হয়ে তাকে ছেড়ে দিলো এবং উৎপীড়নের পথ পরিহার করলো, কিন্তু তাই বলে কুরায়শের শত্রুতা বন্ধ হলো না। তারা ভিতরে ভিতরে তাদের ক্ষোভ পুষে রাখলো, আর নানা কায়দায় তাকে উত্যক্ত করতে লাগলো। একপর্যায়ে তিনি বাধ্য হলেন রাসূলের মায়া বিসর্জন দিয়ে আপন দ্বীন নিয়ে দূর দেশে চলে যেতে। সুতরাং তিনি ও তার স্ত্রী হযরত রুকাইয়া রাযি. এই দু'জনই প্রথম পাড়ি জমালেন হাবশায় মুসলিম মুহাজির হিসেবে...। যখন তাদের বিদায়ক্ষণ উপস্থিত হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন তাদের কাছে, আর দোয়া করলেন এই বলেঃ "আল্লাহ সঙ্গী হোন উসমান ও তার স্ত্রী রুকাইয়ার... আল্লাহ সহায় হোন উসমান ও তার স্ত্রী রুকাইয়ার। "নিশ্চয়ই উসমানই স্বপরিবারে হিজরাতকারীদের মধ্যে প্রথম, আল্লাহর নবী লূত আলাইহিস সালাম এর পর"।

*　　　*　　　*

হযরত উসমান রাযি. ও তার স্ত্রী হযরত রুকাইয়া রাযি. হাবশায় বেশি দিন থাকতে পারলেন না অন্য মুহাজিররা যেমন থাকলেন। কারণ মক্কার মায়া আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর টান তাদের বেচাইন করে তোলে। তারা অস্থির হয়ে পড়েন রাসূলের সাক্ষাৎ ও মক্কার আলো বাতাসের জন্য...অতএব তারা ফিরে এলেন এবং মক্কায় অবস্থান করতে থাকলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মু'মিনদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন তখন মুহাজিরদের সঙ্গে তারাও হিজরত করলেন।

*　　　*　　　*

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সকল যুদ্ধেই শরীক হয়েছেন এবং তার সাথে উপস্থিত হয়েছেন সবকটি গয্ওয়ায়...শুধু বদর যুদ্ধ ছাড়া আর কোন যুদ্ধ থেকে তিনি বঞ্চিত হননি...

এ যুদ্ধে না যাওয়ার কারণ, তিনি তার স্ত্রী রুকাইয়া রাযি.-এর শুশ্রূষায় ব্যস্ত ছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদর থেকে ফিরলেন তখন দেখেন, তার কন্যা রবের সান্নিধ্যে চলে গিয়েছে। এতে তিনি ভীষণ দুঃখ পেলেন... তবে শোকাহত স্বামীকে সান্ত না দিতে ভুললেন না। আর সে কী সান্ত্বনা! উসমানকে গণ্য করলেন বদর যোদ্ধাদের মধ্যে এবং গণীমতেও তাকে অংশ দিলেন... আর তার দ্বিতীয়া কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন...

এরপর থেকেই মানুষ তাকে ডাকতে শুরু করে "যুন্নূরাঈন" বলে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কন্যার সাথে তার এই দ্বিতীয় বিবাহ ছিলো তার জন্য এক অনন্য সাধারণ মর্যাদা। তিনি ব্যতীত আর কোন স্বামীই যা লাভ করেনি। তার কারণ, গোটা নবুওয়তের ইতিহাসে এমন ব্যক্তি দ্বিতীয়জন নেই, কোন নবীর সাথে যার দুইবার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। হযরত উসমানই সেই একমাত্র ভাগ্যবান... আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজী খুশি হন...

* * *

হযরত উসমান রাযি.-এর ইসলাম গ্রহণ ছিলো সেই সেরা নেয়ামতগুলোর একটি যা আল্লাহ মুসলমানদের দান করেছিলেন এবং সেই অশেষ কল্যাণগুলোর অন্যতম, যা দিয়ে আল্লাহ ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। কারণ মুসলমানগণ যখনই কোন সংকটে পড়েছেন হযরত উসমানই প্রথম এগিয়ে এসেছেন তাদের সহায়তায়...

তদ্রূপ ইসলামের বড় কোন প্রয়োজন সামনে আসামাত্র হযরত উসমান রাযি. নিজেকে পেশ করেছেন এবং তিনিই থেকেছেন অগ্রণী ভূমিকায়...

* * *

এরকম একটি ঘটনা হলো তাবুকের যুদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক অভিযানে বের হতে মনস্থির করলেন তখন তার প্রয়োজন ছিলো যথেষ্ট অর্থবল যা লোকবলের প্রয়োজনের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ রোমান সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও সেরকম। তাছাড়া তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের মাটিতে। অপর পক্ষে মুসলিম মুজাহিদগণ, একে তো তাদের পোহাতে হবে দীর্ঘ সফর তার ওপর তাদের রসদ কম... আর যানবাহন আরো কম...সেই সাথে তারা তখন পার করছিলেন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের এক কঠিন মুহূর্ত। জাযিরাতুল আরবে যে রকম পরিস্থিতি আগে খুব একটা দেখা যায়নি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হয়েই মুসলিমদের মধ্য হতে বড় একটা অংশকে জিহাদে শরীক হতে বারণ করেন–

যেহেতু তাদের সওয়ারী নেই। এতে স্বভাবতই তারা বঞ্চিত হয়ে পড়েন শাহাদাত লাভের সুযোগ হতে...ফলে তারা ফিরে গেলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। অশ্রুপ্লাবিত চোখে...

* * *

এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করলেন সম্পদ ব্যয়ে... আর তাদেরকে শোনালেন মহাপুরস্কারের সুখবর। তখন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দায়িত্ব নিলাম একশত উটের, সাথে তার জিন ও হাওদা।...

এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একধাপ নেমে এলেন মিম্বার থেকে। কিন্তু নতুন করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন দান-খরচে। তখন হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. আবার দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আরো একশ' উট দিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ তার হাওদা ও জিনসহ...এতে রাসূলের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি নেমে এলেন মিম্বার থেকে আরো এক ধাপ। তার একটু পরেই তিনি আবারো মানুষকে উৎসসাহিত করতে লাগলেন খরচের প্রতি এবং তৃতীয়

বারের মতো হযরত উসমান রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন। আরয করলেন, আমি আরো একশ' উট দিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ তার হাওদা ও জিনসহ...

এইবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবনে আফফানের কাজে খুশি হয়ে তাঁর আঙ্গুলি মুবারক দুলিয়ে ইশারা করে বললেন।

مَاضَرَّ عُثْمَانُ مَافَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

مَاضَرَّ عُثْمَانُ مَافَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ

আজকের পরে উসমান যাই করুক তাতে তার ক্ষতি নেই...

আজকের পরে উসমান যাই করুক তাতে তার ক্ষতি নেই।

* * *

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে অবতরণ করতেই হযরত উসমান রাযি. ছুটলেন তার বাড়ীর দিকে। হযরত উসমান রাযি. বাড়ীতে চলে গেলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন উষ্ট্রীসমূহের সাথে এক লক্ষ দিনার–স্বর্ণমুদ্রা...

দিনারগুলো যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলের কাছে ঢেলে রাখা হলো; তিনি তার পবিত্র হাতে সেগুলো উল্টে পাল্টে দেখলেন আর তার যবানে উচ্চারিত হলো– আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন উসমান, যা কিছু তুমি করেছো গোপনে এবং প্রকাশ্যে... এবং যা কিছু হয়েছে তোমার থেকে এবং যা হবে... কেয়ামত পর্যন্ত।

হযরত ফারুক রাযি.-এর খেলাফতকালে একবার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। যাতে ফলফসল ও গবাদিপশুর ব্যাপক ক্ষতি হলো। এমনকি ঐ বছরের নাম পড়ে যায় 'আমুর রমাদা' বা ছাইবর্ষ। কারণ দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে খড়াপীড়িত জমি ঝলসে ছাই বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। দুর্যোগ এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠলো যে, মানুষের প্রাণ কণ্ঠাগত হলো...অতএব এক সকালে তারা উমরের কাছে এসে আরয করলো:

হে খলীফাতুর রাসূল! আকাশ বৃষ্টিবর্ষণ করছে না। জমিতেও কিছু উৎপন্ন হচ্ছে না... মানুষ তো ধ্বংসের দারপ্রান্তে গিয়ে পৌছেছে...

তো এখন আমাদের কী উপায়? হযরত উমর রাযি. চিন্তামলিন চেহারায় তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

ধৈর্য ধরো আর প্রতিদানের আশা রাখো...

কারণ আমি আশা করছি, সন্ধ্যা নামার আগেই আল্লাহ তোমাদের পেরেশানি দূর করবেন। আর হলোও তাই। দিনের শেষে খবর এলো, হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. এর একটি কাফেলা আসছে শাম থেকে এবং সকালের মধ্যেই সেটি মদীনায় পৌঁছে যাবে। ফজরের নামায শেষ হতেই লোকজন দৌড়ে গেলো কাফেলাকে এগিয়ে আনতে এবং একের পর এক তারা বরণ করলো সেই কাফেলার সবকটি দলকে। ব্যবসায়ীরা এলো আগত পণ্য দেখতে– আর কী, তারা দেখে ওখানে এক হাজার উট, যাতে চাপানো রয়েছে গম, তেল ও কিসমিস...

* * *

উটগুলো বসলো হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি.-এর দরোজায় আর ছেলেপেলে উটের পিঠ থেকে বোঝা নামাতে লাগলো...

এই সময় ব্যবসায়ীরা এলো হযরত উসমান রাযি.-এর কাছে। তারা বললো, আবু আমর! আপনার কাছে যা এসেছে তা আমাদের কাছে বিক্রি করুন।

হযরত উসমান রাযি. বললেন, অত্যন্ত খুশির সাথে আমি গ্রহণ করছি তোমাদের প্রস্তাব, কিন্তু আমার কেনা দামের চেয়ে তোমরা কতটা লাভ দেবে আমাকে?

তারা বললো, আমরা আপনাকে প্রত্যেক দিরহামে দুই দিরহাম দিবো হযরত উসমান রাযি. বললেন, আমাকে এর চেয়েও বেশি দাম দিতে চেয়েছে। ফলে তারাও আরেকটু বাড়ালো...

তিনি বললেন, তোমরা যতটা বাড়িয়েছো আমাকে এর চেয়েও বেশি দিতে চেয়েছে... তারা আরো বাড়ালো তিনি বললেন, আমাকে এর চেয়েও বেশি দাম বলা হয়েছে...

ব্যবসায়ীরা এবার বললো :

হে আবু আমর! মদীনায় আমরা ছাড়া তো আর কোন ব্যবসায়ী নেই... আর আমাদের আগে তো কেউ আসেওনি আপনার কাছে...

তাহলে কে আপনাকে এত দাম বললো, যা আমাদের চেয়েও বেশি?

হযরত উসমান রাযি. বললেন :

নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে দশ করে দিয়েছেন....

তবে বলো, তোমাদের কাছে কি এর চেয়েও বেশি আছে?

তারা বললোঃ না, হে আবু আমর। হযরত উসমান রাযি. তখন বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি, এই কাফেলা যা বহন করে এনেছে তার সবই আমি সদকা করে দিলাম গরীব মুসলমানদের জন্য। আমি কারো কাছে একটি দিনার বা দিরহামও চাই না... আমি শুধু চাই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান।

*   *   *

খেলাফতের দায়িত্ব যখন হযরত উসমান রাযি.-এর কাছে এলো; আল্লাহ তার হাতে বিজিত করলেন আরমেনিয়া ও কাওকাজ। মুসলমানদের আরো জয়ী করলেন এবং কর্তৃত্ব দিলেন খোরাসান, কারমান, সিজিসতান, কুবরুস ও আফ্রীকার অল্প কিছু অঞ্চলের উপর। মানুষ তার যুগে এমন স্বচ্ছলতা অর্জন করে, পৃথিবীর বুকে আর কোন জাতি যা লাভ করেনি।

*   *   *

যুননূরাঈন এর যামানায় মানুষ যে সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন যাপন করে এবং যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা লাভ করে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত হাসান বসরি রহ. বলেন, আমি হযরত উসমান ইবনে আফফানের ঘোষককে বলতে শুনেছি যে, সে লোকদেরকে ডেকে বলছেঃ

হে লোক সকল! তোমাদের অনুদান নিয়ে যাও।

তখন মানুষ তাদের অনুদান গ্রহণ করতো এবং পুরোপুরিভাবে উসূল করতো, যা তাদের প্রাপ্য।

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের ভাতা নিয়ে যাও। এবং সকলে এসে চাহিদামতো মনভরে নিয়ে যেতো। আমার কান আল্লাহর কসম তাকে

এও বলতে শুনেছে– তোমরা তোমাদের পোশাক নিয়ে যাও... এবং তারপর তারা নিচ্ছে লম্বা চওড়া সব বস্ত্র।

সে আরো বলতো, এসো, ঘি আর মধুও নিয়ে যাও।

এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ হযরত উসমান রাযি.-এর আমলে রিযিক ও খাদ্যদ্রব্য ছিলো অঢেল... কল্যাণ আর বরকতও ছিলো প্রচুর...

মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিলো ভালো। পৃথিবীর বুকে কোন মুমিন অপর মু'মিনকে ভয় করতো না; বরং মুসলিম মুসলিমকে ভালোবাসতো, তার সাথে সুসম্পর্ক রাখতো আর তার সাহায্যে এগিয়ে আসতো।

* * *

কিন্তু কিছু মানুষ আছে পেট ভরলে বেয়াড়া হয়ে যায় এবং আল্লাহ তাদের নেয়ামত দিলে তারা আরো না শুকরি করে।

তো এরা কতগুলো বিষয়ে হযরত উসমানের নিন্দা আরম্ভ করলো; যদি হযরত উসমান রাযি. ছাড়া অন্য কেউ তা করতো তাহলে তারা সমালোচনা করতো না...এবং এই অপদার্থেরা শুধু নিন্দা সমালোচনাতেই ক্ষান্ত থাকলো না। যদি শুধু এতটুকু হতো তাহলে বিষয়টা সহজ ছিলো। কারণ শয়তান তাদের মধ্যে নিজের আত্মা ফুঁকে দিলো এবং নিজের কুবুদ্ধি ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো...ফলে তার বিরুদ্ধে শত্রুতায় হাত মিলালো বিভিন্ন শহরের উচ্ছৃঙ্খল লোকদের এক দল। তারা তাকে তাঁর ঘরে অবরোধ করে রাখলো প্রায় চল্লিশ রাত, এবং তাকে মিষ্টি পানি পর্যন্ত খেতে দিলো না।

কিন্তু এই ইতর গিরগিটিগুলো ভুলে গেলো যে, ইনিই ওদের জন্য ক্রয় করেছিলেন 'বীরে রুমা' বা রুমাকূপ– তার ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে, যেন তা পান করে পরিতৃপ্ত হতে পারে মদীনার বাসিন্দা ও আগন্তুকেরা...।

এর আগ পর্যন্ত তাদের কোন মিষ্টি পানির ব্যবস্থা ছিলো না, যা খেয়ে তারা পরিতৃপ্ত হবে। তারপর এরা অন্তরায় হলো তাঁর ও মসজিদে নববীতে তাঁর নামায আদায়ের মাঝে... এরা মসজিদে নববীতেও তাকে নামায পড়তে বাধা দিলো... কিন্তু এদের যেন মনেই নেই যে, যুননূরাঈন সেই

ব্যক্তি যিনি সম্প্রসারিত করেছেন হারামাইন-এর এই দ্বিতীয় মসজিদ তার ব্যক্তিগত অর্থায়নে, যেন মুসলমানদের সকলে সেখানে নির্বিঘ্নে জায়গা পেতে পারে...অথচ এর আগে মসজিদ ছিলো খুবই অপরিসর। হযরত উসমান রাযি.-এর উপর বিপদ যখন ক্রমেই বৃদ্ধি পেলো এবং সংকট আরো ঘনীভূত হলো তখন তাকে রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন সত্তরজন ছাহাবী ও তাদের সন্তানেরা।

এদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে খাত্তাব রাযি., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি., হযরত আলী ইবনে আবী তালেবের দুই পুত্র হাসান-হুসাইন রাযি., হযরত আবু হুরায়রা রাযি. ও অন্যান্য...

* * *

কিন্তু যুননূরাঈন, ছাহিবুল হিজরাতাঈন জনহিতৈষী হযরত উসমান রাযি., তাকে রক্ষা করতে গিয়ে মুসলমানদের রক্ত ঝরবে সেটা মেনে নিতে পারলেন না। তার পরিবর্তে নিজের রক্তাক্ত হওয়া শ্রেয় মনে করলেন। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে মুসলমানরা পরস্পর লড়াইয়ে যুদ্ধে জড়াবে এর চেয়ে নিজের প্রাণ চলে যাওয়া তেমন কিছু বেশি নয়। তাই যারা তাঁকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন তাদেরকে কসম করে বললেন, তাকে আল্লাহর ফায়সালার উপর ছেড়ে দিতে...

তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন, যার উপর আমার সামান্যতম হকও রয়েছে; দোহাই তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও। তিনি তার ক্রীতদাসদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে তার তলোয়ায়ার খাপে ভরে ফেলবে সে আযাদ। কোষবদ্ধ করে লড়াই থেকে সরে যাবে সে আযাদ...

* * *

শাহাদাতের অল্প একটু আগে খলীফাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর চোখ দু'টো কয়েক মুহূর্তের জন্য লেগে এলো, তখন স্বপ্নে তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন...

তাঁর সাথে রয়েছেন সাহাবী আবু বকর সিদ্দীক ও উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। তিনি শুনতে পেলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলছেন :

"আজ রাতে আমাদের সঙ্গে ইফতার করো উসমান!"

এতে হযরত উসমান রাযি. নিশ্চিত হলেন, তিনি তাঁর রবের সান্নিধ্যে গমন করছেন... এবং নবীর সাক্ষাতে মিলিত হচ্ছেন...

* * *

সেদিন হযরত উসমান রাযি. সকাল যাপন করলেন রোযাদার অবস্থায়... আশে-পাশে যারা ছিলো তাদের থেকে তিনি কিছু লম্বা সালোয়ার চেয়ে নিয়ে পড়লেন– এ আশঙ্কায় যে রক্তপিয়াসী পাপিষ্ঠরা যখন তাকে হত্যা করবে তখন না তার সতর খুলে যায়। যিলহজ্জের আঠারো তারিখ জুমার দিন নিহত হলেন এই ইবাদাতগুজার এই দুনিয়াত্যাগী মানুষটি...

এই রোযাদার এই তাহাজ্জুদগুজার লোকটি...

পবিত্র কুরআনের সংকলক ও রাসূলুল্লাহর জামাতা এই মহান সাহাবী... নিরাপদে তিনি চলে গেলেন তার রবের আশ্রয়ে রোযা মুখে, তৃষ্ণার্ত অবস্থায়, তার সামনে তখন মেলা রয়েছে আল্লাহর পবিত্র কালাম।

* * *

মুসলমানদের সান্ত্বনার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, হযরত উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে কোন সাহাবী জড়িত ছিলেন না... এবং তাদের কোন সন্ত ানও না...।

শুধু এক ব্যক্তি বাদে, যে যোগ দিয়েছিলো বিদ্রোহী ও বিপথগামীদের সাথে। তাও প্রথম দিকে। পরে সে লজ্জিত হয় এবং ফিরে আসে।

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.

আমর ইবনুল 'আস ইসলামগ্রহণ করেন দীর্ঘ ভাবনা-চিন্তার পর। আর তাই রাসূলে আ'যাম তার সম্পর্কে বলেছেন : 'মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। আর ঈমান এনেছে আমর ইবনুল 'আস'।

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.

‘হে আল্লাহ! আপনি আমাদের আদেশ করেছেন, কিন্তু মানতে পারিনি...

নিষেধ করেছেন, কিন্তু শুনিনি... এখন আপনার ক্ষমা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই, হে আরহামার রাহিমীন!

এই বিগলিত প্রার্থনা এই প্রত্যাশা আর আকুলতা নিয়েই ইহজনম ত্যাগ করলেন আমর ইবনুল ‘আস রাযি.।

* * *

হযরত আমর ইবনুল ‘আসের জীবন কাহিনী বিশাল ও বিচিত্র... যে জীবন ইসলামকে এনে দিয়েছে পৃথিবীর দু’টি বৃহৎ অঞ্চলের কর্তৃত্ব, তথা ফিলিস্তীন ও মিসর। মুসলমানদের জন্য যিনি রেখে গিয়েছেন এমন এক সমৃদ্ধ জীবনার্দশ, যা পৃথিবীর মানুষকে নিয়োজিত করেছে তার চর্চা ও আলোচনায়– যুগের পর যুগ।

* * *

এই কাহিনীর শুরু হিজরতের প্রায় অর্ধশতক কাল পূর্বে, যখন আমর জন্মগ্রহণ করেন... আর সমাপ্তি হিজরতের তেতাল্লিশ বছর পরে, যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তার বাবা হলো ‘আস ইবনে ওয়াইল। জাহেলী যুগে আরব শাসকদের অন্যতম এবং তাদের আলোচিত নেতা... আর সেই ব্যক্তিদের একজন, যাদের বংশপরম্পরা গিয়ে মিশেছে কুরায়শের উচ্চশাখায়

তবে তার মায়ের দিকটি তেমন না। তার মা ছিলো যুদ্ধবন্দী দাসী।

এ কারণে তার নিন্দুকেরা তার মায়ের প্রসঙ্গ তুলে তাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাইতো, যখন তিনি বক্তৃতার মিম্বারে উপবিষ্ট কিংবা শাসকের আসনে সমাসীন। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছিলো যে, একবার ওদের একজন এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করলো তার সামনে দাঁড়িয়ে তার মা

সম্পর্কে প্রশ্ন করতে। তখন তিনি মিম্বারে বসা। তারা তাকে বিপুল অর্থ দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলো এই কাজের জন্য। অতএব ষড়যন্ত্র মতো লোকটি দাঁড়ালো এবং প্রশ্ন করলো ঃ আমীরের মায়ের পরিচয়? আমর নিজেকে সামলে নিলেন এবং বুদ্ধির সহায়তায় পরিস্থিতির মোকাবেলা করলেন। বললেন, তিনি হচ্ছেন নাবেগা বিনতে আব্দুল্লাহ...জাহেলী যুগে তিনি আরবের হাতে ধৃত হন তারপর তাকে ওকাযের বাজারে বিক্রি করা হয়...

তখন আব্দুল্লাহ ইবনে জাদ'আন তাকে ক্রয় করে... তারপর সে আ'স ইবনে ওয়ায়েল (তার আব্বা) কে দান করে। এবং তার ঘরেই তিনি একটি ভদ্রসন্তান জন্ম দেন...

সুতরাং হিংসায় জ্বলে মরছে এমন কেউ যদি তোমাকে পয়সা দিয়ে থাকে তবে তুমি নাও।

* * *

নির্যাতিত মুসলমানগণ যখন কুরায়শের দমন-পীড়ন থেকে বাঁচার জন্য হাবশায় হিজরত করতে লাগলো এবং নিজ নিজ গোত্র ত্যাগ করে হাবশার ভূমিতে এসে নিরাপদে আশ্রয় নিলো; কুরায়শরা স্থির করলো তাদেরকে মক্কায় ফিরিয়ে এনে আচ্ছা রকম ধোলাই দিবে।

তারা তখন আমর ইবনে আ'সকে নির্বাচন করলো এ কাজের জন্য। যেহেতু তার ও নাজ্জাশীর মাঝে ছিলো পুরনো সম্প্রীতির সম্পর্ক এবং নাজ্জাশী ও তার সভাসদেরা পছন্দ করে এমনসব উপঢৌকনও তার সঙ্গে দিয়ে দিলো।

তিনি যখন নাজ্জাশীর কাছে এলেন প্রথমে তার মর্যাদা বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করলেন। তারপর বললেন, আমাদের কওমের কিছু লোক বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে নিজেদের জন্য নতুন এক ধর্ম উদ্ভাবন করেছে...

এখন নেতৃবৃন্দ আমাকে পাঠিয়েছে তাদেরকে স্বজাতির কাছে ফিরিয়ে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করতে; যাতে তারা তাদেরকে স্বধর্মে ফিরিয়ে নিতে পারে এবং নিজেদের মতে পূনর্বহাল করতে পারে। নাজ্জাশী তখন কয়েকজন সাহাবীকে ডেকে এনে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তাদের দ্বীন সম্পর্কে, যা তারা পালন করে এবং তাদের ইলাহ সম্পর্কে, যার প্রতি তারা

বিশ্বাস স্থাপন করে আর তাদের নবী সম্পর্কে, যিনি তাদের কাছে এই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। তখন সে তাদের পক্ষ থেকে এমন কথাবার্তা শুনলো, যা তার অন্তরকে আস্থা ও বিশ্বাসে ভরে দিলো এবং তাদের আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তার এমন ধারণা অর্জিত হলো, যার ফলে সে তাদের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা অনুভব করলো এবং তাদের ধর্মের প্রতি তার বিশ্বাস প্রগাঢ় হলো। ফলে সে তাদেরকে আমর ইবনে আসের কাছে সোর্পদ করতে অস্বীকার করলো এবং দৃঢ়তার সাথে এই প্রস্তাব নাকচ করে দিলো। সেই সাথে ফেরত দিলো তার জন্য নিয়ে আসা সমস্ত উপঢৌকন।

* * *

হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. যখন মক্কা ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করছে নাজ্জাশী তাকে বললো, তোমাকে যেমন বুদ্ধিমান আর বিচক্ষণ বলে আমি জানি তাতে মুহাম্মাদের বিষয়টি কী করে তোমার কাছে দুর্বোধ্য হলো? আল্লাহর কসম! তিনি আল্লাহর রাসূল, বিশেষভাবে তোমাদের জন্য, সাধারণভাবে সমগ্র মানবজাতির জন্য।

আমর তখন নাজ্জাশীকে বললো, বাদশা! আপনি একথা বলছেন?!

নাজ্জাশী বললো, হ্যাঁ, কসম আল্লাহর... সুতরাং আমার কথা শোন আমর! মুহাম্মাদের প্রতি ঈমান আনো এবং গ্রহণ করো যে সত্য তিনি নিয়ে এসেছেন তোমাদের কাছে।

* * *

হযরত আমর ইবনুল আ'স রাযি. হাবশা ত্যাগ করলেন এবং আনমনা হয়ে চলতে লাগলেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না কী করবেন। কারণ নাজ্জাশীর কথাগুলো তখনো তার কানে বেজে চলেছে আর প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে তার হৃদয়কে...

এবং মুহাম্মাদ ও তাঁর আনিত সত্য নিয়ে তাঁর সাথে আলোচনার আগ্রহ তাকে প্রচণ্ড উৎসাহী করে তুললো।

কিন্তু সেটা তার ভাগ্যে লেখা ছিলো কেবল অষ্টম হিজরীতে গিয়ে। যে সময় আল্লাহ এই নতুন ধর্মের জন্য তার বুককে প্রসন্ন করে দেন। ফলে তিনি দ্রুত পদক্ষেপে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে অগ্রসর হতে থাকেন।

সেখানে গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাথে সাক্ষাৎ করে তার কাছে নিজের ইসলামকে প্রকাশ করবেন। কিছুটা পথ যাওয়ার পরই তার সাথে দেখা হলো খালিদ ইবনে অলীদ ও উসমান ইবনে তালহার সাথে এবং তারাও চলেছেন একই পথে একই উদ্দেশ্যে...।

ফলে তিনিও তাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন এবং তাদের সহযাত্রী হিসেবে চলতে আরম্ভ করলেন.. মহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসার পর খালিদ ইবনে অলীদ ও উসমান ইবনে তালহা দু'জনেই নবীজীর কাছে বায়আত হলেন। এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমরের উদ্দেশ্যে তাঁর হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমর হাত গুটিয়ে নিলেন।

এ দৃশ্য দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কী হলো আমর?

আমর উত্তর দিলেন, আমি আপনার হাতে বায়আত হবো এ শর্তে যে আমার আগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে। এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই ইসলাম ও হিজরত তার আগের সবকিছুকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়... সুতরাং এরপর তিনি বায়আত গ্রহণ করলেন। কিন্তু এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া রয়ে যায় তার অন্তরে। তাই আমর ইবনে আস বলতেন, আল্লাহর কসম, আমি কখনো রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে চোখ মেলে তাকাইনি এবং তার চেহারাও পুরোপুরি দেখিনি। এ অবস্থায়ই তিনি চলে যান আপন রবের সান্নিধ্যে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনে আসের দিকে তাকিয়েছিলেন নূরে নবুওয়তের দৃষ্টিতে এবং দেখতে পেয়েছিলেন তার বিরল শক্তিমত্তা। তাই তাকে যাতুসসালাসিল যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করেন। ঐ বাহিনীতে মুহাজির আনসার ও অগ্রণী মুসলমানদের অনেকে থাকা সত্ত্বেও।

* * *

আল্লাহ যখন তার নবীকে নিয়ে গেলেন এবং খেলাফতের ভার এলো হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর কাছে তখন "রিদ্দত" যুদ্ধে আমর

ইবনুল আস অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন...এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ ফেতনার মোকাবেলা করেন, যা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-এর দৃঢ়তাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়...

সে সময়ের একটি ঘটনা, তিনি বনূ আমেরের এলাকায় অবতরণ করলেন। তখন দেখেন তাদের সর্দার কুররা ইবনে হুবায়রা মুরতাদ হবার চিন্তা করছে। সে তাকে বলেও ফেললো, আরে আমর! মানুষের উপর তোমরা যে কর ধার্য করেছো আরব তা খুশী মনে মেনে নিতে পারছে না (অর্থাৎ যাকাত)। তো যদি তোমরা তাদের থেকে এটা প্রত্যাহার করে নাও তাহলে তারা তোমাদেরকে মানবে, তোমাদের কথা শুনবে...। আর যদি তা না করো তাহলে আজকের পরে আর তাদেরকে তোমাদের দলে পাবে না...।

তখন আমর বনূ আমেরের ঐ নেতাকে ধমকে উঠে বললেন, ধ্বংস তোমার হে কুররা!! তুমি কাফের হয়ে গেছো?!

তুমি কি আমাদেরকে আরবদের মুরতাদ হয়ে যাওয়ার হুমকি দিচ্ছো?!

তাহলে শোনো আল্লাহর কসম! আমি তোমার মায়ের তাঁবুর ভিতর তোমার উপর দিয়ে অশ্ব ছুটিয়ে দেবো।

* * *

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. যখন আপন রবের ডাকে সাড়া দিলেন আর নেতৃত্বের ভার দিয়ে গেলেন হযরত উমর ফারুকের হাতে। দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যিনি ছিলেন সর্বাধিক উপযুক্ত– তখন ফারুকও আমর ইবনে আসের যোগ্যতা ও দক্ষতার সদ্ব্যবহার করলেন এবং তাকে ইসলাম ও মুসলমানের সেবায় নিয়োজিত করলেন...আর তখনই আল্লাহ তার হাতে ফিলিস্তীন-এর উপকূলীয় অঞ্চল একের পর এক বিজিত করলেন...

রোমান সৈন্যদের একের পর এক তিনি পরাজিত করলেন। তারপর অগ্রসর হলেন বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধের উদ্দেশ্যে। আমর ইবনুল আস এই প্রথম কেবলা ও তৃতীয় হারাম শরীফের ওপর কঠোর অবরোধ আরোপ করলেন। একপর্যায়ে হতাশায় নিমজ্জিত করলেন রোমান সেনাপতি 'আরতাবুন'কে। এবং তাকে বাধ্য করলেন পবিত্র শহর ছেড়ে

দিয়ে পলায়নের পথ বেছে নিতে। ফলে কুদ্‌স সমর্পিত হলো মুসলমানদের হাতে।

এ পর্যায়ে পরাজয় স্বীকারের আগ মুহূর্তে কুদসের পাদ্রী চাইলেন স্বয়ং খলীফার উপস্থিতিতে হস্তান্তর সম্পন্ন হোক। অতএব হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. হযরত ফারুকে আযম রাযি.-কে চিঠি লিখে অনুরোধ করলেন তিনি স্বয়ং এসে যেন "বায়তুল মুকাদ্দাস" বুঝে নেন।

সুতরাং তিনি উপস্থিত হলেন এবং হস্তান্তরপত্রে স্বাক্ষর করলেন। এভাবে পনের হিজরীতে আমর ইবনুল আসের মারফতে কুদস চলে এলো মুসলমানদের কাছে।

হযরত ফারুকে আযম রাযি.-এর কাছে যখন বায়তুল মাকাদ্দাস অবরোধ ও তাতে আমর ইবনুল আস যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তার আলোচনা করা হতো তিনি বলতেন, আমরা রোমের আরতাবুনকে আরবের আরতাবুন দ্বারা ধরাশায়ী করেছি।

তারপর হযরত আমর ইবনুল আস রাযি. তার বিশাল বিজয়গুলোকে মুকুটশোভিত করেন মিসর জয়ের মাধ্যমে এবং এই মহামূল্য মুক্তোটিকে ইসলামের জয়মাল্যে সংযুক্ত করে। এর মধ্য দিয়ে তিনি মুসলিম সৈনিকদের সামনে উন্মুক্ত করে দেন আফ্রিকা ও মরক্কোর দরোজা এবং তারপর স্পেন...

আর এ সকল বিজয় তারা সম্পন্ন করেছিলেন মাত্র অর্ধশতাব্দী কাল সময়ের মধ্যে।

* * *

এগুলোই আমর ইবনে আসের বৈশিষ্ট্যের সবটুকু নয়। এসব কিছুর পাশাপাশি আমর ছিলেন আরবের উল্লেখযোগ্য কৌশলী ব্যক্তি এবং বিরল প্রতিভাধরদের একজন। সম্ভবত তার সবচেয়ে চমকপ্রদ বুদ্ধিচাতুর্যের নযির হলো মিসর জয়ের কাহিনী। কারণ তিনি হযরত ফারুকে আযম রাযি. কে ক্রমাগত প্রণোদনা দিতে থাকেন মিসর অভিযানের জন্য! এক পর্যায়ে ফারুক অনুমতি প্রদান করেন... এবং তার সঙ্গে চার হাজার মুসলিম সৈন্য প্রেরণ করেন।

ফলে আমর কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা তার বাহিনী নিয়ে রেরিয়ে পড়েন। কিন্তু তাদের যাওয়ার অল্প কিছু পরেই হযরত উসমান ইবনে আফফান রাযি. এলেন হযরত উমর রাযি.-এর কাছে। তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমর তো অত্যন্ত নির্ভীক দুঃসাহসী...আর তার মধ্যে নেতৃত্বপ্রীতিও রয়েছে...তাই আমার আশংকা যে, সে মিসরে রওয়ানা হয়েছে পর্যাপ্ত রসদ ও যথেষ্ট সৈন্য না নিয়ে। পরিণামে মুসলমানরা ধ্বংসের মুখোমুখি হবে...।

এতে ফারুক খুবই অনুতপ্ত হলেন মিসর জয়ে আমরকে অনুমতি দেয়ার কারণে এবং তার পশ্চাতে একজন দূত পাঠালেন এ মর্মে পত্র দিয়ে।

* * *

পত্রবাহক মুসলিম সৈন্যদের গিয়ে পেলো ফিলিস্তীনের রাফা অঞ্চলে। আমর যখন ফারুকের পক্ষ থেকে দূত আগমনের খবর জানতে পারলেন এবং আরো জানলেন যে, তার সঙ্গে খলীফার দেয়া পত্র রয়েছে, তিনি আঁচ করলেন একটা কিছু ব্যাপার ঘটেছে। ফলে তিনি পত্রবাহকের সাক্ষাত বিলম্ব করলেন আর সেইসাথে চলার গতিকে আরো বাড়িয়ে দিলেন। এ পর্যায়ে যখন মিসর সীমান্ত চৌকির একটি গ্রামে পৌছলেন তখনই কেবল তার সাথে সাক্ষাত করলেন এবং তার আনা পত্রটি নিলেন। পত্র খুলতেই দেখেন, তাতে লেখা রয়েছেঃ মিসরের মাটিতে প্রবেশের আগেই যদি আমার এই পত্র তোমার কাছে পৌছে তাহলে তুমি ফিরে এসো...

আর যদি মিসর ভূখণ্ডে ঢুকে গিয়ে থাকো তাহলে সামনে বাড়ো।

আমর তখন মুসলিমদের ডেকে তাদেরকে পড়ে শোনালেন ফারুকের পত্র, আর প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা কি অবগত নও যে, আমরা এখন মিসরের মাটিতে?

তারা বললো, নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, তাহলে আমরা আল্লাহর নামে তাঁর ওপর ভরসা করে সামনে অগ্রসর হই।

আর শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তার হাতে মিসরের বিজয় সম্পন্ন করেন।

* * *

তার আশ্চর্য বুদ্ধিকুশলতার আরেকটি উদাহরণ হলো, যখন তিনি মিসরের একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ অবরোধ করে রেখেছিলেন; রোমক সেনাপতি মুসলিম সেনাপতির কাছে এই বলে দূত পাঠালোঃ আপনার তরফ থেকে একজন লোক প্রেরণ করুন, যে আমাদের সঙ্গে আলোচনা ও মতবিনিময় করবে।

তখন কতক মুসলিম সেনা নিজেকে পেশ করলো এ কাজের জন্য। কিন্তু আমর বললেন, আমিই হবো আমার দলের পক্ষ থেকে দূত।

এরপর তিনি দুর্গে প্রবেশ করে সেনাপতির সামনে উপস্থিত হলেন। এমনভাবে যেন তিনিই মুসলিম সেনাপতির পক্ষ থেকে প্রেরিত...

* * *

রোমক সেনাপতি আমরের সঙ্গে সাক্ষাত করলো কিন্তু সে তাকে চিনতে পারলো না...

এরপর তাদের মাঝে আলোচনা শুরু হলো, যাতে আমরের মেধা, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেলো দারুণভাবে। রোমান সেনাপতি আলোচনায় সুবিধা করতে পারবে না দেখে প্রতারণার মতলব আটলো। সে আমরকে উপর্যপরি উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করলো। এদিকে দুর্গরক্ষীদের নির্দেশ দিলো পরিখা অতিক্রমের আগেই তাকে হত্যা করে ফেলতে।

কিন্তু প্রহরীদের চোখের দিকে তাকাতেই আমরের মধ্যে সন্দেহ জাগলো। অতএব তিনি না গিয়ে ফিরে এলেন সেনাপতির কাছে। বললেন, আপনি জনাব আমাকে যে উপঢৌকন দিয়েছেন তা সমগ্র বাহিনীর জন্য যথেষ্ট না। তো আপনি অনুমতি দিলে আমি আরো দশজনকে সঙ্গে নিয়ে আসতাম। আপনার যে দানে আমাকে ধন্য করেছেন তারাও তা লাভ করতো...।

এ কথা শুনে সেনাপতি মুহাখুশী হলো। মনে মনে বললো, মাত্র একজনের পরিবর্তে দশজন... ভালোই তো...

অতএব দুর্গরক্ষীদের সে ইশারা করলো তার পথ ছেড়ে দিতে এবং এরই সাথে আমর ইবনে আসের জন্য লেখা হয়ে গেলো মুক্তি। মিসর যখন জয় হলো এবং মুসলমানদের কাছে তার হস্তান্তর সম্পন্ন হলো; রোমান

সেনাপতি মিলিত হলো আমর ইবনে আসের সঙ্গে। তখন সে সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলো, আরে তুমিই কি সেনাপতি? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ... তোমার ঐ বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও।

* * *

এসব কিছুর পাশাপাশি হযরত আমর ইবনে আস রাযি. ছিলেন সুবক্তা ও সুভাষী, অসম্ভব বর্ণনাকুশলী। এমনকি এক্ষেত্রে তার কৃতিত্ব ছিলো এতটাই সমুজ্জ্বল যে, তার এই বাগ্মিতা ও প্রকাশ ক্ষমতাকে হযরত উমর রাযি. মনে করতেন আল্লাহ সুবহানাহুর কুদরতের অনন্য নিদর্শন। যার ফলে যখন তিনি এমন কাউকে দেখতেন, যার মুখে কথা জরিয়ে যায়, তখন বলতেন, বিশ্বাস করি এই ব্যক্তির স্রষ্টা আর আমর ইবনুল আসের স্রষ্টা একজনই। আমর ইবনুল আসের অলঙ্কারপূর্ণ উক্তির একটি হলো–

মানুষ তিন প্রকার :

পূর্ণ মানুষ, অর্ধেক মানুষ এবং কিচ্ছু না (অপদার্থ)

পূর্ণ মানুষ হচ্ছে সে, যার বুদ্ধি ও দ্বীনদারি দুটোই পরিপূর্ণ...তাই যখন সে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চায়, চিন্তাশীলদের সঙ্গে পরামর্শ করে। ফলে সবসময় সে সফল হয়।

আর অর্ধমানুষ হলো সে, যাকে আল্লাহ পরিণত বুদ্ধি ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন দান করেছেন। কিন্তু যখন সে কোন বিষয়ে ফায়সালা করে, কারো সাথে পরামর্শ করে না। সে মনে মনে বলে, কোন মানুষটা এমন আছে, নিজের মত বাদ দিয়ে আমি যার মত গ্রহণ করবো? ফলে সে কখনো ঠিক করে, কখনো ভুল করে। আর অপদার্থ হলো সে, যার বুদ্ধিও নেই, দ্বীনদারিও নেই, ফলে সে সবসময় ভুল করে, ব্যর্থ হয়...

আল্লাহর কসম, আমি সকল বিষয়ে পরামর্শ করি। এমনকি আমার খাদেমদের সঙ্গেও।

* * *

মৃত্যুর আগে শেষ যখন হযরত আমর রাযি. অসুস্থ হলেন এবং মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারলেন তখন খুব কাঁদলেন আর ছেলেকে বললেন:

আমি তিনটি অবস্থা পার করেছি আমার জীবনে। সর্বপ্রথম আমি ছিলাম কাফের, তখন যদি মৃত্যু হতো তাহলে জাহান্নাম ছিলো অবধারিত।

এরপর যখন রাসূলের কাছে বায়আত হলাম তখন আমি ছিলাম তার প্রতি সবচেয়ে বেশি লাজুক। এমনকি আমি কখনো দু'চোখ ভরে তাকে দেখিনি। তো তখন যদি আমার মৃত্যু হতো মানুষ বলতো, আমর বড় ভাগ্যবান। সৎভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে আর সেইভাবেই মারা গেছে। এরপর আমি অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি, জানি না তার ফলাফল আমার অনুকূলে নাকি তার উল্টো।

তারপর তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরালেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের আদেশ করেছো, কিন্তু আমরা তা মানতে পারিনি। নিষেধ করেছো, কিন্তু বিরত হইনি...

এখন তোমার দয়া ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই হে আরহামার রাহিমীন!

তারপর তিনি তার হাত বুক বরাবর তুলে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আর তো কোন শক্তিমান নেই আমি যার সাহায্য নেবো... আমি নিষ্পাপও নই, তাই স্বীকার করছি নিজের অপরাধ...

আমি অহংকারীও নই; বরং ক্ষমাপ্রার্থী...সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন হে গাফ্ফার!

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন একথাটি এবং তারই সাথে ছেড়ে গেলেন ইহজীবন, উড়ে গেলো তার প্রাণ।

সমাপ্ত

আমাদের প্রকাশিত
শিশু-কিশোর উপযোগী বই

আলোর ফোয়ারা

নীল দরিয়ার নামে

গায়েবী খাজানা

অজানা দ্বীপের কাহিনী

সীরাতুন্নবী স. সিরিজ : ১-১০

শহীদানের গল্প শোন সিরিজ : ১-১০

কিশোর সাহাবী সিরিজ : ১-১০

আলোর মিছিল সমগ্র : ১-৬

কিসরার মুকুট

আলোর দিগন্তে হযরত উমর রাযি.

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৯৫৮৯৩০৮, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net